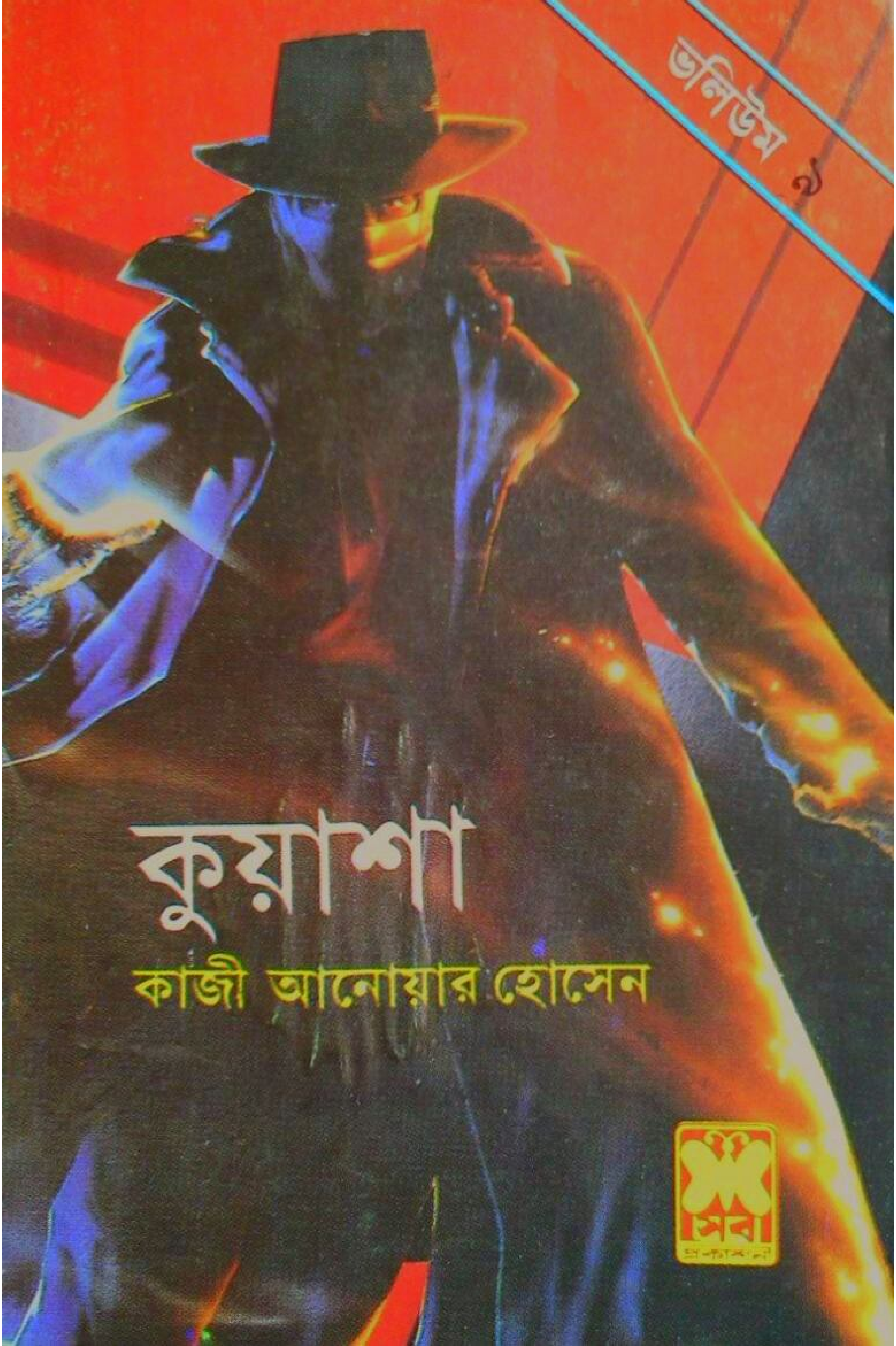
ভলিউম ৭
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook:
www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Facebook Group :

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ছাব্বিশ টাকা

ISBN 984-16-1099-X

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-9
KUASHA SERIES: 25, 26, 27
By: Qazi Anwar Husain

সূচী

কুয়াশা ২৫ —— ৫
কুয়াশা ২৬ —— ৫৯
কুয়াশা ২৭ —— ১১২

কুয়াশা ২৫

প্রথম প্রকাশঃ জুন ১৯৭০

এক

ঠিকানাটা জানা ছিল শহীদের। কলিংবেল টিপতেই একজন মধ্য বয়স্ক কাজের লোক দরজা খুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। মি. সিম্পসনকে দেখে বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠল লোকটা, ইংরেজ দেখলে সচরাচর কোন কোন লোকের যা হয়ে থাকে। শহীদ কথা বলল প্রথম, 'তোমার সাহেব বাড়ি আছেন?'

লোকটা শহীদের আপাদমস্তক দেখল। তারপর বেহায়ার মত বলে উঠল, 'আপনাদের নাম বলে দিন, সাহেবকে গিয়ে বলি।'

মি. সিম্পসন পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, 'তোমার সাহেবকে গিয়ে বল যে, পুলিস অফিসার মি. সিম্পসন আর প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. শহীদ খান এসেছেন।'

কথাগুলো কানে ঢুকতেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। দরজা খোলা রেখেই মুহূর্তের মধ্যে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মিনিটখানেকও কাটল না, তিনজন লোক বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। কিন্তু তাদের মধ্যে ওসমান গনি নেই। লোক তিনজন শহীদ ও মি. সিম্পসনকে কৌতূহলী চোখে দেখতে দেখতে চলে গেল বাড়ির বাইরে। তারপরই দরজায় এসে দাঁড়ালেন ওসমান গনি। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব। একটু বিচলিতও মনে হচ্ছে। শহীদকে দেখে তিনি হাসবার চেষ্টা করে বলে উঠলেন, 'আরে, আপনি! আসুন, ড্রইংরুমে আসুন।'

দরজা টপকে ড্রইংরুমে গিয়ে বসল ওরা সকলে। শহীদ ওসমান গনিকে নিরীক্ষণ করছে মনোযোগ দিয়ে। মি. সিম্পসন চোখ ঘুরিয়ে দেখছেন বসবার ঘরটা। ওসমান গনি ওদের দু'জনের দিকে তাকাচ্ছেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। শহীদ পরিষ্কার বুঝতে পারল, তাদেরকে দেখে ওসমান গনি বিচলিত বোধ করছেন।

ওসমান গনি প্রশ্ন করলেন, 'তা, ব্যাপার কি বলুন দেখি?'

শহীদ মি. সিম্পসনকে দেখিয়ে বলল, 'পরিচয়টা করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস অফিসার—মি. সিম্পসন। আপনার পরিচয় ওঁর আগে থেকেই জানা।'

করমর্দন করলেন দু'জন। মি. সিম্পসন বললেন, 'আমি পুলিস হলেও বর্তমান কেসটার কিনারা করার প্রধান দায়িত্ব শহীদের। আমি সহকারী হিসেবে কাজ

করছি, বলতে পারেন।'

ওসমান গনি কথা প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, 'কিসের কেস?'

শহীদ উত্তর দিল, 'মিস সুরাইয়া বেগম হত্যাকাণ্ডের কেস, মি. গনি।'

ওসমান গনি ভুরু কুঁচকে উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'মিস সুরাইয়া! কোন্ মিস সুরাইয়া?'

শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে ওসমান গনির দিকে চেয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'ক'জন মিস সুরাইয়াকে আপনি চেনেন, মি. গনি?'

'ক'জন সুরাইয়াকে চিনি, মানে! আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না, মি. শহীদ। বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস সুরাইয়াকে অবশ্যই আমি চিনি। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় তার কথা বলছেন না?'

শহীদ ধীর কণ্ঠে জানাল, 'হ্যাঁ, তার কথাই বলছি আমরা। অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগমের লাশ পাওয়া গেছে একটু আগে। তার চাকর-বাকরও সকলে নিহত।'

'হোয়াট!'

সোফা ছেড়ে উঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন ওসমান গনি। অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর দুই চোখ। কাঁপছেন তিনি উত্তেজনায়। শহীদ তীব্র চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করে উঠল, 'এমন অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন আপনি?'

মি. সিম্পসনও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ওসমান গনির দিকে। ওসমান গনি প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'বলছেন কি, মি. শহীদ! উত্তেজিত হব না আমি! জানেন, সুরাইয়া আমাদের চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে দামি তারকা? জানেন, ওর ওপর নির্ভর করত আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের উত্তরণ? জানেন, ও না থাকলে কতজন প্রযোজকের সর্বনাশ ঘটবে? কত ছবি বন্ধ হয়ে যাবে?'

শহীদ প্রশ্ন করল সাথে সাথে, 'আপনার কোন ছবিতে মিস সুরাইয়া চুক্তিবদ্ধ ছিলেন কি?'

'নিশ্চয়। দুটো ছবিতে অভিনয় করছিল ও। আরও একটার জন্যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। তিনটে ছবির জন্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা অ্যাড়ভান্স করেছি আমি!'

থরথর করে কাঁপছেন ওসমান গনি। শহীদ বলল, 'আচ্ছা, মিস সুরাইয়া নামে আর কাউকে কি চিনতেন আপনি?'

'না। হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'না, এমনি। আচ্ছা, মিস সুরাইয়ার কোন শত্রু ছিল বলে জানেন?'

'না। খুনি কে, তা জানা যায়নি এখনও?'

'না, জানা যায়নি। আচ্ছা, মিস সুরাইয়ার বাড়ি ছিল হুগলীতে, তাই না?'

ওসমান গনি আবার বসলেন। হতাশায় মুষড়ে পড়েছেন যেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ।'

শহীদ জানতে চাইল, 'মিস সুরাইয়ার আত্মীয়-স্বজন ঢাকায় কে কে আছেন? বাবা-মা কোথায় ওর?'

'জানি না। সুরাইয়ার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই বলেই জানতাম। বাবা-মার কথা নাকি মনে পড়ত না সুরাইয়ার। কোলকাতার কোন এক মিশনারীদের আশ্রম থেকে রহমান বলে এক যুবক ওকে ঢাকায় নিয়ে আসে। এখানে ধর্ম বদলে মুসলমান হয় ও। ওর পরিচয় সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা নেই আমার।'

হঠাৎ শহীদ জিজ্ঞেস করে উঠল, 'আচ্ছা, সোলায়মান চৌধুরী নামে চিত্র-প্রযোজক কেউ আছেন নাকি ঢাকায়?'

'কই, না তো!'

'হুগলী জেলায় বাড়ি ছিল এমন কোন ভদ্রলোক চিত্র-প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন কিনা জানা আছে আপনার?'

'না, জানা নেই।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'এরফান মল্লিক আপনার এবং মি. সারওয়ারের বেশ কিছু টাকা মেরে দিয়েছিলেন। এরফান মল্লিক জমিদার সোলায়মান চৌধুরীর নায়েব ছিলেন, তা আপনাদের জানা ছিল?'

'না, আমাদের সাথে এরফান মল্লিকের পরিচয় হয় কোলকাতায়।'

শহীদ হঠাৎ জানতে চাইল, 'এরফান মল্লিকের সন্ধান পেয়েছেন আপনারা?'

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন ওসমান গনি। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল শহীদের দৃষ্টি। খানিক ইতস্তত করে উত্তর দিলেন ওসমান গনি, 'তার আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছি।'

'হঠাৎ আশা ছেড়ে দেবার কারণ কি, মি. গনি?'

'কারণ! কারণ আবার কি? ঢাকায় সে নেই বলে মনে হওয়াতে...।'

ঘাবড়ে গিয়ে অজুহাত দেখালেন ওসমান গনি। শহীদ কথার মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, মিস সুরাইয়ার কোন ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর নাম বলতে পারেন?'

'ওর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কেউ ছিল বলে মনে হয় না। সুরাইয়া মেলামেশা তেমন পছন্দ করত না। একমাত্র রহমান ছাড়া আর কারও সঙ্গে ওকে ঘুরে বেড়াতে দেখিনি।'

শহীদ বলল, 'রহমানের পুরো নাম কি? দেখতে কেমন? মিস সুরাইয়ার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ঠিক কি ধরনের ছিল, জানেন?'

'আবদুর রহমান ওর নাম। সুদর্শন যুবক। কোলকাতা ভার্সিটির এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল। সুরাইয়াকে ভালবাসে। ওর সাথেই সুরাইয়া মিশনারীদের চোখে ধুলো দিয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসে। সুরাইয়াও ওকে ভালবাসত মনেপ্রাণে! ওদের

বিয়ে হবার কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। একই সাথে মানে একই বাড়িতে থাকত ওরা। তবে গত মাস ছ'য়েক হল সুরাইয়ার কাছ থেকে সরে গিয়ে গোপীবাগ এলাকায় বসবাস করছে। কারণটা কি জানা নেই। ওদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিনা বলতে পারব না। রহমান চাকরি-বাকরি করে না, সম্ভবত সুরাইয়ার টাকাতেই দিন চলত ওর। কিন্তু সুরাইয়ার ব্যবহার গত ছ'মাস থেকে কেমন যেন...।'

'বলে যান।'

ওসমান গনি খানিক ভেবে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়, বুঝলেন মি. শহীদ। গত মাস ছ'য়েক থেকে সুরাইয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করে আসছিলাম আমি। স্টুডিও আর বাড়ি ছাড়া কোথাও ঘোরাফেরা করা একদম ছেড়ে দিয়েছিল ও। শূটিং-এর সময় লক্ষ্য করেছি, কেমন যেন অন্যমনস্কতা দেখা দিয়েছিল ওর মধ্যে। মাঝে মাঝে ও খুব গম্ভীর হয়ে যেত। কি যেন ভাবত একমনে। জিজ্ঞেস করলে উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যেত। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সুরাইয়া প্রতি সপ্তাহের সোমবারে বাড়ি থেকে বের হত। বের হত সোমবারে, কিন্তু ফিরত সোমবার কাটিয়ে মঙ্গলবার কাটিয়ে বুধবার সকালের দিকে। সোমবার আর মঙ্গলবার শূটিং-এ থাকত না ও। ফলে ভয়ানক অসুবিধে হচ্ছিল আমাদের।'

আশ্চর্য হয়ে গেল শহীদ ও মি. সিম্পসন। শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কোথায় যেত মিস সুরাইয়া?'

ওসমান গনি মাথা নেড়ে বললেন, 'তা কখনও বলতে চায়নি সুরাইয়া। জিজ্ঞেস করলে রেগে যেত ও। তবে ঢাকায় ও থাকত না। লঞ্চ বা ট্রেনে কেউ কেউ চড়তে দেখেছে ওকে। মোট কথা সবটা ব্যাপারই রহস্যময়।'

শহীদ চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল, 'মিস সুরাইয়া একা যেত, না কেউ থাকত সাথে?'

'একা যেত বলেই শুনেছি।'

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'মিস সুরাইয়ার প্রেমিক, মানে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেননি আপনারা এ ব্যাপারে?'

'সে-ও কিছু জানে না। গত ছ'মাস ধরে তাকে সুরাইয়ার সাথে বেশি দেখা যেত না।'

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল শহীদ। তারপর হঠাৎ ও জানতে চাইল, 'আচ্ছা মি. গনি, আমরা আপনার দরজায় যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন কয়েকজন ভদ্রলোককে চলে যেতে দেখলাম। ওরা কারা?'

মি. গনি স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'কেন, ওরা আমার কর্মচারী। চিত্র-নাট্যকার, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক।'

'আচ্ছা, আপনি মিস সুরাইয়াকে মোট কত টাকা অ্যাডভান্স করেছিলেন তিনটে ছবির জন্যে?'

'প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।'

'সে টাকা আপনি ফেরত পাবার আশা রাখেন?'

মি.গনি একটু ভেবেচিন্তে বললেন, 'মিস সুরাইয়া সম্পর্কে উকিলের সাথে আলোচনা করব আমি। ব্যাঙ্কে ওর নিশ্চয় টাকা আছে। আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারি বৈকি আমি!'

শহীদ জানতে চাইল, 'কোন্ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে মিস সুরাইয়ার?'

'ইস্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কে।'

মি. গনির কথা শেষ হবার সাথে সাথে মি. সিম্পসন উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। ঠিক মি. গনির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কখনও লণ্ডনে গিয়েছিলেন, মি. গনি?'

ওসমান গনি মি. সিম্পসনের হাবভাব দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অস্বস্তি সহকারে উত্তর দিলেন তিনি, 'গিয়েছিলাম। কেন?'

'কবে, কি কারণে লণ্ডনে গিয়েছিলেন জানতে পারি কি? কতদিন ছিলেন লণ্ডনে?'

মি. মিম্পসনের গলার গম্ভীর স্বর শুনে পাংশু হয়ে গেল ওসমান গনির মুখাবয়ব। মি. সিম্পসন ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোকের মুখটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে মশগুল হয়ে পড়েছেন। ওসমান গনি অপ্রতিভ বোধ করলেন। বললেন, 'পড়াশোনার জন্যে গিয়েছিলাম, প্রায় বছর পনের আগে। তিন বছর ছিলাম সে সময়। তারপর গত বছর গিয়েছিলাম ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালে। কিন্তু এসব প্রশ্নের সাথে সুরাইয়া হত্যার সম্পর্ক কি, মি. সিম্পসন?'

মি. সিম্পসন সে কথার উত্তর না দিয়ে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসলেন, 'কিছু মনে করবেন না, মি. গনি। আপনার দু'কানের পাশে এবং কপালে মোট তিনটে লম্বা দাগ দেখতে পাচ্ছি—কিভাবে হল দাগগুলো?'

বড় বড় হয়ে গেল ওসমান গনির চোখ জোড়া। লাল মত হয়ে উঠল মুখ। সেটা রাগে, না লজ্জায় বোঝা গেল না। একমুহূর্ত চুপ থেকে উত্তর দিলেন, 'ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলাম আমি বছর পাঁচেক আগে। স্টিচ করতে হয়েছিল বলে দাগগুলো রয়ে গেছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ও। আমি ভেবেছিলাম, প্লাস্টিক সার্জারী করিয়েছিলেন।'

মি. সিম্পসন শহীদের দিকে তাকালেন। শহীদ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'আজ চলি, মি: গনি। একটা কথা, মিস সুরাইয়ার হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করতে হলে আপনাদের সাহায্য দরকার। আপনি···।'

ওসমান গনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সেকি কথা! নিশ্চয় সাহায্য করব।'

শহীদ বলল, 'ধন্যবাদ।'

ধানমণ্ডিতে মি. সারওয়ারের বাড়ি। মাঝারি আকারের নতুন দোতলা বাড়ি। কলিংবেল টিপতে স্বয়ং মি. সারওয়ার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। কৌতূহলী, প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তাঁর চোখে। শহীদকে দেখে অপ্রতিভ বোধ করলেন যেন। সম্ভবত ভয় ভয় ভাবও ফুটল সারা মুখে। নীরস স্বরে বলে উঠলেন, 'মি. শহীদ যে!'

শহীদ মি. সিম্পসনের পরিচয় দিল। তারপর মি. সিম্পসনকে বলল, 'এঁর পরিচয় আপনি তো আগে থেকেই জানেন। এরফান মল্লিকের সন্ধানকারীদের মধ্যে ইনিও একজন।'

মি. সারওয়ারের মুখের চেহারা পাংশু হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। অস্থির দৃষ্টিতে শহীদের দিকে ফিরে তিনি বলে উঠলেন, 'ব্যাপার কি, এরফান মল্লিকের সন্ধান পাওয়া গেছে নাকি?'

শহীদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের দিকে। মি. সারওয়ার তাড়াতাড়ি পথ করে দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আসুন, বসবেন আসুন।'

ড্রইংরুমে গিয়ে আরাম কেদারায় বসল ওরা তিনজন। মি. সারওয়ার বললেন, 'চা, না কফি?'

শহীদ ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'কিছুই না। আমরা মিস সুরাইয়া বেগম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে এসেছি, মি. সারওয়ার।'

'কি বললেন!'

মি. সিম্পসন একটা একটা শব্দ উচ্চারণ করে শহীদের পরিবর্তে নিজেই বললেন, 'অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া খুন হয়েছে। আপনি জানেন না?'

মুহূর্তের জন্যে ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত তাকিয়ে রইলেন মি. সারওয়ার ওদের দিকে। তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'অসম্ভব! এ আপনারা কি বাজে কথা বলছেন!'

'বাজে কথা নয়, কাজের কথা।'

শহীদ গম্ভীর হয়ে উঠল। যোগ করে বলল আবার, 'আপনি এমন ভয় পেয়ে গেলেন কেন, মি. সারওয়ার?'

হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মি. সারওয়ার ওদের দিকে। মুখ ফুটে কথা বের হচ্ছে না তাঁর। শহীদ হঠাৎ বলে উঠল, 'মিস সুরাইয়ার হত্যাকারিকে গ্রেফতার করতে আমরা বদ্ধপরিকর, মি. সারওয়ার। আমাদের সন্দেহের তালিকায় মিস সুরাইয়ার পরিচিত সব ব্যক্তিকেই ঠাঁই দিতে হচ্ছে। তাই আপনিও আমাদের সন্দেহের বাইরে নন। আমাদের সবগুলো প্রশ্নের সঠিক এবং সত্য উত্তর দিলেই কেবল সন্তুষ্ট হব আমরা।'

মি. সারওয়ারের চোখে-মুখে ফুটে উঠল পরিষ্কার আতঙ্কের ছাপ। কিন্তু নতুন কোন তথ্য আদায় করা গেল না তাঁর কাছ থেকে। মি. ওসমান গনি যা যা বলেছেন, ইনিও হুবহু তাই বলে গেলেন শহীদের জেরার মুখে পড়ে। শহীদের কিন্তু দৃঢ় ধারণা হল, মি. সারওয়ার সত্য কথা লুকোচ্ছেন। কিন্তু স্বীকার করলেন না মি. সারওয়ার শহীদের অভিযোগ।

মিস সুরাইয়া বেগমের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে ব্যাঙ্কে ফোন করল শহীদ মি. সারওয়ারের ড্রইংরূম থেকেই। অদ্ভুত একটা খবর পাওয়া গেল। মিস সুরাইয়া সব টাকা দু'দিন আগে তুলে নিয়েছে। মোট বার লাখ টাকা। হ্যাঁ, মিস সুরাইয়া নিজে এসেই নিয়ে গেছে টাকা।

চমকে উঠল শহীদ খবরটা শুনে। অত টাকা কেন তুলেছিল মিস সুরাইয়া? প্রশ্নটা ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল ওকে সারাক্ষণ।

মি. সারওয়ারকে ঢাকা ছেড়ে না যাবার অনুরোধ জানিয়ে চিত্র-প্রযোজক আখতার চৌধুরীর বাড়ির দিকে চলল ওরা। ঘড়িতে তখন বেলা বারটা।

মি. আখতার চৌধুরীর বাড়িতে ওরা আগেও একবার এসেছে। কঙ্কাল-রহস্য উপলক্ষ্যে।

জীপটা দাঁড়াতেই নেমে পড়ল শহীদ। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নামলেন মি. সিম্পসন। গেটের দিকে পা বাড়িয়েছে শহীদ। এমন সময় পরিচিত একটা কণ্ঠ থেকে চিৎকার হল, 'শহীদ…!'

ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। দাঁড়িয়ে পড়েছেন মি. সিম্পসনও।

কামালকে হনহন করে ছুটে আসতে দেখা যাচ্ছে ওদের দিকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শহীদ। কামাল কোথা থেকে আসছে? কোথায় ছিল ও?

সামনে এসে দাঁড়াল কামাল। শহীদ বলল, 'কিরে, তুই কোথা থেকে? এদিকে কি মহাসর্বনাশ ঘটে গেছে তা জানিস?'

কামালকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। গম্ভীরভাবেই বলল ও, 'আমার এক বন্ধুর বাড়ির জানালার ধারে বসে আখতার চৌধুরীর বাড়ির ওপর নজর রাখছি আমি ভোরবেলা থেকে।'

মি. সিম্পসন আগ্রহসহকারে জানতে চাইলেন, 'কেন?'

কামাল চিন্তিত ভাবে বলল, 'ভদ্রলোক সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন আমার মনে। সেদিন প্রথমে হলফ করে বললেন যে, কঙ্কাল তাঁর বাড়িতে আসেনি, পরে আবার স্বীকার করলেন কথাটা। এর কারণ কি? নিশ্চয় রহস্যময় কোন কারণ আছে। আমার বিশ্বাস, কঙ্কাল-রহস্যের হোতা এই আখতার চৌধুরী। তাই ভদ্রলোককে চোখে-চোখে রাখছি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু তোমার কোন্ বন্ধুর বাড়ি থেকে আখতার চৌধুরীর ওপর নজর রেখেছ? কাছাকাছি তো কোন বাড়ি দেখা যাচ্ছে না!'

কামাল দূরবর্তী একটা বাড়ি দেখিয়ে বলে উঠল, 'ওই তো বাড়িটা। বিনকিউলার সাথে আছে আমার।'

শহীদ বলল, 'তা বেশ। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখলি?'

কামাল বলল, 'না, তবে, আখতার চৌধুরীর নিশ্চয় ডিসেন্ট্রি হয়েছে। পাঁচবার ল্যাট্রিনে যেতে দেখেছি সাত ঘন্টায়।'

শহীদ বলল, 'বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগমের নাম শুনেছিস তো? চাকর-বাকরসহ সে নিহত হয়েছে।'

'বলিস কি!'

আঁতকে উঠল কামাল। শহীদ সংক্ষেপে সব কথা বলল ওকে। কামাল মন্তব্য করল, 'মিস সুরাইয়ার বাবাকে সোলায়মান চৌধুরী বলে সন্দেহ করছিস তাহলে তুই?'

শহীদ বলল, 'সন্দেহ নয়, সেটাই আমার বিশ্বাস।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'শয়তানটাকে ধরতেই হবে। সেই-ই হত্যা করেছে…।'

কামাল বলল, 'সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে যদি মৃতা মিস সুরাইয়া হয় তাহলে খুনী কে? নিশ্চয় বাবা মেয়েকে খুন করতে পারে না।'

শহীদ বলল, 'তা কে বলছে? বললাম [redacted], সুরাইয়া বেগম একজন নয়, দু'জন। আমার বিশ্বাস, অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম নিহত হয়েছে বলে মনে হলেও আসলে তা হয়নি। নিহত হয়েছে দু'নম্বর সুরাইয়া বেগম।'

'কে সেই হতভাগিনী দু'নম্বর সুরাইয়া বেগম?'

শহীদ বলল, 'সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।'

মি. সিম্পসন বললেন, আমি অফিসে ফিরেই সন্ধান নেব, কোন যুবতীর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কিত ডায়েরী কোন থানায় করা হয়েছে কিনা।'

শহীদ বলল, 'আয় কামাল, আখতার চৌধুরীর সাথে কথা-বার্তা শেষ করে ফেলি।'

'চল।'

গেট পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল ওরা। সামনের রুমের দরজা বন্ধ। ওটাই ড্রইংরুম। কলিংবেল টিপল কামাল। প্রায় সাথে সাথেই একজন মধ্যবয়স্ক কাজের লোক দরজা খুলে দিল।

'সাহেব আছেন বাসায়?' শহীদ জিজ্ঞেস করল।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

কামালের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল শহীদ। কামাল চাকরটার দিকে অগ্নি-চক্ষু মেলে ধমকে উঠল, 'এই ব্যাটা, মিথ্যে কথা বলছিস, তোর সাহেব বাড়িতে নেই?'

চাকরটা থতমত খেয়ে মুখ খুলল, 'আছেন স্যার, মানে পায়খানায় গেছেন।'

কামাল শহীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। চাকরটাকে মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক আছে আমরা বসব।'

দরজা থেকে সরে গেল লোকটা। ওরা সকলে গিয়ে বসল ড্রইংরুমে। চাকরটা দ্রুত পালিয়ে গেল অন্দরের দিকে।

চুপচাপ বসে রইল ওরা। কারও মুখে কোন কথা নেই। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল শহীদ। হঠাৎ পদশব্দ শুনে মগ্নতা দূর হয়ে গেল ওর। আখতার চৌধুরী রুমে পা রেখেই উজ্জ্বল হাসিতে বলে উঠলেন, 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য আমার!'

শহীদ অস্বাভাবিক গম্ভীরস্বরে বলে উঠল, 'সৌভাগ্য কোথায় দেখলেন, মি. চৌধুরী? আমরা দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্তি হয়ে এসেছি আজ আপনার সাথে কথা বলতে।'

পলকের জন্যে নড়ে উঠল আখতার চৌধুরীর চোখের পাপড়ি জোড়া। পরক্ষণেই নির্ভেজাল কৌতূহল ফুটে উঠল তাঁর দুই চোখে। একটা সোফায় বসে পড়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আমি নির্বিরোধী মানুষ, দুর্ভাগ্যের শিকার কোন দিন হব বলে বিশ্বাস হয় না আমার।'

শহীদ উত্তর দিল, 'নিরীহ এবং নির্বিরোধী মানুষরাই দুনিয়ায় চিরকাল দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয়ে থাকে।'

'চমৎকার! কথার পিঠে কথা সাজাবার এমন বিচক্ষণতা বড় একটা দেখা যায় না, মি. শহীদ। তা দুর্ভাগ্য হোক বা সৌভাগ্য হোক, ব্যাপারটা কী, বলুন তো?'

শহীদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আখতার চৌধুরীর দিকে। কামাল ও মি. সিম্পসনের চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। চেয়ে আছে ওরা আখতার চৌধুরীর দিকে। আখতার চৌধুরীর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছিটেফোঁটাও নেই। হাসিতে উজ্জ্বল তাঁর মুখ। শহীদ বলল, 'অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম কি আপনার কোন ছবিতে চুক্তিবদ্ধ?'

'নিশ্চয়। কেন বলুন তো?'

প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইলেন আখতার চৌধুরী। শহীদ প্রশ্ন করল, 'ক'টা ছবির জন্যে চুক্তি হয়েছে? অ্যাডভান্স করেছেন কত টাকা?'

'আমার আগামী চারটে ছবিরই নায়িকা সুরাইয়া। লাখ তিনেক টাকা অ্যাডভান্স করেছি সম্ভবত। সঠিক হিসেব খাতাপত্র না দেখে দেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এসব কথা কেন জানতে চাইছেন, তা তো বুঝলাম না?'

শহীদ হঠাৎ জানতে চাইল, 'সুরাইয়া নামে আর কোন যুবতীকে আপনি চেনেন, মি. চৌধুরী?'

একটু যেন চমকে উঠলেন আখতার চৌধুরী। কিন্তু উত্তর দিলেন শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠেই, 'না, চিনি বলে মনে হয় না।'

শহীদ বলে উঠল, 'ঘন্টা দুয়েক আগে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম এবং তার চাকর-বাকর আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, লাশটা মিস্ সুরাইয়ার কিনা। কেননা, খুনী যুবতীর মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে রেখে গেছে। চেনবার কোন উপায় নেই।'

আখতার চৌধুরী বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন শহীদের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর বলে উঠলেন, 'আমার সাথে ঠাট্টা করছেন না তো?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠাট্টা নয়। চাক্ষুষ দেখে আসছি আমরা।'

শহীদ মাথা ঝাঁকাল, 'খুনীকে গ্রেফতার করার জন্যে চিত্র-জগতের, অর্থাৎ মিস সুরাইয়ার পরিচিত সকলের সহযোগিতা কাম্য আমাদের। সকলকেই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব...।'

আখতার চৌধুরী বলে উঠলেন, 'যথাসাধ্য সহযোগিতা পাবেন, মি. শহীদ, আমার কাছ থেকে। কিন্তু এখনও যে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি! সুরাইয়া, সুরাইয়া নেই! কিন্তু ওর কোন শত্রু ছিল বলে তো মনে হয় না আমার! কে করল এমন নিষ্ঠুর কাজ!'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'আমরা জানতে চাই, মিস সুরাইয়ার বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছেন। এ সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

'সুরাইয়ার বাবা-মা? সুরাইয়ার বাবা-মা বেঁচে আছেন বলে মনে হয় না। ও বলত, বাবা-মার কথা মনে পড়ে না কখনও। আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে কিনা বলতে পারছি না। একমাত্র ঘনিষ্ঠতা ছিল ওর আবদুর রহমানের সাথে। রহমানই ওকে ঢাকা আনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সুরাইয়া পশ্চিমবঙ্গের কোন একদল মিশনারীর সাথে ছিল। রহমান ওকে সঙ্গে করে ঢাকায় আনে। এর বেশি আমার কিছু জানা নেই।'

'সুরাইয়ার কোন শত্রু নেই বললেন। কিন্তু গত ছ'মাসে ওর আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন কি কখনও?'

'অস্বাভাবিকতা? তা হ্যাঁ, কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হত বটে বেশ কিছুদিন থেকে। প্রতি সোমবার কোথায় যেন যেত ও। কোথায় যেত, ঠিক তা জানি না। বুধবার সকালে ফিরত সচরাচর। জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যেত। উত্তর দিত না। অনেক চেষ্টা করেও কারণটা জানতে পারিনি আমি। তবে রহমানের সাথে কিছুদিন থেকে বনিবনা হচ্ছিল না ওর। ঝগড়া-ঝাটিও হত আজকাল।'

শহীদ স্পষ্ট প্রশ্ন করল, 'রহমানকে সন্দেহ করা চলে কি?'

গভীরভাবে চিন্তা করলেন আখতার চৌধুরী। তারপর বললেন, 'সন্দেহ করা চলে কি চলে না, বলতে পারব না। রহমান আগে সুরাইয়ার সাথেই বসবাস করত। বেশ কিছুদিন হল গোপীবাগে চলে গেছে সে। সুরাইয়া ওর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমিয়ে দিয়েছিল।'

'কারণটা কি ছিল, জানেন নিশ্চয়?'

'সঠিক জানি না। তবে সুরাইয়ার খ্যাতি, অর্থ, মান-সম্মান ইত্যাদিই দায়ী হয়ত। রহমানের সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল সুরাইয়ার, সে বহু আগে। তখন কিছুই ছিল না সুরাইয়ার। এখন ওর পাণি-গ্রহণের জন্যে অনেক রথী-মহারথী আগ্রহী।'

শহীদ বলল, 'রহমানের ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়।'

আখতার চৌধুরী ঠিকানাটা লিখে শহীদের হাতে দিলেন। শহীদ সেটা পকেটে রেখে বলল, 'কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, যদিও এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করার জন্যে সবরকম প্রশ্ন করতে বাধ্য আমরা। আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনার জন্মস্থান কোথায়? ঢাকায় আপনি কবে এসেছেন? বিদেশে কখনও গিয়েছিলেন? বিদেশ বলতে ইউরোপ বোঝাচ্ছি আমি।'

'জন্ম লণ্ডনে। আমার মা-বাবা লণ্ডনে বসবাস করতেন। ওখানেই মানুষ আমি। ঢাকায় এসেছি গত বছর।'

স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন আখতার চৌধুরী। তারপর নিজেই একটা প্রশ্ন করলেন, 'সুরাইয়া বেগম নামে অন্য কোন যুবতীকে চিনি কিনা প্রশ্ন করেছিলেন আপনি। কারণ বলতে আপত্তি আছে কি?'

শহীদ বলল,'যুবতীর মৃতদেহের মুখটা চেনবার কোন উপায় নেই। অবশ্য মিস সুরাইয়ার বাড়িতেই যখন লাশ পাওয়া গেছে তখন স্বভাবতই ধারণা হয়, লাশটা তারই। কিন্তু অন্য কারও তো হতে পারে?'

আখতার চৌধুরী বললেন, 'তা হতে পারে, অবশ্য এটা অতি-কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু যদি হয়ও, তার নাম সুরাইয়া বেগম হতে যাবে কেন?'

শহীদ বলল, 'অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগমের লাশ যদি ওটা না হয়ে থাকে তাহলেও যে নিহত হয়েছে তার নাম সুরাইয়া বেগম হতে বাধ্য।'

'কেন?'

'এই "কেন"-র উত্তর এখন দেয়া যাচ্ছে না বলে দুঃখিত, মি. চৌধুরী।'

শহীদ কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি সকলেই সোফা ছাড়লেন। শহীদ বলল, 'মি. চৌধুরী, আর একটা জরুরী বক্তব্য আছে আমাদের। সুরাইয়া হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না আপনার।'

আখতার চৌধুরী বললেন, 'তা আমি জানি। ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাব না আমি। কেননা, সুরাইয়ার হত্যাকারীকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। দেখতে চাই আমি সেই পাষণ্ডকে।'

শহীদ দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। কামালের সাথে

চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। ইঙ্গিত করল শহীদ। ইঙ্গিতের ভাষা কামাল কি বুঝল কেবল সে-ই জানে। না দাঁড়িয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল সে। শহীদ আখতার চৌধুরীকে বলল, 'মিস সুরাইয়া মোট ক'জন ভদ্রলোকের ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল? নাম-ঠিকানাগুলো দিতে পারেন?'

'আমি বলছি, লিখে নিন আপনি!'

আখতার চৌধুরী নাম-ঠিকানা বলে যেতে লাগলেন। শহীদ লিখে বিদায় নিল। মিনিট দশেক সময় লাগল সবগুলো লেখা হতে। বিদায় নিয়ে বের হয়ে এল শহীদ ও মি. সিম্পসন।

আখতার চৌধুরী দরজা বন্ধ করে দিতেই মি. সিম্পসন কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পাঠালে কামালকে, শহীদ?'

বাড়ির বাইরে এসে পড়েছে ওরা তখন। কামাল বসে রয়েছে জীপের ভিতরে। শহীদ ও মি. সিম্পসন জীপে গিয়ে বসলেন। শহীদ কামালকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, কিছু দেখলি?'

কামাল নিরাশ গলায় জবাব দিল, 'না রে।'

মি. সিম্পসন কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা কি?'

শহীদ বলল, 'কামাল দেখেছিল আখতার চৌধুরীকে বারবার ল্যাট্রিনে যেতে। তাই সন্দেহ হয়েছিল আমার, কেননা আখতার চৌধুরীকে অসুস্থ বলে তো মনে হল না দেখে। তাহলে কেন অন্তত ছ'বার ল্যাট্রিনে গিয়েছিলেন উনি?'

শহীদকে চিন্তিত দেখাল। কামাল জীপ থেকে নেমে পড়ে বলল, 'তোরা এখন কোথায় যাবি?'

শহীদ বলল, 'রহমানের সঙ্গে কথা বলা দরকার সবচেয়ে আগে। ওখানেই যাব।'

কামাল বলল, 'চল, আমিও যাব। আমার বন্ধুর ভেসপাটা নিয়ে আসি। তোরা একটু অপেক্ষা কর।'

দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল কামাল ওর বন্ধুর বাড়ির দিকে। খানিক পর দেখা গেল, কামাল মাঝ রাস্তা দিয়ে ভেসপা চালিয়ে বাতাস কেটে এগিয়ে আসছে তীর বেগে। জীপটা স্টার্ট দিলেন মি. সিম্পসন।

ধানমণ্ডি ছাড়িয়ে নিউমার্কেটের কাছে চলে এসেছিল জীপ। হঠাৎ একটা ছুটন্ত গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসা ভদ্রলোকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল শহীদ। গাড়িটা ধানমণ্ডির দিকে চলে গেল দ্রুত। অবাক হয়ে পিছন ফিরে গাড়িটা দেখল শহীদ। মি. সিম্পসন মিররের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কামালকে দেখা যাচ্ছে না কেন? আমাদের পিছনেই তো ছিল একটু আগে!'

শহীদ বলল, 'কামাল ওসমান গনিকে অনুসরণ করার জন্যে ভেসপা ঘুরিয়ে নিয়েছে একটু আগে। ভদ্রলোক অদ্ভুত ছদ্মবেশে কোথায় যেন যাচ্ছেন।'

'লক্ষ্য করিনি তো আমি!'

শহীদ বলল, 'দোষ আপনার নয়। মাথায় হ্যাট, চোখে সান-গ্লাস পরার ফলে সহজে চেনার কথা নয়। আমার চোখে ধরা পড়ে গেছেন। কামালও ঠিক চিনেছে।'

'ছদ্মবেশে কোথায় যাচ্ছেন ভদ্রলোক?'

শহীদ কোন উত্তর দিল না। একটু পর বলল, 'আমরা এদিকের কাজগুলো সেরে নিই, ওদিকে কি হয় কামাল দেখুক।'

দুই

গোপীবাগ। ফিফথ লেনে বাড়ি আবদুর রহমানের। ছোটখাটো একতলা বাড়ি। ঠিকানা মিলিয়ে জীপ থেকে বাড়িটার সামনে নামলেন মি. সিম্পসন। শহীদ আগে নেমেছে।

গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, গেট বন্ধ ভিতর থেকে। কলিংবেল টিপলেন মি. সিম্পসন, কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কারও। সময় বয়ে যাচ্ছে। বারবার কলিংবেল টিপলেন মি. সিম্পসন। কোন শব্দ নেই বাড়ির ভিতরে।

অধৈর্য হয়ে উঠে শহীদ বলল, 'গেট টপকে ভিতরে ঢুকতে হবে, মি. সিম্পসন। মনে হচ্ছে, বিপদ ঘটছে কোন।'

বাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে নামল ওরা। বারান্দায় উঠে এদিক-ওদিক তাকাল। একটা ঘরের দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। কেউ নেই ভিতরে। মি. সিম্পসন ঠেলা দিলেন আর একটা ঘরের দরজায়। খুলে গেল সেটাও। ড্রইংরুম এটা। কিন্তু কেউ নেই। এগিয়ে চলল ওরা। কয়েকটা কামরা ছাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। মি. সিম্পসন ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন। শহীদ সামনের ঘরের দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'এটা ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিলাম, কিন্তু কোন সাড়া নেই। মনে হচ্ছে, ভাঙতে হবে। ফোন করা দরকার থানায়, শক্ত-সমর্থ লোক দরকার।'

চলে গেলেন মি. সিম্পসন ফোন করতে। বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়াতে শুরু করল শহীদ। চোখ তুলে এদিক-ওদিক দেখছে ও। আবদুর রহমানের ঘরের'পর আরও দুটো ঘর দেখা যাচ্ছে। সেগুলোর দরজা-জানালাও বন্ধ, তবে বাইরে থেকে। বাঁ দিকে বাথরুম। ঘরের ভিতর থেকেই বাথরুমে যাবার দরজা, অনুমান করল শহীদ।

মি. সিম্পসন দ্রুত ফিরে এলেন ফোন করে। শহীদকে জানালেন, 'পনের মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে ওরা।'

শহীদ উত্তর না দিয়ে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পর শহীদ রহমানের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখল

ও। তারপর অধৈর্য স্বরে মি. সিম্পসনকে বলল, 'চেষ্টা করে দেখলে হয়, দু'জনের ধাক্কায় ভেঙে যেতে পারে দরজাটা।'

পিছিয়ে এল শহীদ। মি. সিম্পসনও দাঁড়ালেন ওর পাশে। শহীদ মুখ খুলল, 'এক…দুই…তিন।'

দু'জন প্রচণ্ডবেগে দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল বন্ধ দরজার গায়ে। ভাঙল না তবু। কেবল শব্দ হল ভাঙার। শহীদ বলল, 'হবে, আর একটা ধাক্কা লাগবে।'

পিছিয়ে এসে আগের মত আবার দু'জন মিলে মারল ধাক্কা। কজা খুলে ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা দুটো। ধীরে ধীরে ঢুকল শহীদ ঘরের ভিতর।

ঘরের মাঝখানে একটা খাট। খাটের উপর পাশ-ফেরা অবস্থায় পা গুটিয়ে শুয়ে আছে একজন যুবক। নিঃসাড়। নিখুঁতভাবে দ্বিখণ্ডিত যুবকের গলা। দূর থেকে দেখে মনে হয়, কিছুই হয়নি, যুবক ঘুমাচ্ছে।

রক্তে একাকার হয়ে গেছে বিছানার চাদর। গলাটা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে অনেক আগে। রক্ত জমে গেছে। যুবকের হাত দুটো আঁকড়ে ধরে আছে বিছানার একটা বালিশ। বালিশের একপাশে একটা ধারাল ক্ষুর।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাশটা দেখল শহীদ। যুবকের বাঁ হাতের আঙুলে একটা আংটি দেখল ও। আংটিতে দুটো ক্যাপিটাল লেটার – A. R.

লাশের কাছ থেকে সরে এসে ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল শহীদ। বাথরুমের দরজা খোলা। ঘরের একটিমাত্র জানালাও খোলা। মি. সিম্পসন বিমূঢ়তা কাটিয়ে বলে উঠলেন কাঁপা স্বরে, 'খুন, না আত্মহত্যা, শহীদ?'

শহীদ টেবিলের উপর থেকে একটা দাড়ি কামাবার কেস তুলে নিয়ে দেখছিল মনোযোগ দিয়ে। ধারাল ক্ষুরটা এই দাড়ি কামাবার কেস থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে বুঝতে পারল ও। টেবিলের উপরে ফিলিপ্‌স্ কোম্পানির ইলেকট্রিক রেজারটাও চোখে পড়ল ওর। কুঁচকে উঠল ভুরু দুটো। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও মি. সিম্পসনের দিকে। সিম্পসন আবার অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় আত্মহত্যা, শহীদ! খুন করে এ ঘর থেকে পালাবে কেমন করে খুনী? জানালা খোলা ছিল বটে একটা, কিন্তু গ্রিল-সিস্টেম নেই। এ আত্মহত্যা না হয়েই যায় না।'

'সে-রকম ধারণাই হয় বটে।'

মি. সিম্পসন উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'ধারণা বলছ কেন? নিশ্চিত করে বলা যায়, এটা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। মিস সুরাইয়ার সাথে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না আবদুর রহমানের, এ কথা জেরার সময় সকলেই স্বীকার করেছেন। হয়ত মিস সুরাইয়া পূর্বওয়াদা মোতাবেক বিয়ে করতে চাননি আবদুর রহমানকে। বিশ্বাসঘাতকতার সাজা দেবার জন্যেই মিস সুরাইয়াকে হত্যা করেছে সে।'

শহীদ নির্ভেজাল কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু মিস সুরাইয়ার

চাকর-বাকর কি দোষ করেছিল, বলুন দেখি?'

'চাকর-বাকররা সাক্ষী দেবে সন্দেহ করেই ঠাণ্ডা মাথায় সবগুলোকে খতম করে দিতে হয়েছে ওকে। তখন ওর মধ্যে অনুশোচনা জন্মায়নি, আত্মহত্যার কথা ভাবেনি তখনও। বাড়িতে ফিরে অনুশোচনার জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে। লক্ষ্য করেছ শহীদ, মিস সুরাইয়াকে যে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সে অস্ত্র পাওয়া যায়নি তার বাড়িতে। কারণটা কি? রহমান যেটা সাথে করে নিয়ে এসেছিল সেটা দিয়েই আত্মহত্যা করেছে ও। ঐ দেখ, ধারাল ক্ষুরটা।'

শহীদ বলে উঠল, 'মিস সুরাইয়া বেগমের বাড়ির চাকর-বাকরগুলোকে খুনী হত্যা করেছে এই জন্যে যে, খুনীকে তারা চিনত। কিন্তু খুনী আবদুর রহমান নয়।'

'কেন?'

'কেননা, যে দাড়ি কামাবার বাক্স থেকে ক্ষুরটা নেয়া হয়েছে সেটা আবদুর রহমানের নয়। আবদুর রহমানের ইলেকট্রিক রেজার রয়েছে। খুনী বা খুনীরা ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র করে ব্যাপারটাকে সাজাতে চেষ্টা করেছে যেভাবে আপনি ভাবছেন সেভাবেই। মিস সুরাইয়াকে যদি আবদুর রহমান খুন করেই থাকে ধারাল ক্ষুরটা দিয়ে, সেটাকে সে কষ্ট করে বয়ে বাড়িতে আনল কেন? তখন তো তার আত্মহত্যার ইচ্ছা ছিল না। রিভলভার ফেলে সে সামান্য একটা ক্ষুরের মায়ায় পড়ে গেল, বলতে চান? নাহ্, আমার কোন সন্দেহ নেই, যে আবদুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে।'

মি. সিম্পসন কঠিন প্রশ্নবাণটি ছাড়লেন এবার, 'তাহলে খুনী পালাল কোন্ পথে? বাতাসে মিলিয়ে গেছে, তুমি বলতে চাও?'

চিন্তিতভাবে মি. সিম্পসনের দিকে তাকাল শহীদ। পরমুহূর্তে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল, 'বাতাসে মিলিয়ে যাবে কেন? খুনী পালিয়েছে বাথরুম দিয়ে।'

কিন্তু মি. সিম্পসন অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, বাইরে থেকে আগেই দেখেছি আমি, বাথরুমের আর কোন দরজা জানালা নেই।'

শহীদ পলকের মধ্যে চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। চমকে উঠেছে সে মি. সিম্পসনের কথা শুনে। বাথরুমের খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি ফেলেই ফিসফিস করে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'সাবধান মি. সিম্পসন! খুনী তাহলে বাথরুমেই লুকিয়ে আছে!'

দু'জনেই বিদ্যুৎবেগে হাত ঢুকিয়ে দিল প্যান্টের পকেটে। রিভলভারটা বের করে ফেলেছিল শহীদ। কিন্তু পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল ও, 'শুয়ে পড়ুন!'

বিদ্যুৎবেগে ডাইভ দিল শহীদ। ছিটকে সরে পড়লেন মি. সিম্পসন বিপদ টের পেয়ে।

গোল একটা বস্তু এসে পড়ল মেঝেতে খোলা বাথরুমের দরজার আড়াল

থেকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কর্ণ বিদারী শব্দ হল একটা। বোমা ফাটার বিকট শব্দ। কেঁপে উঠল মি. সিম্পসনের সারা পৃথিবী। ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ…তারপর আর কিছু মনে নেই তাঁর।

কামাল ভেসপা নিয়ে ধূসর-রঙয়ের একটা ফোক্সওয়াগেনকে ফলো করছিল। ফোক্সওয়াগেনের চালকের মাথায় হ্যাট দেখে, চোখে রঙিন সানগ্লাস দেখে এবং হাতে গ্লাভস দেখে কামাল প্রথমে চমকে উঠে ভেবেছিল—লোকটা কঙ্কাল!

কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখার সুযোগ পেল ও খানিকক্ষণ পরেই। ফোক্সওয়াগেনটা গিয়ে থামল ধানমণ্ডিস্থ মি. সারওয়ারের বাড়ির সামনে। ছদ্মবেশী চালক নামলেন গাড়ি থেকে। কামাল না থেমে নির্বিকারভাবে গাড়ির পাশ দিয়ে সামনের রাস্তা ধরে ছুটে গেল। পাশ দিয়ে যাবার সময় ছদ্মবেশী ভদ্রলোককে চিনতে পারল ও। কঙ্কাল বলে সন্দেহ হল না। ওসমান গনি ছদ্মবেশে মি. সারওয়ারের বাড়ি এসেছেন। এ ব্যাপারে কামালের আর কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু ওসমান গনিই বা ছদ্মবেশে কেন? উদ্দেশ্য কি তাঁর। তবে কি কঙ্কাল রহস্যের সাথে এরা জড়িত? নাকি দুজনের মধ্যে একজন সোলায়মান চৌধুরী?

সামান্য কিছুদূর গিয়েই ভেসপা ঘুরিয়ে মি. সারওয়ারের বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করতে লাগল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও মি. সারওয়ারের বাড়ির দিকে।

প্রায় দশ মিনিট পর হোণ্ডা চালিয়ে একজন ইংরেজ মি. সারওয়ারের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠল কামাল। ইংরেজটা হেস্টিংস বা বব নয় তো? তা যদি হয়, তাহলে সোলায়মান চৌধুরীর সাথে এসব ব্যাপারের সম্পর্ক না থেকেই যায় না। ইংরেজটার হাতে একটা অ্যাটাচী-কেস দেখা গেল। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সে। আবার বের হয়ে এল দু'মিনিটের মধ্যেই। কামাল আশ্চর্য হয়ে গেল। অ্যাটাচী-কেসটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না লোকটার হাতে।

হোণ্ডা চালিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই চলে গেল ইংরেজটা। এরপর দশ মিনিট কেটে গেল। দশ মিনিট পর বাড়িটা থেকে বের হলেন মি. সারওয়ার এবং ওসমান গনি। সারওয়ারের হাতে অ্যাটাচী-কেসটা দেখা যাচ্ছে। ওসমান গনির দাঁড় করানো গাড়িতে চড়ে বসলেন দু'জন। ড্রাইভিং সিটে বসলেন মি. সারওয়ার। অ্যাটাচী-কেসটা তাঁর কোলে। গাড়ির মুখ ঘুরে গেল। কামাল নিজের ভেসপায় চড়ে বসেছে ইতিমধ্যে। অনুসরণ করবে ও ফোক্সওয়াগেনটাকে।

তীব্র বেগে ছুটে চলেছে ফোক্সওয়াগেন মিরপুর রোড ধরে। মোড় নিল টেকনিক্যাল স্কুলের সামনে। সিধে এগিয়ে চলল তীব্র বেগে এক নম্বর মোহাজের কলোনীর দিকে। দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে লেগে রইল কামাল। এক নম্বর কলোনী বাঁয়ে রেখে মোড় নিল ফোক্সওয়াগেনটা। খানিকটা গিয়ে বিরাট এক রোড-

আইল্যাণ্ডের কাছে মোড় নিল আবার। এগিয়ে চলল গাড়ি কলোনীর পাশ দিয়ে। মিরপুর চিড়িয়াখানার দিকে এগোচ্ছে ফোক্সওয়াগেনটা।

চিড়িয়াখানা রোডটার অবস্থা খুবই খারাপ। এবড়োখেবড়ো পথ দিয়ে ঝাঁকানি খেতে খেতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে ঘন বন। বনের মাঝ দিয়ে কোথাও কোথাও অপ্রশস্ত পথ। যে-কোন মুহূর্তে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ফোক্সওয়াগেন। কিন্তু সিধে চিড়িয়াখানাতেই গিয়ে থামল সেটা। পশু-পক্ষীর খাঁচাগুলোর বাঁ পাশে দাঁড়াল গাড়ি। কামাল দূরের একটা কাঁঠাল গাছের আড়ালে দাঁড় করাল ভেসপা। গাড়ি থেকে নামলেন মি. সারওয়ার এবং ওসমান গনি। চোখে চোখে তাকিয়ে কি যেন কথা হয়ে গেল ওঁদের মধ্যে। অ্যাটাচী-কেসটা মি. সারওয়ারের হাতে দেখা যাচ্ছে। খাঁচাগুলোর পাশ দিয়ে পুবদিকে হাঁটতে শুরু করলেন দু'জন। এদিক-ওদিক তাকালেন। চট্ করে একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল কামাল। হাঁটতে হাঁটতে ভালুকের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ওঁরা দু'জন। কামাল ভেসপা রেখে এগিয়ে এল খানিকটা। দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আগু-পিছু ডান-বাঁ ভাল করে জরিপ করে নিলেন তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফিরে এলেন গাড়ির কাছে। ওঁদের এই আচরণের কোন কারণই খুঁজে পেল না কামাল। গাড়িতে চড়লেন ওঁরা। কামাল বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল দূর থেকে গাড়িটার দিকে। স্টার্ট নিল ফোক্সওয়াগেন। এসেছিল দক্ষিণদিক থেকে কিন্তু সেদিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে চলতে শুরু করল গাড়িটা। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কামাল।

গাড়িটা যখন প্রায় আড়াইশ'-তিনশ' গজ দূরে চলে গেছে তখন হঠাৎ খচ্ করে একটা প্রশ্ন খোঁচা মারল কামালের মগজে। গাড়ি নিয়ে ওঁরা ওদিকে যাচ্ছেন কেন? চিড়িয়াখানা থেকে গাড়ি বের করার কোন রাস্তা তো ওদিকে নেই!

ছুট দিল কামাল। হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড় করানো ভেসপার কাছে এসে পড়ল ও। স্টার্ট দিয়েই চড়ে বসল সেটায়। দূরে তাকিয়ে দেখল ঘন জঙ্গলের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফোক্সওয়াগেন। তীব্র বেগে কামাল ভেসপা ছুটিয়ে দিল। ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফোক্সওয়াগেন।

ধুলোর ঝড় উড়িয়ে এগিয়ে চলেছে কামালের ভেসপা। ফোক্সওয়াগেন যেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না গাড়িটাকে। যথাস্থানে পৌঁছে নেমে পড়ল কামাল। ভেসপার এঞ্জিন বন্ধ করে কান পাতল ও। কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অর্থাৎ হয় গাড়িটার এঞ্জিন বন্ধ করে রাখা হয়েছে নয়ত গাড়িটা বহুদূরে চলে গেছে। চলে গেছে বলে বিশ্বাস হল না কামালের। ভেসপাটাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখল। তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। মেঠো প্রশস্ত বহু পথ আছে মিরপুর চিড়িয়াখানায়। মাঝে মাঝেই এমন ঘন সন্নিবেশিতভাবে গাছাপালা দেখা যায় যে, জায়গাটাকে

জঙ্গল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

মিনিট পাঁচেক ধরে একই জায়গায় চক্কর মারতে লাগল কামাল। গোলক-ধাঁধার মত ব্যাপার। কোথা থেকে কোথায় পৌছেছে বোঝা দায়। অবশেষে মরিয়া হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল কামাল। বেশিদূর নয়, মাত্র শ'খানেক গজ যেতেই আনন্দে চকচক করে উঠল ওর চোখ দুটো। একটা বড়সড় ঝোপের আড়ালে দেখা যাচ্ছে ধূসর রংয়ের সেই ফোক্সওয়াগেনটা।

চলার গতি মন্থর করল কামাল। গাড়ির ভিতরে কেউ বসে আছে কিনা, বোঝা মুশকিল। পা টিপে টিপে এগোতে লাগল ও। উত্তেজনায় কপালে ঘাম ফুটে উঠছে। আরও একটু এগোতে ও বুঝতে পারল, গাড়িতে কেউ নেই। তাহলে গাড়ি এখানে লুকিয়ে রেখে ওরা গেল কোথায়? প্রশ্ন জাগল বিস্মিত কামালের মনে। গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল ও। কান পাতল হঠাৎ। কোথায় যেন কিরকম একটা শব্দ হচ্ছে। বেশ দূরে বলে অনুমান হচ্ছে। কিন্তু ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছে শব্দটা তা বুঝতে পারল না কামাল। অনুমানের উপর নির্ভর করে এগিয়ে গেল ও একদিকে। মিনিট তিনেক ধরে হেঁটে কোন লাভই হল না। যথাস্থানে ফিরে এল ও আবার। আর একদিক ধরে এগোল অনেকটা। কিন্তু এবারও শব্দের উৎস খুঁজে পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে আধঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা হয়ে গেছে মি. সারওয়ার এবং ওসমান গনি চোখের আড়াল হয়েছে কামালের। শব্দটা আবার কান পেতে শুনল ও। তারপর অন্য আর একদিক ধরে দ্রুত এগোতে লাগল। মিনিট পাঁচেক জংলী-পথ ধরে হাঁটার পর চিড়িয়াখানার শেষ সীমানার কাছাকাছি এসে পড়ল কামাল। শব্দটা অতি নিকটে, শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। কৌতূহলে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হল কামালের। সতর্ক পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ও। সামনেই একটা ঝোপ।

ঝোপটার কাছে গিয়ে পৌছুতেই চমকে উঠল কামাল। শব্দটা থেমে গেল পরমুহূর্তেই। সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখ। একি! এ যে হত্যার ষড়যন্ত্র!

মি. সারওয়ারের হাতে একটা কোদাল দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে তিনি প্রাণপণে মাটি কাটছিলেন। 'মাটি কাটছিলেন' না বলে বলা উচিত, কবর খুঁড়ছিলেন ওসমান গনির।

শিউরে উঠল কামাল। মি. সারওয়ার কপালের ঘাম মুছছেন কাঁপা হাতে। তাঁর পায়ের সামনে নিঃসাড় পড়ে রয়েছে ছদ্মবেশী ওসমান গনির লাশ। দূর থেকে দেখেই কামাল অনুমান করল, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওসমান গনি। ঝুঁকে পড়লেন মি. সারওয়ার। ওসমান গনির লাশটা টেনে টেনে কবরের ভিতরে নামিয়ে দিলেন। তারপর অ্যাটাচী-কেসটা ফেলে দিলেন কবরের ভিতরে। দ্রুত হাতে কোদাল দিয়ে মাটি ফেলে ভরে ফেলতে শুরু করলেন বিরাট গর্তটা। চোখের

সামনে এমন নৃশংস কাণ্ড দেখে শিউরে উঠল কামাল।

দেখতে দেখতে কবরে মাটি চাপা দেয়া শেষ করলেন মি. সারওয়ার। চঞ্চল, ভীত, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাঁকে। এক মুহূর্ত দেরি করলেন না তিনি। চারদিক ভাল করে একবার দেখে নিলেন। তারপর কোদালটা তুলে কাছের একটা গাছে কোপ মেরে দু'জায়গায় ছাল তুলে ফেললেন। সম্ভবত একটা চিহ্ন রেখে যাবার জন্যেই করলেন এটা। হনহন করে হেঁটে আসতে লাগলেন এবার মি: সারওয়ার। চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে সিধে কামালের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিল কামাল। এখন কিছু করবে না ও। শহীদকে সব কথা জানানো দরকার সর্বপ্রথম। ওর পরামর্শ না নিয়ে এই জটিল রহস্যের জট ছাড়ানো মুশকিল।

কামালকে দেখতে পেলেন না, হনহন করে হেঁটে যেতে লাগলেন মি. সারওয়ার। সিধে চলেছেন তিনি রেখে আসা ফোক্সওয়াগেনের দিকে। মি. সারওয়ার অদৃশ্য হয়ে যেতেই কামাল ওসমান গনির কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কী যেন ভাবল ও গভীরভাবে। তারপর জায়গাটা চিনে রাখবার জন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল চারদিক। দেখা হয়ে যেতে দ্রুত পায়ে হাঁটা শুরু করল ও।

জঙ্গলের বাইরে বের হয়ে এসে কামাল মি. সারওয়ার বা তাঁর ফোক্সওয়াগেনটাকে দেখতে পেল না আর। চলে গেছে লোকটা নিজের কাজ সেরে। ভেসপায় স্টার্ট দিল কামাল। চিড়িয়াখানার অফিচার-ইন-চার্জের অফিস-রুমের সামনে এসে নামল ও। পরিচয় বিনিময়ের পর ফোন করার অনুমতি দিলেন অফিসার। শহীদের বাড়িতেই ফোন করল ও। কিন্তু উত্তর দিল না কেউ-ই। বারবার ডায়াল করেও কোন ফল হল না। রিং হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলছে না কেউ। কারণ কি? ভাবল কামাল—শহীদ না হয় নেই, কিন্তু মহুয়া বৌদি, লীনা, ইসলাম চাচা, গফুর—এরা কোথায় গেছে বাড়ি ছেড়ে! তবে কি কোন অস্বাভাবিক অঘটন ঘটেছে!

মনটা নিদারুণ আশঙ্কায় ভরে উঠল কামালের। অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভেসপায় এসে চড়ল ও।

বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়ে দিল ভেসপাটা শহরের দিকে।

মিরপুর রোডের উপর দিয়ে ছুটছে কামালের ভেসপা। হাত দেখাল ট্রাফিক। কিন্তু গ্রাহ্য করল না কামাল। বুকের ভিতর কে যেন ঘন ঘন হাতুড়ি পিটছে ওর। মহুয়া বৌদি, লীনা, ইসলাম চাচা এবং গফুরের জন্যে, কেন কে জানে, বড় আশঙ্কা হচ্ছে তার। শহীদের বাড়ি না থাকার একটা কারণ আছে, কিন্তু আর সবাই বাড়ি খালি করে গেল কোথায়?

কামালের ভেসপাটাকে পাশ কাটিয়ে একটা ফিয়াট দ্রুতবেগে চলে গেল মিরপুরের দিকে। কামাল এখন নিউ মার্কেটের কাছে পৌছে গেছে। ফিয়াটের দিকে তাকিয়েও দেখেনি ও। গভীর দুশ্চিন্তায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কিন্তু ফিয়াটের

দিকে চোখ মেলে তাকালে লাভই হত ওর। গাড়িটার ব্যাক-সিটে দুটো মানুষের দেহ পড়ে রয়েছে দেখতে পেল ও। দু'জনেরই গা ঢেকে দেয়া হয়েছে সাদা সিল্কের চাদর দিয়ে। গাড়ির চালক একজন ইংরেজ। লাল শার্ট তার পরনে। তার পাশেই শহরের কুখ্যাত গুণ্ডা গুল খাঁ। সিল্কের চাদরের নিচের মানুষ দুটোর দেহ আর কারও নয়—একটা মহুয়ার, অপরটা লীনার!

তিন

সেই অন্ধকার থাকতে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছিল শহীদ। দেখতে দেখতে ফিরে আসার সময় পার হয়ে গেল। আরও ঘন্টাখানেক পর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মহুয়া। কোনদিন তো সূর্য ওঠার পরে বাইরে থাকে না শহীদ! আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? গফুরকে পাঠাল মহুয়া। গফুর সম্ভাব্য সব জায়গা থেকে ঘুরে এল ব্যর্থ হয়ে। শহীদের কোন খবর পায়নি সে। দুঃসংবাদই বলতে হবে। এমন তো কোনদিন হয় না। শ্বশুরকে দ্বিতীয় কাপ চা দেবার সময় খবরটা জানাল মহুয়া। চিন্তিত হয়ে পড়লেন ইসলাম সাহেব। ব্যস্ত-সমস্তভাবে ফোন করলেন থানায়। থানা থেকে কেউ কিছু বলতে পারল না! মহুয়া ফোন করল মি. সিম্পসনের অফিসে। কিন্তু পাওয়া গেল না মি. সিম্পসনকে। দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ফুটে উঠল বাড়ির সকলের মুখে। কোন খবর না জানিয়ে গেল কোথায় শহীদ? কামালকে ফোন করা হল। কিন্তু আশ্চর্য, পাওয়া গেল না কামালকেও। তবে কি মি. সিম্পসন, শহীদ আর কামাল হঠাৎ কোন জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছে? কিন্তু প্রবোধ মানল না কারও মন। বেলা বারটার দিকে বেরিয়ে পড়লেন ইসলাম সাহেব ছেলের খোঁজে। গফুর কাঁদকাঁদ মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির গেটের কাছে। মহুয়া আর লীনা ঘর-বার করে বেড়াতে লাগল পাংশু মুখে। কেউ কাউকে কিছু না বললেও সকলের মনেই আশঙ্কা জাগছিল—কঙ্কাল কোন ভয়াবহ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়নি তো শহীদকে।

বেলা দেড়টার সময় শুকনো মুখে ফিরে এলেন ইসলাম সাহেব। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। মিনিট দশেক বিশ্রাম নেবার পর থানায় গিয়ে খবর নেবার জন্যে আবার বের হয়ে পড়লেন তিনি। পায়চারি করার ক্ষমতাও এদিকে হারিয়ে ফেলেছে মহুয়া। অমঙ্গল আশঙ্কায় কালো হয়ে গেছে তার মুখ। ড্রইংরুমে লীনাকে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে। খানিক পরপরই লীনা ফোন করছে কামালকে। কিন্তু কামালের কোন পাত্তা নেই।

গফুর গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনে। দাদামনির খোঁজে পৃথিবী চষে ফেলার অদম্য ইচ্ছায় ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল সে। কিন্তু দিদিমণিদেরকে একা রেখে বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা উচিত নয় বুঝতে পেরেই বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

বেলা তখন দুটো। অধীর অপেক্ষায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে গফুর। ইসলাম সাহেব ফিরে আসেননি এখনও। লীনা আবার ডায়াল করছে কামালের নাম্বারে। মহুয়া বসে আছে গালে হাত দিয়ে। এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল। শব্দটা শুনতে পেল না লীনা বা মহুয়া। কেন না গাড়িটা থেমেছে বাড়ির কাছ থেকে সামান্য দূরে।

গফুর আশায় আশায় তাকিয়ে ছিল গাড়িটার দিকে। দু'জন লোক নামল ধীরে ধীরে। আশ্চর্য, লোক দু'জন তার দিকেই এগিয়ে আসছে হাসিমুখে। দু'জনের মধ্যে একজন ইংরেজ। দ্বিতীয়জনও বাঙালী নয়, পাঞ্জাবী। গফুরের দিকে তাকিয়ে হাসছে ওরা। এগিয়ে আসছে।

বেশ একটু অবাকই হয়ে পড়ল গফুর। লোক দুটো তার সামনে এসে দাঁড়াল। ইংরেজটা হাত বাড়িয়ে দিল গফুরের দিকে হাসিতে মুখ ভরিয়ে। করমর্দন জীবনে কারও সাথে করেনি গফুর। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাতটা অবশ্য বাড়িয়ে দিল সে। ইংরেজের পরে মোটা পাঞ্জাবীটার সাথেও করমর্দন করতে হল। পাঞ্জাবীটা হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে হাতের একটা মাঝারী আকারের বাক্স দেখিয়ে বলল, 'মি. শহীদ ইয়ে বাকসা ভেজ দিয়ে হ্যায়। শহীদ সাহাবের মিসেসকে হামি এটা দিতে চাই। সমঝা, দোস্ত?'

গফুর আগ্রহাতিশয্যে জানতে চাইল, 'কি আছে ওতে, সাহেব?'

'রুপিয়া আছে, রুপিয়া। শহীদ সাহাবের খত ভি আছে।'

গফুর বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'খত কি?'

'খত বুঝে না? খত, ইয়ানে লেটার, ইয়ানে চিট্‌ঠি।'

'দাদামণির চিঠি আছে! দাদামণি কোথায়? কই, দিন দেখি আমাকে বাক্সটা?'

পাঞ্জাবী বাক্সটা গফুরকে না দিয়ে ইংরেজকে দিল রাখতে। বলল, 'তোমাকে হামি এটা দিতে পারি না, দোস্ত। শহীদ সাহাবের বিবিকে দিতে হোবে।'

'তাহলে চলুন আমার সাথে?'

'চোলো, দোস্ত।'

ঘুরে দাঁড়াল গফুর। বাড়ির ভিতরে ঢুকল সে লম্বা লম্বা পা ফেলে। পাঞ্জাবীটাও গফুরের পিছু পিছু ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। ইংরেজটাও ঢুকল, তবে সে একটু পিছনে রয়ে গেল। গফুর পিছন ফিরে তাকাল না একবারও। ফলে, আকস্মিক হামলা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কিছুই বুঝতে পারল না ও পাঞ্জাবীটা হঠাৎ পিছন থেকে খপ্ করে চেপে ধরল গফুরের গলাটা সাঁড়াশির মত। প্রচণ্ড শক্তি লোকটার দুই হাতে। টুঁ শব্দটি করার সুযোগও পেল না গফুর। পাঞ্জাবীটা নিঃশব্দে প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরে রেখেছে তার গলা। হাত-পা ছোঁড়ার ক্ষমতাটুকুও সাথে সাথে লোপ পেল তার। জ্ঞান হারাল সে এক মিনিটেই। পরমুহূর্তে জ্ঞানহীন দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বারান্দার উপর উঠে এল পাঞ্জাবীটা। বাথরুমের দরজা খোলা

দেখে ঢুকে পড়ল গফুরকে নিয়ে। আধ মিনিট পর বেরিয়ে এল সে অচেতন দেহটা বাথটাবে শুইয়ে রেখে।

ইংরেজটা বাড়িতে ঢুকে দাঁড়িয়ে ছিল একই জায়গায়। পাঞ্জাবীটা তাকে সাথে নিয়ে বাড়ির গেটের কাছে ফিরে গেল আবার। সেখান থেকে কলিংবেল টিপল সে।

বেলের শব্দ শুনে মহুয়া ও লীনা উদ্বিগ্ন মুখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ওদেরকে দেখে মৃদু-মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল লোক দু'জন। বাক্সটা এখন আবার পাঞ্জাবীটার হাতে। লীনা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'গফুরটা গেল কোথায়?'

মহুয়া বলল, 'আশপাশেই কোথাও আছে হয়ত। কোথাও গেলে বলে যেত। এরা কারা বল তো?'

পাঞ্জাবী আর ইংরেজটা হাসতে হাসতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। নুয়ে পড়ে সালাম করল পাঞ্জাবীটা মহুয়াকে। মহুয়া জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান আপনারা?'

পাঞ্জাবীটা বিগলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আপ্ তো শহীদ সাহাবের মিসেস?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'শহীদ সাহাব বহুত বড়া এক ডাকুকে পাকড়াও করেছেন। বাড়ি ফিরতে তার দের হোবে। এই বাক্সটা হামকো দিল আপনার কাছে পৌছা দেনেকে লিয়ে। এতে বহুত টাকা ভি আছে, চিট্‌ঠি ভি আছে একঠো!'

মহুয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লোক দু'জনকে। তারপর বলল, 'কই দেখি?'

বাক্সটা এগিয়ে দিল পাঞ্জাবীটা। মহুয়া টিপ-তালা টেনে খুলতে যেতেই পাঞ্জাবীটা বলে উঠল, 'নেহি, বিবিসাব, নেহি! ইধার নেহি, ঘর মে যাকে এটা খুলবার এন্তেজাম করুন। বহুত রুপিয়া আছে কিনা!'

মহুয়া কোন কথা না বলে বাক্সটা নিয়ে ড্রইংরুমের দিকে চলল। পাঞ্জাবীটা পিছন থেকে বলে উঠল, 'রুপিয়া গুণে হামাকে একঠো চিট্‌ঠি লিখে দিবেন।'

লোক দু'জনকে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে মহুয়ার। নিশ্চয় কোন বদ মতলব আছে ওদের। ড্রইংরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবল একবার। লীনার পরামর্শে দরজা বন্ধ না করে অন্য একটা দরজা দিয়ে বেডরুমে গিয়ে বসল ওরা। বাক্সটা বিছানার উপর রেখে খোলার চেষ্টা করল মহুয়া। ঝুঁকে পড়ল লীনাও ভিতরে কি আছে দেখার জন্যে।

বাক্সের ডালাটা খোলামাত্রই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখল মহুয়া। বাক্সের ভিতরে একটা কৌটো। কৌটোটা তুলোর উপর রাখা। বাক্সের ডালা খোলার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল কৌটোর মুখটা। পলকের মধ্যে অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করল। কৌটোটা শুধু পলকের জন্যে দেখতে পেল ওরা। পরমুহূর্তে সেই কৌটোর ভিতর থেকে অদ্ভুত এক প্রকার মিষ্টি গন্ধযুক্ত ধোঁয়া

বেরিয়ে প্রবেশ করল নাকে। মহুয়া হতবাক হয়ে গিয়ে মুখ সরিয়ে তাকাবার চেষ্টা করল লীনার দিকে। কিন্তু মাথাটা তুলতে পারল না ও। ঢলে পড়ল বিছানার উপর জ্ঞান হারিয়ে। মহুয়ার জ্ঞানহীন দেহটার উপর লুটিয়ে পড়ল লীনার জ্ঞানহীন দেহ।

মিনিটখানেক পরই ইংরেজ আর পাঞ্জাবীটা খুঁজতে খুঁজতে বেডরূমে এসে ঢুকল। নিঃশব্দে দু'জন তুলে নিল মহুয়া আর লীনার অচেতন দেহ দুটো।

নির্জন বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজেদের ফিয়াটের পিছনের সিটে শুইয়ে দিল ওরা মহুয়া আর লীনাকে। সিল্কের একটা চাদর আগে থেকেই রাখা ছিল গাড়িতে। সেটা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল দু'জনের দেহ। বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল গাড়িটা অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে।

জ্ঞান ফিরে আসছে মহুয়ার। বিকট চিৎকার করছে কে যেন করুণস্বরে। প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানছে কানের পর্দায় আর্তধ্বনিটা। গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু মাথাটা বড় ঝিমঝিম করছে ওর। হাত দুটো কপালে তোলার চেষ্টা করল মহুয়া। কিন্তু পারল না, কিসে যেন চেপে ধরে রেখেছে ওর হাতজোড়া।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল মহুয়া। এদিক-ওদিক তাকাল। এ কি! চমকে উঠল মহুয়ার অন্তরাত্মা। মাথার উপর খোলা আকাশ কেন? চারদিকে এমন গহন জঙ্গল এল কোথা থেকে!

পলকের মধ্যে সব মনে পড়ে গেল মহুয়ার। উঠে বসতে চেষ্টা করল ও ঝট্ করে, পারল না। অনুভব করল এতক্ষণে, হাত-পা বাঁধা ওর। ঘাসের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। আর্ত চিৎকারটা পরিষ্কার চিনতে পারা যাচ্ছে এখন। হাহাকার রব উঠল বুকের ভিতর। লীনার ভয়ার্ত চিৎকার!

ঘাড় বাঁকিয়ে ডান দিকে তাকাল মহুয়া। অদূরেই ঘাসের উপর শুয়ে হাত-পা ছোঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে হতভাগিনী লীনা। তারও হাত-পা বাঁধা। লীনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই শয়তান। লাল-শার্ট পরা ইংরেজটা আর মোটা পাঞ্জাবীটা। কুৎসিত জিঘাংসায় জ্বলজ্বল করছে শয়তান দুটোর চোখগুলো। লীনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইংরেজ বদমাশটা। পাঞ্জাবীটা হি হি করে হাসছে।

ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে কান্না পেল মহুয়ার। দুচোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল তার। কোথায় শহীদ এখন? এই ভয়াবহ মুহূর্তে কেউ কি সাহায্য করবে না অসহায় দুই নারীকে!

নীরবে হাত-পা ঘষতে লাগল মহুয়া সর্বশক্তি দিয়ে। বাঁধন ছেঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ও। জ্ঞান এখনও ফেরেনি, মনে করে বদমাশ দুটো তারদিকে খেয়াল দিচ্ছে না। লীনার সর্বনাশ চোখ বুজে দেখতে পারবে না ও। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিজেকে মুক্ত না করা

গেলে লীনাকে রক্ষা করা যাবে না।

হঠাৎ চমকে উঠল মহুয়া। লীনার চিৎকার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মহুয়া দেখল এক ভয়াবহ দৃশ্য। কোথা থেকে যেন একজন লোক হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে চোখের সামনে। লোকটা কালো সুট পরা। হাতে গ্লাভস। চোখে সান-গ্লাস। মাথায় হ্যাট। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট হবে লোকটা। কিন্তু খুব রোগা-পাতলা। গায়ে তেমন ক্ষমতা নেই। কখন যে আবির্ভাব ঘটেছে বুঝতে পারেনি মহুয়া। কখন যে ইংরেজ আর পাঞ্জাবী বদমাশ দু'টো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর তাও বুঝতে পারেনি ও। দেখতে দেখতে কাবু করে ফেলল শয়তান দু'জন আগন্তুককে। পাঞ্জাবীটা রহস্যময় আগন্তুকের বাঁ হাতটা ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে মোচড় দিতে শুরু করেছে। ইংরেজটা আগন্তুকের একটা পা ধরে টানছে সর্বশক্তি দিয়ে। ভয়াবহ দৃশ্য। একটা হাত আর একটা পা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে এভাবে টানাটানি করতে থাকলে। কিন্তু আগন্তুকের মুখের চেহারায় কোন কষ্টের চিহ্ন নেই। শুধু নির্বিকারভাবে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ আলগা হয়ে গেল একটা হাত। পাঞ্জাবীর হাতে এসে পড়ল আগন্তুকের দেহচ্যুত বাঁ হাতটা। কিন্তু আশ্চর্য! রক্তের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। আগন্তুকের মুখেও ব্যথা-বেদনার কোনরকম প্রকাশ নেই।

ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল আবার লীনা তীক্ষ্ণস্বরে।

ইংরেজটা প্রচণ্ড ক্ষমতাধর। আগন্তুকের একটা পা ধরে হেঁচকা টান মেরে ঘোরাতে লাগল সে নিজের চারদিকে। খানিকক্ষণ পরই আগন্তুকের পা'টা রয়ে গেল ইংরেজটার হাতে। আগন্তুকের দেহটা ছুটে গিয়ে পড়ল কয়েক গজ দূরে।

চোখবন্ধ করে একনাগাড়ে চিৎকার করে চলেছিল লীনা। মহুয়াও ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁপাচ্ছিল। হঠাৎ আবার থেমে গেল লীনার চিৎকার। চোখ মেলে তাকাল মহুয়া। ঘাড় ফিরিয়ে যা দেখল তা ভোজবাজির চেয়েও অদ্ভুত!

খানিক পূর্বের পরাজিত রহস্যময় আগন্তুকের মতই হুবহু একই পোশাকে সজ্জিত একদল লোক ঘিরে ফেলেছে বদমাশ ইংরেজ আর পাঞ্জাবীটাকে। সংখ্যায় প্রায় বারজন ওরা। ধীরে ধীরে আক্রমণের ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে শয়তান দুটোর দিকে। অবিশ্বাসে কণ্ঠরোধ হয়ে এল মহুয়ার। একি স্বপ্ন দেখছে সে! বাস্তবে এ কি সম্ভব!

উত্তেজনায় দম বন্ধ হবার যোগাড় মহুয়ার। লীনারও সেই অবস্থা। রহস্যময় অলৌকিক লোকগুলোকে আলাদাভাবে চেনবার কোন উপায়ই নেই। প্রত্যেকেরই একই পোশাক। সকলেই সমান লম্বা। গায়ের রঙও সকলের এক। ভাব-ভঙ্গিও অভিন্ন। রহস্যময় বারজন মানুষ নয় ওরা, বারটা যন্ত্র যেন।

ইংরেজ আর পাঞ্জাবী বদমাশ দুটোর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে চারদিক থেকে। চোখ-মুখে ফুটে উঠেছে মৃত্যু-ভয়। যুদ্ধ করবার ক্ষমতা হারিয়ে অসহায় জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে দু'জন

ঘামছে দরদর করে।

পলকের মধ্যে আগন্তুক বারজন ঝাঁপিয়ে পড়ল বদমাশ দুটোর উপর। তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার কানে ঢুকল মহুয়ার। জাপটে ধরে ফেলল রহস্যময় আগন্তুকরা বদমাশ দু'জনকে। ভিড়ের চাপে বদমাশ দুটোর কি হাল হচ্ছে দেখতে পেল না মহুয়া। একটু পরেই ছড়িয়ে পড়ল রহস্যময় লোকগুলো। দু'জন শুধু রইল বদমাশ দু'জনের কাছে। শয়তান দুটোর হাত লোহার তার পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে। একটা গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে বাঁধা শুরু হল ওদেরকে। একজন রহস্যময় আগন্তুক মহুয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। আর একজন লীনার পাশে বসে পড়ে ধীরস্থিরভাবে খুলে দিচ্ছে তার হাত-পায়ের বাঁধন।

অকারণেই শিউরে উঠল মহুয়া। আগন্তুক তার পায়ের কাছে এসে বসল আস্তে আস্তে। অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল মহুয়ার কঙ্কালের কথা। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। কেঁপে উঠল ওর সর্বশরীর ভয়ে।

চার

হাত-বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দে টলে উঠেছিল যেন সমস্ত পৃথিবীটা। বোমা ফাটার আগেই মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল শহীদ। বিস্ফোরণের সাথে সাথে ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেল ওর সর্বশরীর। কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল ওর সব অনুভূতি এবং বোধ-শক্তি। চোখের পাতা বন্ধ। কানে ঢুকছে না কোন শব্দ। স্পর্শবোধও নষ্ট। সেই সময় কেউ যদি ওকে কেটে টুকরো টুকরো করতে শুরু করত তবু টের পেত না ও।

বারুদের গন্ধে মাথার ভিতরটা ঘুরে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরই স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল শ্রবণ শক্তি। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল শহীদ এক সময়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা করে উঠল চোখ দুটো। আবার বন্ধ করে ফেলতে হল চোখের পাতা। ঘরের ভিতরে রাশ রাশ ধোঁয়া। ঘরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মি. সিম্পসনকে নাম ধরে ডাকার কথাটা ভাবল শহীদ, কিন্তু রিস্ক নেয়া উচিত হবে না মনে করে ইচ্ছেটা দমন করল ও। বোমা মেরে শয়তানটা ওত পেতে ঘরের ভিতরই কোথাও বসে আছে কি না কে জানে। সামান্য একটু শব্দ কানে ঢুকলেই হয়ত আবার কিছু একটা করে বসবে শয়তানটা। তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকাটা বিচিত্র নয়।

নিঃশব্দে উঠে বসার চেষ্টা করল শহীদ। চোখ না খুলেই ধীরে ধীরে মেঝের উপর বসল ও। পকেটে হাত দিয়ে শুধু একটা কলম পাওয়া গেল। কলমটাই ছুঁড়ে মারল শহীদ একদিকে। সিধে দেয়ালে গিয়ে ঘা খেয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল সেটা। পরিষ্কার শব্দ কানে গেল শহীদের। কিন্তু আর কোন শব্দ কানে ঢুকল না।

শত্রু তাহলে ওত পেতে বসে নেই। বোমা মেরেই ভেগে গেছে।

'মি. সিম্পসন…!'

ডেকেও মি. সিম্পসনের সাড়া পেল না শহীদ। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। তবে কি আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন মি. সিম্পসন? চোখ মেলল শহীদ। সরে যাচ্ছে ধোঁয়া। কিন্তু এখনও ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না। হাত দিয়ে হাতড়াতে শুরু করল শহীদ। ঘরের একেবারে এক কোণের দিকে হাতড়াতে হাতড়াতে শহীদের হাত মি. সিম্পসনের দেহের স্পর্শ পেল। পরীক্ষা করে শহীদ বুঝতে পারল জ্ঞান হারিয়েছেন মি. সিম্পসন। আঘাত লেগেছে বাঁ দিককার কাঁধে। আর কোথাও আঘাত লেগেছে কিনা বুঝতে পারল না ও।

সময় নষ্ট না করে মি. সিম্পসনের অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে মেঝের উপর দাঁড়াল শহীদ। বাড়ির দিকে কয়েকজন লোকের উত্তেজিত স্বর এগিয়ে আসছে, শুনতে পেল শহীদ। ধোঁয়া বের হয়ে যাচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে দরজাটা। ধীরে ধীরে পা ফেলে দরজার দিকে এগোল শহীদ।

ধোঁয়াচ্ছন্ন ঘরের বাইরে বের হয়ে শহীদ দেখল, কয়েকজন পুলিস ছুটে আসছে বাড়ির উঠানের উপর দিয়ে। সবচেয়ে আগে একজন সাব-ইন্সপেক্টর। সাব-ইন্সপেক্টর শহীদকে দেখে চিনতে পারল মুহূর্তে। উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে, 'একি, স্যার! আপনি!'

শহীদ দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'মি. সিম্পসন আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। আমি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি এঁকে। ঘরের ভিতরে লাশ আছে একটা। মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। দুটো রিভলভার আছে ঘরের মেঝেতে। বাড়িটায় পাহারা মোতায়েন করে হাসপাতালে চলে আসুন আপনি রিভলভার দুটো নিয়ে। কমিশনারকেও খবরটা জানাতে ভুলবেন না!'

'ইয়েস, স্যার।'

শহীদ আর দাঁড়াল না। লম্বা পা ফেলে বাড়ির বাইরে এসে পড়ল ও। মি. সিম্পসনের জীপটা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অচেতন দেহটা সিটে শুইয়ে দিয়ে লাফ মেরে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল শহীদ। স্টার্ট দিতেই রাস্তার ভিড় সরে গিয়ে পথ করে দিল। উত্তেজিত জনতাকে দু'পাশে রেখে ছুটিয়ে দিল শহীদ জীপটাকে।

মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের হোমরা-চোমরা ডাক্তারদের স্বল্পক্ষণের প্রচেষ্টায় জ্ঞান ফিরে এল মি. সিম্পসনের। হাসি ফুটল শহীদের মুখে। শহীদের মুখের দিকে মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে মি. সিম্পসন বললেন, 'না হে, না। এত তাড়াতাড়ি অক্কা পাব না আমি। তোমাদের দোয়ায় আরও কয়েক কুড়ি বছর না বেঁচে পার পাচ্ছি না আমি।'

হেসে ফেললেন উপস্থিত ডাক্তাররা। শহীদ দু'একটা বিষয়ে আলাপ সেরে

নিল। ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে ওর মন। ভয়ঙ্কর শত্রুদল ওর বাড়িতেও হামলা চালাতে পারে, এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছে ও। ডাক্তাররা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'মি. সিম্পসনের আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। একদিনের জন্যে ধরে রাখব আমরা ওঁকে হাসপাতালে।'

মি. সিম্পসন শহীদের চঞ্চলতা বুঝতে পেরে বললেন, 'শহীদ, তুমি একবার বাড়ির খবরটা নিয়ে এস না কেন?'

শহীদ চিন্তিতভাবে বলল, 'আপনাকে এখানে নিয়ে আসার পর বাড়িতে ফোন করেছিলাম, কোন সাড়া পেলাম না।'

'বল কি?'

উত্তেজনায় উঠে বসতে চেষ্টা করলেন মি. সিম্পসন। নার্স ধরে ফেলল ওঁকে। আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখনও তুমি আমার জন্যে এখানে সময় নষ্ট করছ, শহীদ! না, না! এ তুমি ভাল করনি, আমার জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভুল করেছ তুমি।'

শহীদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাড়াহুড়ো করে বিশেষ কোন লাভ নেই। যদি কিছু অঘটন ঘটেই থাকে তাহলে আগে বা পরে পৌঁছুনোর মধ্যে বিশেষ কিছু এসে যায় না। আপনার অবস্থার উন্নতি না দেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আচ্ছা, এখন আসি আমি।'

'কোন খবর থাকলে জানাতে ভুল না কিন্তু,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন মি. সিম্পসন। মাথা নেড়ে বের হয়ে গেল শহীদ কেবিন থেকে।

দূর থেকেই বাড়িটাকে কেমন যেন শোকাভিভূত দেখে অমঙ্গল আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করে উঠল শহীদের বুক।

বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল ও চেঁচাতে চেঁচাতে, 'গফুর! গফুর!!...

তীরের মত ড্রইংরুম থেকে বের হয়ে এলেন বৃদ্ধ ইসলাম সাহেব।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, খোকা!'

'বাবা! কি হয়েছে?'

শহীদ ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল ইসলাম সাহেবকে। পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করেছে ইসলাম সাহেবের মুখের চেহারা। হতাশায়, আতঙ্কে মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন তিনি। শহীদ ধরে ধরে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল বাবাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'উত্তেজিত হবেন না, বাবা। বিপদের সময় উত্তেজিত হলে কোনই লাভ নেই। কি হয়েছে, ধীরে ধীরে বলার চেষ্টা করুন।'

ইসলাম সাহেব সাথে সাথে অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'কি হয়েছে তা কি আর আমি জানি, খোকা! তোর ফিরতে দেরি দেখে থানায় খবর নিতে গিয়েছিলাম আমি। ফিরেছি বেলা দুটোয়। দেখি, কেউ নেই বাড়িতে। বাড়ি খাঁখাঁ

করছে। বৌমার ঘরে শুধু একটা ছোট্ট বাক্স পড়ে থাকতে দেখলাম।'

শহীদ ঘড়ি দেখল। বেলা তিনটে। বাবাকে প্রশ্ন করল, 'ঠিক ক'টার সময় বের হয়েছিলেন আপনি?'

'তা তো মনে নেই! বারটা-সাড়ে বারটা হবে হয়ত।'

শহীদ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমি বাক্সটা দেখে আসি। আপনি শান্ত হয়ে বসুন। চিন্তা করবেন না, চেষ্টা করলে ওদের খবর পাবই। কামাল এসেছিল?'

নিরাশভাবে মাথা নেড়ে জানালেন ইসলাম সাহেব, 'না।'

শহীদ বসবার ঘর থেকে শোবার ঘরে এল। মেঝেতেই পড়ে আছে বাক্সটা। এ বাড়ির বাক্স নয় এটা, দেখেই বুঝল শহীদ। হাতে তুলে নিয়ে চমকে উঠল সে। বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ এসে ঢুকল ওর নাকে। বাক্সের ভিতরে তুলোর উপর রাখা কৌটোটা দেখে সব পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। গ্যাস ভর্তি কৌটোটা গরম থাকারই কথা। বাক্স যাতে উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে তার জন্যে তুলোর ব্যবস্থা। কিন্তু কেউ যদি এটা নিয়ে এ বাড়িতে এসেই থাকে, তবু বেডরুমে এটা এল কিভাবে? শহীদ চিন্তা করে নিল খানিক। তারপর অনুমান করল রহস্যটা। কেউ মহুয়া আর লীনাকে দিয়েছিল বাক্সটা ভুল বুঝিয়ে। ওরা শোবার ঘরে এসে খুলেছিল বাক্সটা। সাথে সাথে গ্যাসের দরুন অচেতন হয়ে পড়েছিল ওরা। কিন্তু তারপর? অচেতন দেহ দুটো সরালো কে? শত্রুরা তাহলে অপেক্ষা করেছিল! অচেতন দেহ দুটো নিয়ে ভেগে গেছে। শত্রু তাহলে একজন নয়, দু'জন বা আরও বেশি সংখ্যায় এসেছিল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কারণ?

নির্মম রেখা ফুটে উঠতে শুরু করল শহীদের অবয়বে। আগুনের শিখা ঠিকরে পড়ছে যেন দুই চোখের দৃষ্টি থেকে। হাতের মুষ্টি শক্ত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধীর পায়ে ফিরে এল ও ড্রইংরুমে। এই অপকর্মের জন্যে সোলায়মান চৌধুরী দায়ী সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই শহীদের মনে। শহীদকে শাস্তি দেবার জন্যে কাপুরুষের মত দুর্বল মেয়েদের উপর জুলুম করতেও বাধেনি শয়তানটার। চরম শাস্তি দিতেই হবে শয়তানকে, প্রতিজ্ঞা করল শহীদ। কিন্তু সবচেয়ে আগে মহুয়া, লীনা আর গফুরকে উদ্ধার করতে হবে।

'কি করবি ঠিক করলি, খোকা?' ইসলাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন শহীদের দিকে তাকিয়ে।

শহীদ উত্তর দেবার আগেই শোনা গেল একটা কাতর গোঙানির শব্দ। শব্দটা আসছে পাশের ঘর থেকে। ছুটে বের হয়ে গেল শহীদ।

পাশের ঘরে গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে হতবাক হয়ে গেল শহীদ। আবার শব্দ হলে চৌকির নিচেটা দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়ল শহীদ। চমকে উঠল ও। গফুর মাথা ঘষছে মেঝের সাথে চৌকির নিচে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে।

গফুরের শারীরিক কোন কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারল শহীদ! চৌকিটা খাড়া করে তুলে দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে দিল ও। চোখ মেলে তাকাল গফুর। দাদামণিকে ওর সামনে বসে থাকতে দেখে কাঁদকাঁদ হয়ে গেল ওর মুখ। শহীদ উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, এমন হাল কে করল তোর? তোর দিদিমণিরা কোথায়, জানিস?'

গফুর যা জানে সব বলল। সব শুনে কঠিন আকার ধারণ করল শহীদের মুখাবয়ব। এমন সময় বাড়ির গেটে শোনা গেল গাড়ি থামার শব্দ। ব্রেক কষে ধরার ফলে তীক্ষ্ণ শব্দ হল। ঘর থেকে বের হয়ে এল শহীদ। টলতে টলতে গফুরও এল বারান্দায়। ছুটতে ছুটতে গেট অতিক্রম করে আসতে দেখা গেল কামালকে। দরদর করে ঘামছে ও। চোখ-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন। শহীদের কাছাকাছি এসে হঠাৎ যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হল কামাল। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ও শহীদের দিকে। শহীদের এমন কঠিন, এমন ভীতিকর, এমন অদ্ভুত, গম্ভীর চেহারা আর কখনও দেখেনি কামাল। অমঙ্গল আশঙ্কায় দুলে উঠল ওর বুক। অস্ফুট কণ্ঠে ও উচ্চারণ করল, 'শহীদ!'

থমথমে কণ্ঠে শহীদ বলে উঠল, 'মহুয়া আর লীনাকে সোলায়মান চৌধুরীর গুণ্ডাবাহিনী কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে, কামাল। মি. সিম্পসন আর আমাকে আক্রমণ করেছিল ওরা রহমানের ঘরে। মি. সিম্পসন হাসপাতালে। তোর খবর কি?'

রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল কামাল শয়তান-পক্ষের দুঃসাহসের কথা কল্পনা করে। শহীদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'শহীদ, আমি অদ্ভুত, ভীতিকর এক হত্যাকাণ্ড দেখে এসেছি। আমার কি মনে হয় জানিস, সোলায়মান চৌধুরী আসলে মি. সারওয়ারই। সোলায়মান চৌধুরী ছদ্মবেশে মি. সারওয়ার সেজে আছে।'

এত দুঃখেও হেসে ফেলল শহীদ। কামাল উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'তুই হাসছিস, শহীদ! আমি নিজের চোখে দেখে এলাম, মিরপুর চিড়িয়াখানার এক ঝোপের মাঝে মি. সারওয়ার ওসমান গনিকে হত্যা করে মাটির নিচে পুঁতে রাখলেন!'

ভুরু কুঁচকে শহীদ বলে উঠল, 'বলিস কি!'

কামাল আদ্যোপান্ত খুলে বলল শহীদকে সব কথা। কামালের কথা শেষ হতেই ড্রইংরুমের ফোন বেজে উঠল। দু'জনই ঢুকল ড্রইংরুমে। রিসিভার তুলে নিল শহীদ। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল সে ফোনের অপর প্রান্তের বক্তার বক্তব্য। তারপর 'হ্যাঁ, আমি আসছি এখুনি,' বলে রেখে দিল শহীদ রিসিভার। কামালের দিকে ফিরে ওকে চমকে দিয়ে বলে উঠল ও, 'ওসমান গনিকে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে মি. সারওয়ার, তুই বললি না? কিন্তু স্বয়ং ওসমান গনি মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে ফোন করলেন। গুরুতর একটা ব্যাপারে জবানবন্দি দেবেন বলে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল কামাল।
শহীদ বলল, 'ঠিক আছে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এখুনি। আয় আমার সাথে।'
ইসলাম সাহেব এবং গফুরকে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে পড়ল ওরা মিডফোর্ডের উদ্দেশে।

মিডফোর্ড হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট কেবিনে ঢুকে বেশ একটু অবাক হয়ে গেল শহীদ। কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, বল তো?'
নার্স ওদের পরিচয় নিয়ে কেবিনের দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু কেবিনের অতগুলো ডাক্তারের মধ্যে একজনও মনোযোগ দিচ্ছে না ওদের দিকে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল শহীদ ও কামাল। ডাক্তাররা শলা-পরামর্শ করছে, ছুটোছুটি করছে নার্সরা। কেবিনের মাঝখানে একটা বেড। বেডের পেশেন্ট নিশ্চয় ওসমান গনি। কিন্তু ভিড়ের জন্যে দেখা যাচ্ছে না ভদ্রলোককে।
পনের মিনিট পর ড. মোমিন শহীদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক শহীদের পূর্ব-পরিচিত। শহীদ উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মি. গনির অবস্থা কি খুব সিরিয়াস?'
ড. মোমিন বললেন, 'সিরিয়াস নয়, তবে ভদ্রলোক ভয় পেয়েছেন বড়। আপনাকে ফোন করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন বলে ফোন এখানে আনার ব্যবস্থা করেছিলাম। ফোন করলেন বটে আপনাকে, কিন্তু একটু পরেই জ্ঞান হারালেন। আবার ফিরেছে জ্ঞান, কথা বলার অনুমতি না হয় দিচ্ছি, কিন্তু উনি ভয় পাবেন এমন কোন কথা বলা চলবে না এখন। উত্তেজিতও যেন না হয়ে ওঠেন।'
শহীদ মাথা নেড়ে বলল, 'ধন্যবাদ, ডক্টর।'
কথাটা বলে শহীদ ওসমান গনির বেডের এক পাশে বসল ধীরে ধীরে। কামালও এগিয়ে এল। অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠেছে ওর চোখ জোড়া। এই ওসমান গনিকে মি. সারওয়ার মাটির নিচে পুঁতে রাখছেন, পরিষ্কার দেখে এসেছে কামাল। অথচ জলজ্যান্ত সেই ভদ্রলোকই এখন শুয়ে রয়েছেন হাসপাতালের কেবিনে। কেমন করে এ সম্ভব হল?
শহীদ ওসমান গনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা নেই মি. গনি, আপনি যা জানেন সব বলুন, আমি তো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবই।'
ওসমান গনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ শহীদের মুখের দিকে। কি যেন ভাবতে চেষ্টা করলেন দুর্বলভাবে। তারপর কামালের দিকে তাকালেন। চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে বলে চললেন, 'আমি এবং সারওয়ার প্রায় বছরখানেক আগে আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। কোলকাতায় প্রায় দেড় বছর আগে ওর সাথে এবং এরফান মল্লিকের সাথে পরিচয় হয় আমার। সারওয়ারের পরামর্শেই এরফান মল্লিকের সাথে ব্যবসা করতে রাজি হই আমি। সারওয়ার আর

আমি দু'জনেই এরফান মল্লিককে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু এরফান মল্লিক বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমরা তাকে কোলকাতা শহরে অনেক খুঁজলাম। কিন্তু কোন হদিসই পেলাম না তার। ভাবলাম, শয়তানটা নিশ্চয় ঢাকায় পালিয়ে গেছে। আমরাও আমাদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে চলে এলাম ঢাকায়। আমি এবং সারওয়ার দু'জনেই ঢাকায় চিত্র-ব্যবসায় নামলাম। এবং এরফান মল্লিকের সন্ধান পাবার আশায় আপনাদের শরণাপন্ন হলাম।

ওসমান গনি প্রচণ্ড উত্তেজনাবোধ করছেন। কিন্তু বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। ফলে উত্তেজনা দমন করে রাখার প্রয়াস পাচ্ছেন প্রাণপণে। শহীদ তন্ময়ভাবে শুনছিল কথাগুলো। ওসমান গনি থামতেই প্রশ্ন করল ও, 'আপনারা হঠাৎ এরফান মল্লিকের সন্ধান পাবার আশা ত্যাগ করলেন কেন পরে?'

'সেই কথাই বলছি। গত মাস ছয়েক আগে হাঁপাতে হাঁপাতে সারওয়ার এল আমার বাড়িতে। এসেই দরজা-জানালা বন্ধ করে দিল নিজের হাতে। তারপর বলল, এরফান মল্লিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না, দিলে আমাদের পাওনা টাকা নাকি আদায় করা যাবে না। খবরটা ও আমাকে জানাল বটে, কিন্তু এরফান মল্লিক কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, কিভাবে তার সন্ধান পেয়েছে ও—এসব কিছুই প্রকাশ করল না আমার কাছে। কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল ওর গতিবিধি। আমাকে বারবার শুধু সাবধান করে দিত ও, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে, আমরা এরফান মল্লিকের সন্ধান জানি।'

ওসমান গনি জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'বহুভাবে চেষ্টা করেছিলাম আমি আসল কথাগুলো আদায় করার জন্যে। কিন্তু কার সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল ও, তা জানতে পারিনি! তারপরই কঙ্কাল-রহস্য ছড়িয়ে পড়ল শহরময়। আমি ঘুণাক্ষরেও সারওয়ারকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করিনি। কিন্তু সারওয়ারই কঙ্কালের আবিষ্কারক, মি. শহীদ! আজ আমি তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি।'

'মি. সারওয়ার কঙ্কালের আবিষ্কারক!'

আঁতকে উঠল কামাল। ওসমান গনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে চললেন, 'আজ সুরাইয়া-হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন আপনারা। তার একঘন্টা পরই সারওয়ার আসে আমার কাছে। সে আমাকে হঠাৎ সব রহস্য খোলাসা করে বলতে শুরু করল। বলল, 'অভিনেত্রী সুরাইয়া আসলে এরফান মল্লিকের মেয়ে। তাকে কে হত্যা করেছে তা-ও সে জানে। হত্যাকারী এরফান মল্লিকের মেয়ের ব্যাংক থেকে টাকা তুলে মেরে দেবার ব্যবস্থা করেছে। টাকা তোলার পরই হত্যা করা হয়েছে তাকে। এখন সেই টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে কিন্তু আমাকে সে একটা পয়সাও দেবে না ঠিক করেছে।'

ওসমান গনি দম নিয়ে শুরু করলেন আবার, 'সারওয়ারের কথা শুনে রেগে উঠি আমি। আমাকে টাকার ভাগ দেবে না কেন, জিজ্ঞেস করলে খেপে যায় সে।

খেপে গিয়ে জোরে জোরে লাথি মারে কয়েকবার। সাথে সাথে একজন ঘরের ভিতরে ঢোকে। হ্যাট পরেছিল সে সারওয়ারের মতই। সারওয়ারের মতই হাতে গ্লাভস, চোখে রঙিন চশমা দেখলাম পরেছে লোকটা। না না, লোক নয়—কঙ্কাল! হুবহু আমার মত দেখতে। অবিকল আমার চেহারার একজন লোককে দেখে ভয়ে খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় হল আমার প্রাণটা। তারপর আর কিছু মনে নেই, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমি। জ্ঞান হারাবার সময় ফোন বাজছিল।'

কামাল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, 'তারপর?'

'তারপর, জ্ঞান ফেরার পর দেখছি, আমি হাসপাতালে। চাকর-বাকরেরা অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে এখানে।'

কামাল গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তাহলে মি. সারওয়ারের সাথে মিরপুর চিড়িয়াখানায় আপনি যাননি?'

'মিরপুর চিড়িয়াখানায়! মানে?'

শহীদ কামালকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'না, যাননি মি. গনি। আসলে, এমন কি, মি. সারওয়ারও মি. গনির কাছে আসেননি। এসেছিল কঙ্কাল। এবং তুই আসলে মি. সারওয়ারের সাথে যাকে দেখেছিস তিনি মি. গনি নন—তুই মি. গনি-রূপী কঙ্কালকে দেখেছিস। চল, এখুনি একবার যেতে হবে মি. সারওয়ারের বাড়ি। চলি, মি. গনি। পরে দেখা করব আপনার সঙ্গে।'

হাসপাতালের বাইরে বের হয়ে এল ওরা। গাড়িতে চেপে বসল দু'জন।

মি. সারওয়ারের বাড়ির উদ্দেশে ছুটে চলল গাড়ি। মাঝপথে শহীদ কেবল একটা কথা বলল, 'এখন পৌঁছে যদি দেখি যে মি. সারওয়ার নিহত হয়েছেন তাহলে আশ্চর্যের কিছুই নেই।'

'তার মানে?'

কামালের কথার উত্তর দিল না শহীদ। গভীর চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

মি. সারওয়ারের বাড়ির সামনে এসে দেখা গেল, শহীদের আশঙ্কা সত্য। মি. সারওয়ারের বাড়ির সামনে পুলিস, সাংবাদিক আর জনতার পাঁচমিশালী ভিড়। ইন্সপেক্টর মি. খন্দকার অভ্যর্থনা জানালেন শহীদ ও কামালকে। জানা গেল, মি. সারওয়ার কোথা থেকে যেন ঘুরে এসে গাড়ি নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছিলেন। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এক ইংরেজ। গুলি করেছে সেই-ই। মাথায় ঢুকেছে বুলেট। সাথে সাথে নিহত হয়েছেন মি. সারওয়ার। খুনী পালিয়েছে গুলি করেই।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল শহীদ। সময় নষ্ট না করে ফিরে চলল ওরা বাড়ি অভিমুখে।

বাড়িতে ঢুকেই ওরা বুঝতে পারল—মহুয়া, লীনা ফিরে এসেছে। গাড়ির শব্দে চঞ্চল পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল সকলে। মহুয়া আর লীনাকে দেখে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলল শহীদ। কামাল অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'মহুয়াদি'! উহ্ কি দুশ্চিন্তায়ই না পড়েছিলাম তোমার জন্যে! তা ছাড়া পেলে কিভাবে শয়তানগুলোর হাত থেকে?'

মহুয়া আনন্দে, উত্তেজনায় কথা বলতে পারল না কয়েক মুহূর্ত। শহীদ বুঝতে পেরে বলল, 'সবাই ঘরে চল, বিশ্রাম নিতে নিতে কথা হবে।'

সকলে এসে বসল ঘরে। মহুয়া কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে গেল সব ঘটনা। শেষে যোগ করল, 'আমাদের বাঁধন খুলে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে লোকগুলো একটা দিক নির্দেশ করল। সেদিকে ভয়ে ভয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। লোকগুলো এল না আমাদের সাথে, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একটু দূরে এসে দেখি, একটা কালো মরিস দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে এসে চড়ে বসলাম দু'জন। ড্রাইভিং সিটে বসলাম আমি। ঝড়ের বেগে চালিয়ে এই একটু আগে ফিরলাম।'

শহীদ বলল, 'পাঞ্জাবী আর ইংরেজ শয়তান দুটো তাহলে জঙ্গলে বাঁধা অবস্থায় এখনও আছে? কিন্তু তোমরা যে গাড়ি নিয়ে এসেছ সেটা কই, দেখলাম না তো!'

মহুয়া চোখ বড় বড় করে বলল, 'সে-ও এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা বাড়িতে ঢোকার একমিনিট পরই শুনতে পেলাম, গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে।'

গফুর বলে উঠল, 'সাথে সাথে ছুটে বাইরে গিয়ে দেখি, গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। ড্রাইভারটা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।'

শহীদ বলল, 'কঙ্কাল। ছিল গাড়ির বুটের ভিতরে লুকিয়ে।'

কামাল বলল, 'শহীদ, শয়তান দুটোকে ধরে আনতে হয় এবার।'

শহীদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চল। মিরপুর চিড়িয়াখানা তো বক্সনগরের কাছেই। কবরস্থ কঙ্কাল আর টাকা-ভর্তি অ্যাটাচী কেসটা উদ্ধার করার চেষ্টা করা যাবে। যদিও আমার বিশ্বাস, অন্তত অ্যাটাচী কেসটা এতক্ষণে গায়েব করে ফেলেছে প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকটা।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। সন্ধ্যার খানিক আগেই পৌঁছুল বক্সনগরে। নির্দিষ্ট জায়গাটা খুঁজতে শুরু করল প্রায় কুড়িজন লোক। শহীদ একগাড়ি আর্মড-ফোর্স সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল যাবার সময়।

পাঞ্জাবী গুণ্ডা আর ইংরেজ বদমাশটাকে পাওয়া গেল গাছের সাথে বাঁধা অবস্থাতেই। পাঞ্জাবীটা ঢাকা শহরের কুখ্যাত গুণ্ডা, শহীদ চিনে ফেলল। ইংরেজটার পেট থেকে টুঁ শব্দটাও আদায় করা গেল না। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে থানায় পাঠিয়ে দিল শহীদ দুই শয়তানকেই। তারপর কামালের সাথে মিরপুর চিড়িয়াখানার উদ্দেশে রওয়ানা হল।

কিন্তু এক্ষেত্রেও শহীদের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল। নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত দেখা গেল বটে কিন্তু কঙ্কাল পাওয়া গেল না গর্তে। অ্যাটাচী কেসটারও কোন হদিস মিলল না।

গম্ভীর মুখে ফিরে চলল ওরা বাড়ির দিকে।

তিন-তিনটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বৈচিত্র্যহীন এবং ব্যর্থতার গ্লানিময় তিনটে দিন। পাঞ্জাবী গুণ্ডাটা অবশ্য যা জানে স্বীকার করল সবাই। আসলে সে যা জানে তাতে কোনই লাভ হবার সম্ভাবনা নেই। বেদম মার খেয়ে শুধু বলল, যেদিন ধরা পড়েছে ওরা তার দু'দিন আগে দলে ভিড়েছে সে। এক জুয়া খেলার আড্ডায় দেখা হয় তার ইংরেজটার সাথে। ইংরেজটা তাকে পঁচিশ টাকা রোজ হিসেবে ভাড়া করে। যোগাযোগ করার কোন বিশেষ ঠিকানা ছিল না সেই জুয়ার আড্ডা ছাড়া। মিস সুরাইয়া হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানে না সে। রহমানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কেও অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। শহীদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে, ইংরেজটার সাথে আর অন্য কোন ইংরেজকে কখনও দেখেনি সে। এই প্রশ্নের উত্তর না পেয়েই ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ছে শহীদ। বন্দি ইংরেজটার নাম বব। কিন্তু হেস্টিংস কোথায়? হেস্টিংসের অনুপস্থিতিতে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে শহীদ। শহরে আর কোন নতুন বিপত্তিও ঘটছে না ইদানীং। পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে।

ববের মুখ থেকে কোন উপায়েই একটি কথাও বের করা যায়নি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা এবং ফটো দেখে শুধু জানা গেছে, বন্দীর নাম বব। সোলায়মান চৌধুরী কোথায় আছে, এই প্রশ্নের উত্তর পেলেও কাজ হত। কিন্তু শহীদ চরম নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দিয়েও মুখ খোলাতে পারেনি শয়তানটার। সবরকম নির্যাতন চালিয়ে দেখা হয়েছে কিন্তু কোন ফল লাভ হয়নি। শয়তানটা মরবে, তবু মুখ খুলবে না। আধ-মরা অবস্থায় পুলিস-হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে তাকে। বাঁচে কি মরে ঠিক নেই। ওর কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে শহীদ ও মি. সিম্পসন একমত হতে বাধ্য হয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এমন অপরাধী পৃথিবীতে দু'টি আছে কিনা সন্দেহ। শহীদের মতে কুখ্যাত মাফিয়া দলের সব সদস্যই এই রকম আদর্শ বজায় রেখে মরে। জান যায় যাবে, কিন্তু কথা বলবে না।

নাটকীয় ঘটনা ঘটল পঞ্চম দিনে। টঙ্গি থেকে এল রহস্যময় একটা চিঠি। শুরু হল মিস সুরাইয়া হত্যা রহস্যের নতুন অধ্যায়। চিঠিটা পড়ে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল শহীদ। সত্যি, চিঠিটা যে রহস্যময়, তাতে কোন সন্দেহ নেইঃ

সত্যান্বেষী শহীদ খান,

পত্র পাঠমাত্র নিম্ন ঠিকানায় আপনার শুভাগমন ঘটলে আমার প্রাণ-রক্ষা পাবে বলে মনে করি আমি। বিশেষ কারণবশত আমার সঠিক পরিচয় দিতে পারছি না আপনাকে চিঠির মাধ্যমে। আমি চাই, পুলিস ঘুণাক্ষরেও আমার সম্পর্কে কিছু না জানুক। সাক্ষাতে আপনার সাথে বিস্তারিত আলাপ করব। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আমার প্রার্থনা বিবেচনা

করবেন, এই আমার অনুরোধ। নিজের বাড়িতে প্রায় বন্দী অবস্থায় আছি আমি। রক্ত-লোভী শয়তানের দল ঘুরঘুর করছে রাতদিন বাড়ির আশপাশে। দেরি হলে আমার সর্বনাশ ঘটবে।'

একটা অনুরোধ, আমার মেয়ে ইডেনে পড়ে। তিন নম্বর বিল্ডিং, রুম নম্বর—পাঁচ/তিন। দয়া করে ওকে সাথে করে নিয়ে এলে বাধিত হব। প্রীতি নেবেন। আমার ঠিকানাঃ টঙ্গি, সোনা পাড়া, শান্তি ভিলা।

ইতি

আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

পাঁচ

টঙ্গি। সোনা পাড়া।

রাত দশটা। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত।

একটা মোটর গাড়ি মোড় নিয়ে এগিয়ে আসছে অপ্রশস্ত মেটো পথ দিয়ে। সাইকেল নিয়ে জনৈক পথিক কর্দমাক্ত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটার উজ্জ্বল হেডলাইট দুটো উজ্জ্বলতর হয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। সাইকেল-আরোহী একটা পা মাটিতে রেখে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। পরনে তার পুলিস কনস্টেবলের পোশাক। গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল হাত দশেক দূরে।

'কি ব্যাপার?'

গাড়ির ড্রাইভার গলা বের করে জিজ্ঞেস করল কনস্টেবলটার দিকে তাকিয়ে। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল তার দৃষ্টি কনস্টেবলের পায়ের সামনে লম্বা হয়ে পড়ে থাকা একটা দশাসই মানুষের উপর। লাফ দিয়ে বের হয়ে এল ড্রাইভার গাড়ির ভিতর থেকে। কনস্টেবলটা বিমূঢ় গলায় বলে উঠল, 'একটু আগে এভাবে দেখেছি আমি লোকটাকে পড়ে থাকতে। তারপরই গাড়ির আলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।'

দম নিয়ে কনেস্টবলটা আবার বলল, 'আপনাদের গাড়ির হেডলাইট একটু এদিকে ফেললে ভাল করে দেখা যেত লোকটা মরে গেছে না বেঁচে আছে।'

ড্রাইভার দ্রুত গিয়ে গাড়িতে চড়ল। গাড়ির দিক পরিবর্তন করে নেমে পড়ল সে আবার। পিছনের সিট থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। কনস্টেবলটার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনিও। নিঃসাড় পড়ে থাকা বিশাল দেহটার দিকে এক পলক তাকিয়েই বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি, 'একি! মি. রসুল বক্স এই হালে—গুড গড!'

বিস্ময়াভিভূত ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। পেশায় উকিল। আতঙ্কে দিশেহারা দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। তাঁর জীবনে এমন দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য কখনও হয়নি। এ যে রীতিমত হত্যাকাণ্ড! সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে ভদ্রলোক ঘন্টা

দুয়েক আগে ফোন করেছেন তাঁকে, পথিমধ্যে সেই ভদ্রলোককেই দেখা যাচ্ছে নিহত। তিনি কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি সম্ভবত মি. রসুল বক্সকে চিনতেন। উনি প্রায়ই দু'জন কনস্টেবলের কথা আমাকে বলতেন। তাদেরই একজন আপনি নিশ্চয়?'

কনস্টেবল বলল, 'হ্যাঁ, মি. বক্সকে চিনি আমি। একদিন পর পরই তো ওঁর বাড়িতে যাই আমি ডিউটির সময়। আজও ঘন্টাখানেক আগে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাড়ি-ঘর সব বন্ধ দেখে ভাবলাম, উনি বাইরে কোথাও গেছেন। মি. বক্সের বিশেষ অনুরোধ ছিল, প্রতিদিন যেন একটু সময় গল্প করে যাই ওঁর সাথে।'

মি. রসুল বক্স একজন সামান্য কনস্টেবলের সাথে গল্প করে সময় নষ্ট করতেন তা জানা ছিল না উকিল ভদ্রলোকের। একটু আশ্চর্য বোধ করলেন তিনি। কনস্টেবলটা ব্যস্তভাবে বলে উঠল আবার, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আমি থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।'

উকিল সাহেব ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু এই অপরিচিত জায়গায় লাশ নিয়ে অপেক্ষা করব কিভাবে আমরা! আমরা বরং ফিরে যাই।'

কনস্টেবলটা যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'ফিরে যাবেন কিভাবে, স্যার? সরু রাস্তা, গাড়ি ঘোরাতে পারবেন না যে?'

উকিল সাহেব তাঁর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি বল, সাবের?'

সাবের পা পা করে কনস্টেবলটার গা ঘেঁষে উকিল সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যাবার সময় কনস্টেবলটার সাইকেলের সাথে ধাক্কা লেগে গেল তার। ভয় পেয়েছে বেচারা অন্ধকার রাতে লাশ দেখে। নিরুপায় হয়ে বলে উঠল সে, 'কি আর করা, আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে তাহলে।'

আর কোন কথা না বলে কনস্টেবলটা প্যাডেলে চাপ দিয়ে সাইকেল চালাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অনেকক্ষণ পর ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল কাঁপা কাঁপা গলায়, 'মি. বক্স কি মরে গেছেন, সাহেব?'

'তাই তো মনে হয়। নড়ছেন না তো একটুও।'

'দেখলে হয় না একবার? হয়ত আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন।'

উকিল সাহেব রাস্তার দু'পাশের গাঢ় অন্ধকারময় জঙ্গলের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। ভয় লাগছে ভদ্রলোকের। গাড়ির বাঁ পাশে কি দেখলেন কে জানে, মনে হল, একটা মানুষের কাঁধ দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। চমকে উঠে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তিনি। দ্বিতীয়বার আর তাকাবার সাহস হল না সেদিকে তাঁর।

আরও অনেকটা সময় কেটে যাবার পর ড্রাইভার সাবের অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভাঙার জন্যে বলে উঠল 'কনস্টেবলটা গেছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল।'

উকিল সাহেব উত্তর না দিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। হেড-লাইট দুটোর আলো কমে আসছে। অফ করে দিলেন তিনি লাইট দুটো। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল পরিবেশটা সাথে সাথে। এবং বাতি নেভার সাথে সাথেই সাবের বলে উঠল, 'মি. বক্স বোধহয় খুন হয়েছে, না সাহেব?'

'খুন!' চমকে উঠলেন উকিল সাহেব। নিশ্চয় খুন হয়েছেন মি. বক্স। লাশের গায়ে রক্ত দেখা গেছে আলোতে। হত্যাকারী বা হত্যাকারীরা তাহলে তো আশপাশে কোথাও থাকতে পারে! ভয়ে ভয়ে পিছন দিকে তাকালেন তিনি। এবং সাথে সাথে একটা আর্তচিৎকার বের হল তাঁর গলা থেকে—'কে…?'

সাবের দ্রুত হাতে হেড লাইটের সুইচ অন করল।

'কে, আপনি?'

চিৎকার করে উঠলেন উকিল সাহেব আবার। অন্ধকার থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে আবির্ভূত হল শহীদ। শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'আমার গাড়িটা বিকল হয়ে গেছে মাইলখানেক পুবে। বাধ্য হয়ে হেঁটে আসতে হচ্ছে এতটা পথ। আপনাদের বিপদটা কি? গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে বুঝি?'

উকিল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'একজন কনস্টেবলকে যেতে দেখেছেন আপনি সাইকেল চালিয়ে?'

'কনস্টেবল? সাইকেল চালিয়ে? না তো, কাউকে দেখিনি তো আমি?'

উকিল সাহেব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কনস্টেবল কোন দিকে গেল তাহলে? ঘটনা যতটুকু জানেন তিনি তা বলা দরকার মনে করলেন আগন্তুককে। নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম মাহমুদ হোসেন। উকিল।'

শহীদ বলল, 'আমি শহীদ খান।'

মাহমুদ হোসেন বলে উঠলেন, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান? এদিকে দেখুন তো, মি. খান!'

নিহত রসুল বক্সের লাশটা এতক্ষণ আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাহমুদ হোসেন। সরে গিয়ে দেখালেন শহীদকে লাশটা। শহীদ সামনে এগিয়ে এল। পকেট থেকে একটা ইলেকট্রিক টর্চ বের করে লাশের মুখে আলো ফেলল ও। অনেকক্ষণ ধরে দেখল লাশটা। তারপর বলে উঠল, 'আমি ভদ্রলোকের চিঠি পেয়ে দেখা করতে আসছিলাম। বাঁচানো গেল না শেষ পর্যন্ত।'

'তাই নাকি! আমাকেও উনি ফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ঘন্টা-দুয়েক আগে। আপনি মি. বক্সকে চিনতেন? বাঁচানো গেল না মানে?'

'না, চিনতাম না। তবে আজই ভদ্রলোকের ফটো দেখেছি এক জায়গায়। আপনার সাথে এ লোকটা কে, ড্রাইভার?' প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল শহীদ। মাহমুদ হোসেন বললেন, 'হ্যাঁ।'

শহীদকে সব বললেন মাহমুদ হোসেন। শহীদ রসুল বক্সের লাশ পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছেন।'

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ড্রাইভারটা।

'একি! রক্ত এল কোত্থেকে!'

দেখা গেল ড্রাইভারের শার্টে রক্তের দাগ। আবার ভীত গলায় ককিয়ে উঠল সে, 'লাশের ধারেকাছেও যাইনি আমি, রক্ত কোত্থেকে এল আমার শার্টে?'

ভয়ে কাঁদকাঁদ হয়ে গেছে লোকটার মুখ। শহীদ ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, 'উত্তেজিত হয়ো না, লাশ না ছুঁলেও অন্য কি কি ছুঁয়েছ?'

'কিছু ছুঁইনি আমি!'

শহীদ গম্ভীর ভাবে বলে উঠল, 'ভাল কথা। দেখি আমি।'

দেখতে দেখতে শহীদ মন্তব্য করল, 'তোমার প্যান্টেও দেখ রক্ত লেগেছে। কোন কিছুর সাথে হোঁচট খেয়েছিলে বা ধাক্কা লেগেছিল কিছুর সাথে?'

'না!'

শহীদ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'তাহলে তোমার প্যান্টে সাইকেলের চাকার দাগ কেন? কাদার দাগটা তো সাইকেলের চাকার সাথে প্যান্টের ছোঁয়া লাগার ফলেই দেখা দিয়েছে?'

মাহমুদ হোসেন বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কনস্টেবলের সাইকেলের সাথে ওর একবার ধাক্কা লেগেছিল বটে। ওর মনে নেই।'

মাহমুদ হোসেনের দিকে ফিরে শহীদ বলল, 'আপনি ওকে থানায় পৌছে দিয়ে ফিরে যান। কাল সকালে দেখা করব আমি। রাতটা হাজতে কাটাতেই হবে ওকে।'

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির যে চিঠিটা আজ সকালে পেয়েছিল শহীদ সেটা যে আসলে এরফান মল্লিকের সে সন্দেহ প্রথমেই করেছিল সে। চিঠিতে লেখা ছিল ভদ্রলোকের মেয়ের নাম মিস সুরাইয়া বেগম। শহীদ পরিষ্কার বুঝতে পারল রহস্যটা। এরফান মল্লিকের মেয়ের নামও তাহলে সুরাইয়া বেগম। মেয়েকে সাথে নিয়ে যাবার কথা লিখেছিলেন ভদ্রলোক। শহীদ বুঝল, অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগমের বাড়িতে চাকর-বাকরের সাথে যে যুবতী নিহত হয়েছে সে এরফান মল্লিকের মেয়ে মিস সুরাইয়া বেগমই। অপরাধী সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে মিস সুরাইয়া বেগম নয়। তবু ইডেন গার্লস কলেজের হোস্টেলে গেল শহীদ। সন্দেহটা সত্য বলে প্রমাণিত হল। গত পাঁচ দিন হল সুরাইয়া হোস্টেলে ফেরেনি। কোন খবরও দিয়ে যায়নি সে। থানাতে ডায়েরী করানো হয়নি, কারণ সুরাইয়া প্রায়ই এরকম না বলে বাড়ি চলে যেত। যাই হোক, সুরাইয়ার বাক্স-পেটরা ঘেঁটে জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ফটো পেল শহীদ। এবং একটা চেক বই। ফটোটা অসুস্থ ওসমান গনিকে দেখাতে তিনি এরফান মল্লিককে চিনতে পারলেন। আর কোন সন্দেহ রইল না শহীদের। এরপর ও সুরাইয়ার বাক্স থেকে পাওয়া চেক বইয়ের নম্বর নিয়ে গেল ব্যাঙ্কে। দেখা গেল, একজন ইংরেজ একটা আড়াই লাখ টাকার বেয়ারার-চেক ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে গেছে পাঁচ দিন আগে। অর্থাৎ যেদিন নিহত

হয়েছে মিস সুরাইয়া সেইদিন।

শহীদের কাছে আর কোন রহস্য রইল না। অতি সহজ কেস। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় প্রতিদিন এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি তথ্য বের হচ্ছে। পাঠকরা পর্যন্ত পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, সোলায়মান চৌধুরীই এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করছে। এখন সোলায়মান চৌধুরীকে খুঁজে বের করাই একমাত্র সমস্যা। এমন ছোট অথচ অসামান্য সমস্যায় এর আগে কখনও পড়েনি শহীদ। কে যে সোলায়মান চৌধুরী তা নিশ্চয় করে জানা কোনরকমেই সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে এরফান মল্লিক পথিমধ্যে নিহত হয়েছেন দেখে শেষ আশাও শেষ হয়ে গেল। পুলিস কনস্টেবলটা যে আর ফিরে আসবে না, তা শহীদ বুঝতে পারল মনে মনে। মাহমুদ হোসেনকে তাই চলে যেতে বলল ও। মাহমুদ হোসেন গাড়ি ব্যাক করে ড্রাইভার সাবেরকে পাশে বসিয়ে নিয়ে চলে গেলেন স্থানীয় থানার দিকে।

শহীদ সামনের দিকে এগোতে লাগল। সরু রাস্তাটা কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। ছোটমত একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে। মাঠটা রসুল বক্স ওরফে এরফান মল্লিকের বাড়ির সম্মুখভাগে। টর্চ জ্বেলে মাঠের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে রক্তের দাগ খুঁজছিল শহীদ। দু'জায়গায় দেখা গেল রক্তের দাগ। জুতোয় কাদা লাগার ফলে হাঁটতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল ওর। অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে আলো ফেলে ফেলে এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির সামনে পৌঁছুল শহীদ। গেটের মাথায় আলো ফেলতে দেখা গেল, লেখা রয়েছে 'শান্তি ভিলা'। বাড়ির গেটটা খোলাই দেখা গেল। সামনের দিকে চোখ মেলে ভিতরে ঢুকল ও। হঠাৎ দেখল ও একটুখানি আলোর আভাস। একটা ঘরের জানালা দিয়ে আলোটা দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। শহীদ সেই ঘরের দরজার সামনে গিয়ে টোকা মারল।

সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার ধাক্কা মারল সে দরজার গায়ে। কিন্তু তবু কেউ দরজা খুলল না। কোন সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না ঘরের ভিতর থেকে। শহীদের বারবার মনে হতে লাগল, আশপাশের অন্ধকার ঘরগুলোর জানালা থেকে কেউ ওকে দেখছে। অকারণে সময় নষ্ট না করে শহীদ দরজার কাছ থেকে সরে এসে জানালাটার কাছে চলে এল। প্রবল বাতাস বইছে। শীতের প্রকোপ হঠাৎ যেন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। জানালার গ্রিল সরিয়ে ফেলল শহীদ। উঠে পড়ল জানালায়। ঠিক তখনই যেন কানে ঢুকল একটা পদশব্দ। কান পাতল শহীদ। শোনা যাচ্ছে না আর কোন শব্দ। জানালা থেকে ঘরের মেঝেতে নেমে দাঁড়াল ও। টর্চ জ্বেলে ও দেখল, ঘর শূন্য। ঘরের একটা দরজা বন্ধ। দরজার কাছে গিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। একটা মাঝারি আকারের হলঘরে এসে দাঁড়াল শহীদ। দরজা দেখা যাচ্ছে একটা। বন্ধ বলেই মনে হল। পা টিপে টিপে দরজার সামনে গিয়ে পাল্লার সাথে কান ঠেকাল সে। পর মুহূর্তে আচমকা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল ভেজানো

পাল্লা দুটো। যা সন্দেহ করেছিল তা-ই। খপ্ করে কার যেন একটা হাত ধরে ফেলল ও। টর্চটা হঠাৎ পড়ে গেল হাত থেকে। শান্তস্বরে বলে উঠল ও, 'আমি দুঃখিত। আপনি কোন মহিলা নিশ্চয়?'

জোরে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ কানে ঢুকল শহীদের। হাতটা ছেড়ে দিল ও। টর্চটা খুঁজে নিয়ে জ্বালল। শহীদ যার হাত ধরে ফেলেছিল সে ঘরের এককোণে সরে গেছে। টর্চের আলো সেদিকে ফেলে শহীদ শান্তভাবে বলে উঠল, 'আমাকে ভয় পাবেন না দয়া করে। আমি যা আশা করেছি, তাই। আপনি নিশ্চয়ই অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম?'

'আ-আপনি!'

শহীদ শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার পরিচয়? আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান।'

'আমাকে বাঁচান!'

অকস্মাৎ সুন্দরী মিস সুরাইয়া বেগম কাতর কণ্ঠে আবেদন জানাল। পরমুহূর্তে অদম্য আবেগে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। শহীদ বলল, 'ভয়ের আর কিছু নেই, মিস সুরাইয়া। আপনি কবে থেকে আছেন এখানে? আপনি এখানেই বা কেন…?'

অনেক সাধ্য-সাধনার প্রায় কুড়ি মিনিট পর শহীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করল মিস সুরাইয়া। শহীদ প্রশ্ন করল, 'আপনি কবে এখানে এসেছেন? কেন?'

মিস সুরাইয়া মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিতে লাগল, 'আমি যা বলব তা শুনতে অদ্ভুত ঠেকবে। কিন্তু সত্যি কথাই বলব আমি। আমার বাবা এসব কথা প্রকাশ করতে কঠিনভাবে বারণ করেছেন। কিন্তু যেসব ঘটনা আমি এই ক'দিনে দেখেছি সেসব ঘটনা যে কেউ দেখলে, পাগল না হয়ে উপায় থাকবে না তার। এই মুহূর্তে আমি প্রকৃতিস্থ নেই। আমার বাবার আদেশ পুরোপুরি পালন করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি—আজ প্রায় ছ'মাস হল মি. রসুল বক্সের কাছে চাকরি নিয়েছি আমি। চাকরিটা নিতে আমার বাবা আমাকে আদেশ করেছিলেন। প্রতি সোমবারে এখানে আসতে হয় আমাকে। বুধবার দিন ফিরে যাই।

'মি. রসুল বক্সের অদ্ভুত অদ্ভুত কয়েকটা অভ্যাস ছিল। কাদের ভয়ে জানি না, সবসময় তিনি ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতেন। বাড়ি থেকে একেবারেই বের হতেন না। প্রতিটি দরজায় তিনি ইস্পাতের পাত মুড়ে দিয়েছেন। গেটটা সবসময় বন্ধ করে রাখতেন। আমি এবং দু'জন পুলিস কনস্টেবল ছাড়া এ বাড়িতে কেউ-ই ঢুকতে পারত না। হাট-বাজার করত ঐ পুলিস দু'জনই, মি. বক্স ওদেরকে দুটো সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। প্রতি রাতেই দু'জনের একজন বাইরে থেকে মি. বক্সের সাথে কুশল বিনিময় করে যেত। দু'জনকেই পয়সা দিতেন মি. বক্স। সানন্দে মি. বক্সের হয়ে কাজ করত ওরা। আমি এখানে চাকরি নেবার আগে মি. বক্সের মেয়ে তাঁর

ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরি করত। সে এম. এ. পড়ছে বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। আমি আমার বাবার অদ্ভুত আদেশে কাজটা গ্রহণ করতে বাধ্য হই।'

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল মিস সুরাইয়া, 'আমি আমার বাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কিছুই জানি না। শুধু এব্যাপারেই নয়, আরও অনেক বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত আচরণের কোন কারণ আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি আমি। যাই হোক, মি. বক্স বয়সে আমার গুরুজন। শুধু সে-জন্যেই নয়, কেন জানি না, তাঁর প্রতি আমার এবং আমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং স্নেহের অচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।'

একটু ভেবে নিয়ে মিস সুরাইয়া আবার বলতে শুরু করল, 'প্রতি সোমবারের মত এবারও আমি এখানে এসেছিলাম। মি. বক্সকে এবার অতিমাত্রায় বিচলিত এবং ভীত দেখলাম। উনি আমাকে একটা চিঠি লিখতে বললেন। সেই চিঠি পেয়েই আপনি এসেছেন, মি. শহীদ। চিঠির হাতা-মাথা কিছুই বুঝতে পারিনি আমি। চিঠিটা পোস্ট বক্সে ফেলে বাড়িতে ঢুকে দেখি, আশ্চর্য ব্যাপার! দু'জন লোক মি. বক্সকে বেঁধে রেখেছে দড়ি দিয়ে। দু'জনের মধ্যে একজন বাঙালী, অন্যজন ইংরেজ। তাদেরকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, তারা কেউ-ই আমার কোন ক্ষতি করল না।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'লোকগুলো বাড়িতে ঢুকল কিভাবে?

'জানালার ইস্পাত খুলেছিল ওরা আমি বাইরে যেতে। মি. বক্স দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিলেন।'

'তারপর?'

'লোক দু'জন আমাকে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, বলল তারা আমার কোন ক্ষতি করবে না। আমি ঘরের ভিতর থেকে বুঝতে পারলাম, মি. বক্সকে রাজি করাবার চেষ্টা করছে ওরা একটা চেক লিখে দেবার জন্যে। ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে সব টাকা দাবি করছিল ওরা। একনাগাড়ে কয়েকদিন অত্যাচার সহ্য করবার পর আজ বিকেলে বাধ্য হয়ে চেক লিখে দেন মি. বক্স। এবং আজ বিকেলেই কি কারণে জানি না, মি. বক্সকে দিয়ে উকিল মাহমুদ হোসেনকে ফোন করায় লোক দু'জন। তারপর দু'জনের মধ্যে কি ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হয় যেন। রাত সাড়ে ন'টায় বের হয়ে যায় একজন বাড়ি থেকে। দশ মিনিট পর মি. বক্সকে নিয়ে চলে যায় ইংরেজটা। যাবার সময় আমার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল, তারা যা করছে তা আমার বাবার ইচ্ছানুযায়ীই করছে।'

শহীদ বলল, 'যাবার সময় বলে গেছে ওরা, আবার ফিরে আসবে কিনা?'

'হ্যাঁ।'

শহীদ বলল, 'আপনার বাবার নামটা বলবেন কি?'

মিস সুরাইয়া বলল, 'না, আমার পক্ষে ওই একটা মাত্র কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার মন বলছে, আমার বাবা কোন গর্হিত অপরাধ করেছেন এবং করছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি পারব না তাঁর পরিচয় প্রকাশ করতে। আমি দুঃখিত, মি. শহীদ। এ ব্যাপারে আমাকে অনুরোধ করবেন না।'

শহীদ বলল, 'মি. বক্সকে আপনি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সর্বনাশের কথা ভেবেও কি আপনার বাবার পরিচয়টা দিতে পারেন না আপনি?'

চমকে উঠে মিস সুরাইয়া বলল, 'মি. বক্সের সর্বনাশ! মানে?'

'মি. বক্স নিহত হয়েছেন।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মিস সুরাইয়া শহীদের দিকে! হঠাৎ যেন পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে সে। শহীদ বলল, 'তবু বলবেন না?'

কোন কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না মিস সুরাইয়া। আচমকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শুধু। বাঁধ-ভাঙা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে শুরু করল তার সর্বশরীর।

একটু প্রকৃতিস্থ হতে শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মি. বক্সের মেয়েকে কখনও দেখেছেন? তার নাম জানেন?'

'না, দেখিনি। শুনেছি তার নামও সুরাইয়া!'

'সে-ও নিহত হয়েছে।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল মিস সুরাইয়া। শহীদের কথা যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার। শহীদ বলল, 'তবুও বলবেন না, আপনার বাবার পরিচয়?'

কোন উত্তর না দিয়ে উন্মাদিনীর মত তাকিয়ে রইল মিস সুরাইয়া শহীদের দিকে একদৃষ্টিতে। শহীদ বুঝল, এ মেয়ের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না ছদ্মবেশী সোলায়মান চৌধুরীর নকল বা আসল পরিচয়। নকল পরিচয়টাই এখন বেশি দরকার। প্রকাশ্যে সোলায়মান চৌধুরী যে নামে ঢাকার বুকে অবস্থান করছে সেই নামটা জানা গেলেই তাকে চেনা যাবে। তাছাড়া আর কোন উপায়েই সম্ভব নয়। শহীদ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'আপনি এখন কি করতে চান? আমার হেফাজতে থাকবেন কি? নাকি, লোক দু'জন ফিরে আসলে তাদের সাথে যাবার ইচ্ছা?'

'আমি আপনার সাথেই ফিরতে চাই ঢাকায়।'

শহীদ বলল, 'তাহলে আমার কথা মত কাজ করতে হবে আপনাকে। পুরুষের পোশাক পরিয়ে আপাতত আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব থানায়। সেখান থেকে পরে আপনাকে নিয়ে ঢাকায় যাব। আমি। রাজি?'

'হ্যাঁ।'

থানায় ফোন করল শহীদ। ও.সি.-কে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন দুটো লাশ পাওয়া গেছে, সেখানে গেছেন তিনি। শহীদ নির্দেশ দিল, ও. সি. ফিরলে একটা লুঙ্গি সাথে নিয়ে যেন চলে আসেন তিনি মি. রসুল বক্সের বাড়িতে।

আধঘন্টা পর থানার ও. সি. মনির হোসেন পাংশু মুখে এসে হাজির হলেন। খবর আসলে তিনি পেয়েছেন আগেই। কিন্তু আরও মারাত্মক একটা খবর পেয়ে ছুটতে হয়েছিল তাঁকে। শহীদ জানতে চাইল, 'মারাত্মক খবর! মানে কনস্টেবলের

লাশ পাওয়া গেছে, তাই না?'

মনির হোসেন হতবাক হয়ে গেলেন। শহীদ বলল, 'আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। ওই দু'জন কনস্টেবলকে হত্যা না করে সোলায়মান চৌধুরীর গুণ্ডাবাহিনী হত্যা করতে পারতেন না মি. রসুল বক্সকে। মাহমুদ হোসেন এবং তাঁর ড্রাইভার যে লোকটাকে সাইকেল নিয়ে মি. বক্সের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে আসলে খুনীদেরই একজন। কনস্টেবলদেরকে হত্যা করে তাদের পোশাক আর সাইকেল নিয়ে এসেছিল খুনেরা। সাইকেলে করে লাশটা সরাচ্ছিল একজন খুনে, এমনসময় উকিল মি. মাহমুদের গাড়ির আলো দেখা যায় রাস্তায়। সাইকেলের পিছনের সিট থেকে লাশটা নামিয়ে রেখে ধোঁকা দিয়েছে সে ওদেরকে। দ্বিতীয় খুনেটা আশপাশেই লুকিয়ে ছিল সম্ভবত।'

'মি. রসুল বক্সের লাশ কি আপনি সরিয়েছেন, স্যার? রাস্তায় তো দেখলাম না?'

শহীদ অবাক হয়ে গেল। বলল, 'তাহলে দ্বিতীয় খুনেটাই, অর্থাৎ ইংরেজটা সরিয়ে ফেলেছে লাশ। যাই হোক, মি. মাহমুদের ড্রাইভারকে ছেড়ে দেবেন ফিরে গিয়ে। লোকটা খুনেটার সাইকেলের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল বলেই কাপড়ে রক্তের দাগ লেগেছিল ওর।'

মনির হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখন কি করার পরামর্শ দেবেন, স্যার?'

শহীদ বলল, 'মিস সুরাইয়াকে আমার পোশাক পরিয়ে সাথে করে নিয়ে চলে যান আপনি। খুনেরা আশপাশেই অপেক্ষা করছে। তারা মিস সুরাইয়াকে ঢাকায় নিয়ে যেতে চায়। মিস সুরাইয়াকে পুরুষের পেশাক পরিয়ে নিয়ে গেলে ওরা অন্ধকারে চিনতে পারবে না। ভাববে, আমি ফিরে যাচ্ছি আপনার সাথে। পরে মিস সুরাইয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে বাড়িতে ঢুকবে ওরা। আপনি থানায় গিয়ে কিন্তু দেরি করবেন না। একদল পুলিস আনবেন, পুলিস যদি সংখ্যায় কম থাকে তাহলে সাহসী একদল গ্রামবাসীকে সাথে করে নিয়ে আসবেন। বাড়ির কাছাকাছি আসবেন না দলবল নিয়ে। ওদেরকে দূরে লুকিয়ে থাকতে বলে আপনি নিজে বাড়ির কাছাকাছি এসে লুকিয়ে থাকবেন। আমার কাছ থেকে বাঁশির শব্দ পেলে আপনি বাঁশি বাজাবেন। সাথে সাথে ঘিরে ফেলতে হবে বাড়িটাকে।'

মনির হোসেন বললেন, 'কিন্তু থানায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসতে অনেকটা সময় লাগবে। ইতিমধ্যে খুনেরা ঢুকে পড়বে বাড়িতে।'

শহীদ বলল, 'আপনি এখান থেকে ফোন করে দিন এখুনি। যা নির্দেশ দেবার দিয়ে দিন। এক ঘন্টা পর আবার ফোন করে জেনে নেবেন, সব ব্যবস্থা করা শেষ হয়েছে কিনা। একঘন্টার মধ্যে নিশ্চয় হয়ে যাবে। ওদেরকে রওয়ানা হতে বলে আপনিও মিস সুরাইয়াকে নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাবেন। পথিমধ্যে দেখা হবে আপনাদের। মিস সুরাইয়াকে কারও সাথে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে আপনি

দলবল নিয়ে এগিয়ে আসবেন কথামত।'

'বেশ, তাই করি তাহলে।'

ফোন করবার জন্যে রিসিভার তুললেন মনির হোসেন।

ছয়

ফাঁদ সার্থকভাবেই পাতা হয়েছিল। একটুও এদিক-ওদিক হল না, যেমন অনুমান করা হয়েছিল ঘটল ঠিক তেমনটিই? মনির হোসেন থানায় ফোন করে নির্দেশ দিলেন। ঘন্টাখানেক পরে আবার একবার ফোন করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন। তারপর রওয়ানা হয়ে গেলেন পুরুষের ছদ্মবেশে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়াকে সাথে করে। পথিমধ্যেই দেখা হল দলের সাথে। সবাই সশস্ত্র। মিস সুরাইয়াকে দু'জনের সাথে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে মনির হোসেন দলবল নিয়ে রসুল বক্স ওরফে এরফান মল্লিকের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ওত পেতে রইলেন।

রাত একটার সময় বাড়িতে ঢুকল একজন লোক। দু'মিনিট পরই বাড়ির ভিতর থেকে বেজে উঠল বাঁশি। শহীদেরই কথা ছিল বাঁশি বাজাবার। সাথে সাথে দলবল নিয়ে কৌশলে ঘিরে ফেললেন মনির হোসেন সম্পূর্ণ বাড়িটা। পাঁচ জনকে সাথে নিয়ে তিনি সাবধানে ঢুকলেন বাড়ির ভিতরে। শহীদ ইতিমধ্যে বন্দি করে ফেলেছিল আগন্তুককে। আগন্তুক আর কেউ নয়—সোলায়মান চৌধুরীর কুখ্যাত সঙ্গী হেস্টিংস।

মিস সুরাইয়ার ঘর অন্ধকার করে দিয়ে ওত পেতে ছিল শহীদ। বিনা সন্দেহে হেস্টিংস পা টিপে টিপে ভেজানো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। সুইচ-বোর্ড কোথায় আছে জানাই ছিল তার। সুইচ অন করল সে। শহীদের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল হেস্টিংসের পিছন থেকে, 'হ্যাণ্ডস আপ!'

চমকে উঠল হেস্টিংস। কিন্তু নড়ল না। শহীদের কঠিন স্বর শুনে বুঝতে বাকি রইল না তার, যে শক্ত ফাঁদে আটকা পড়েছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল সে। দেখল, শহীদের হাতে চকচক করছে একটা রিভলভার। দেরি না করে বাঁশি বাজাল শহীদ।

এক মিনিটের মধ্যেই ঘরে এসে পৌঁছুলেন সদলবলে মনির হোসেন। বেঁধে ফেলা হল হেস্টিংসকে। তার পকেট সার্চ করে পাওয়া গেল একটা রিভলভার। একটা ক্ষুদ্রাকৃতি ওয়্যারলেস। জিনিসটা দেখতে লম্বা হাফসাইজের পেন্সিলের মত। বেঁধে ফেলার পর কথা আদায় করার চেষ্টা করল শহীদ। কিন্তু হিংস্র দৃষ্টিতে সারাক্ষণ তাকিয়ে রইল হেস্টিংস। শহীদের আধ-ঘন্টা চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিল না সে। শহীদ মনে মনে স্বীকার করল, মাফিয়া দলের প্রতিটি সদস্যের দলগত নীতি মেনে চলার আদর্শঃ মেরে খতম করে ফেললেও মুখ খুলবে না ওরা।

সাত

ভোর প্রায় সাড়ে তিনটেয় ঢাকায় ফিরল শহীদ পুলিসের গাড়ি করে। একটা জীপে শহীদ, মনির হোসেন এবং মিস সুরাইয়া বেগম। অন্য একটা ভ্যানে পুলিস-প্রহরীসহ হেস্টিংস ও শোভান। শোভানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল স্টেশনে। নাইট-ডিউটিরত একজন কনস্টেবল ওকে গ্রেফতার করেছে। সাইকেলটাও পাওয়া গেছে শোভানের কাছে। পোশাকও ছিল সেই পুলিসের। এই শোভানই উকিল মাহমুদ সাহেব এবং তাঁর ড্রাইভার সাবেরকে থানায় খবর দেবার নাম করে ধোঁকা দিয়ে চলে গিয়েছিল এরফান মল্লিকের লাশ রেখে।

থানায় নয়, শহীদ সকলকে নিয়ে এল ওর নিজের বাড়িতে। কামালকে ফোন করল ও। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এল কামাল ছুটতে ছুটতে। হেস্টিংসকে একটা ঘরের ভিতরে রাখা হল। শোভানকে রাখা হল অন্য একটা ঘরে। হাত পা ওদের আগে থেকেই বাঁধা। তবু পাহারায় রইল মনির হোসেন দলবল নিয়ে। বের হয়ে পড়ল শহীদ কামালকে সাথে নিয়ে। যাবার পথে কামাল জিজ্ঞেস করল, 'তুই কথা বলছিস না কেন, শহীদ?'

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'আগামী দশ ঘন্টার মধ্যেই সব রহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে। কথা বলব দেখবি তখন। রিজার্ভ করে রাখছি এখন।'

মি. সিম্পসনের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামল ওরা। দারোয়ান গেট খুলে দিল। শহীদ মি. সিম্পসনকে কোন কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ দিল না। কামালের সাথে পাঠিয়ে দিল তাঁকে পুলিস হাসপাতালে। সোলায়মান চৌধুরীর আর এক কুখ্যাত সঙ্গী আছে সেখানে। তাকে সাথে নিয়ে ওরা ফিরবে শহীদের বাড়ি। শহীদও সোজাসুজি বাড়ি ফিরল না। অন্য কয়েক জায়গায় গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারল ও কয়েকটা। তারপর বাড়ি ফিরল। ইতিমধ্যে ববকে সাথে নিয়ে পৌঁছে গেছেন মি. সিম্পসন এবং কামাল।

মি. সিম্পসন, কামাল এবং মনির হোসেনকে সাথে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল শহীদ। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিল ও। ভিতরে গোপন শলা-পরামর্শ চলল আধঘন্টা ধরে। আধঘন্টা পর উত্তেজিতভাবে বের হয়ে এল সকলে। তারপর আশ্চর্য গতিবিধি দেখা গেল সকলের মধ্যে।

সকাল হতে দেরি ছিল না বেশি। দেখা গেল, মি. সিম্পসন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দশ মিনিট পরে বিদায় নিলেন মনির হোসেন তাঁর সবক'জন কনস্টেবল সাথে নিয়ে। আর দশ মিনিট পরে বিদায় নিল কামাল। শহীদের বাড়িতে রইল কেবল শহীদ, মিস সুরাইয়া বেগম, মহুয়া, ইসলাম সাহেব, লীনা আর গফুর। তা-

ও যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সকাল হতে সম্ভবত আধঘন্টাও বাকি ছিল না। হেস্টিংস ঘরের ভিতরে বন্দি অবস্থায় ছিল। কিন্তু চারদিক নিঃশব্দ দেখে হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে লাগল সে প্রাণপণে। এসব কাজে সে পটু। খুব বেশি বেগ পেতে হল না তাকে। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে জানালার শিক বাঁকিয়ে বের হয়ে এল সে ঘর থেকে। তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দ্রুতপদে দূরে চলে যেতে লাগল সে ক্রমশ।

জানালা দিয়ে শহীদ দেখল হেস্টিংসের পলায়ন। এতটুকু বিচলিত মনে হল না ওকে। ধীরে-সুস্থে মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক বদলাতে শুরু করল ও। মহুয়া গফুরকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে এই একটু আগে। কফি আর হালকা নাস্তা নিয়ে এল দশ মিনিটের মধ্যেই।

কফিটুকু শেষ করার সাথে সাথে ফোনের বেল বেজে উঠল। তড়াক করে লাফ দিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল শহীদ। কান পেতে শুনল কি যেন। তারপর বলল, 'ভেরি গুড। এখুনি আসছি আমি।'

মি. সিম্পসন ফোন করেছিলেন।

রিসিভার রেখে দিয়ে মহুয়ার সাথে এক মিনিট আলাপ করল শহীদ। তারপর গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সিধে একটা সংবাদ সংস্থার অফিসে গিয়ে হাজির হল ও। সম্পাদকের সাথে আলাপ করল। বলল, 'ঢাকার সব সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের জানিয়ে দিন, সুরাইয়া হত্যা-রহস্য এবং কঙ্কাল-রহস্যের সর্বশেষ সংবাদ জানার আগ্রহ থাকলে তাঁরা যেন সোজা আমার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। এখন বাজে সাতটা। এক ঘন্টার মধ্যে পৌছুতে হবে সবাইকে। সেখান থেকে আমার সহকারী কামাল আহমেদ পরবর্তী অনুরোধ জানাবে।'

সম্পাদক সাহেব উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব রহস্যের কিনারা করে ফেলেছেন নাকি, মি. শহীদ?'

শহীদ বলল, 'সেই রকমই বলতে পারেন!'

'কঙ্কাল-রহস্যটার আসল রহস্য কি বলুন দেখি? আর মিস সুরাইয়াকেই বা কে হত্যা করল?'

শহীদ বলল, 'আপনিও এক ঘন্টার মধ্যে পৌছে যান আমার বাড়িতে। সব জানতে পারবেন। ফোন করতে পারি?'

হেসে ফেলে ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝেছি। নিশ্চয়ই, করুন না ফোন।'

শহীদ ফোন করল প্রায় দশ-বারটা। কুয়াশাকেও ফোন করল ও। কুয়াশাকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ডি. কস্টাকে। শহীদ জানিয়ে দিল, 'কঙ্কাল-রহস্য ভেদ করেছি আমি। কুয়াশাকে হাজির হতে বল আমার বাড়িতে এক ঘন্টার মধ্যেই।'

ফোন করা শেষ করে বিদায় নিল শহীদ সম্পাদক সাহেবের কাছ থেকে। বাইরে এসে নিজের ফোক্সওয়াগেনে চড়ে পুরানো শহরের দিকে চলল শহীদ। নবাবপুর রোড হয়ে, নয়াবাজার হয়ে আর্মানিটোলার একতলা একটা বাড়ির সামনে এসে শহীদ গাড়ি দাঁড় করালো। গাড়িতে বসেই বাড়িটা দেখল মনোযোগ দিয়ে। তারপর আবার ছেড়ে দিল গাড়ি। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল ও। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়িটার দিকেই ফিরে আসতে লাগল আবার।

বাড়িটার কাছে এসে এদিক-ওদকি তাকিয়ে ঢুকে পড়ল শহীদ ভিতরে। উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল। বাড়িটার কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। বারান্দা ধরে এগোচ্ছে সে। এমন সময় একটা ঘরের দরজা খুলে গেল ধীরে ধীরে। উঁকি মারলেন ঘরের ভিতর থেকে মি. সিম্পসন। শহীদ ঢুকে পড়ল সেই ঘরে। ঘরের ভিতরে মি. সিম্পসন, কামাল, মনির হোসেন এবং কয়েকজন কনস্টেবল রয়েছে। ঘরের এক কোণে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে দু'জন লোক। লোক দু'জন হেস্টিংস আর বব ছাড়া কেউ নয়। শহীদ হেস্টিংসকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবেই। শহীদের সন্দেহ ছিল, হেস্টিংস ও ববের নির্দিষ্ট কোন আড্ডা আছে। সেই আড্ডাটা কোথায়, জানা গেলে কাজ হবে অনেক। হেস্টিংস শহীদের বাড়ি থেকে পালিয়ে সিধে এসে উঠেছে এই আড্ডায়। কিন্তু শহীদের পরামর্শে মি. সিম্পসন হেস্টিংসকে অনুসরণ করার জন্যে প্রায় তিন ডজন ইনফর্মারকে কাজে লাগিয়েছিলেন। রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে ছিল তারা সাদা পোশাকে। অনুসরণ করে তারা পাকড়াও করেছে হেস্টিংসকে এই আড্ডায়। এত সব আয়োজনের কারণটা অবশ্য শহীদ ছাড়া আর কেউ জানে না।

শহীদ ঘরের ভিতরে ঢুকেই কামালকে বলল, 'তুই এ বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে আমাদের বাড়িতে যা। সেখানে খানিকক্ষণের মধ্যেই সাংবাদিক, চিত্র-প্রযোজক, কুয়াশা—এঁরা সবাই পৌঁছুবেন। সঙ্গে করে এখানে আনতে হবে সকলকে। পিছনের রাস্তা দিয়েই ঢুকবি সকলকে নিয়ে।'

কামাল বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতে শহীদও চলে গেল। বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল শহীদ। সাথে করে নিয়ে এসেছে ও অভিনেত্রী সুরাইয়া বেগমকে। কামালের ফিরতে দেরি হল আরও খানিক। বেলা ঠিক আটটার সময় এল ও প্রায় কুড়িজন ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে। তাঁদের মধ্যে ডি. কস্টা, ওসমান গনি, পাঁচজন চিত্র-প্রযোজক, সাংবাদিক এবং পুলিস কমিশনার স্বয়ং আছেন। শহীদ ডি. কস্টাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বস্ এল না কেন?'

ডি. কস্টা বুক ফুলিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'টুমি নিজেকে অটিরিক্ট বুড্ডিমান মনে কর, টাই না? কেন আসবে শুনি হামার ফ্রেণ্ড? সে টো জানেই, কঙ্কাল মিসট্রির পিছনে কে আছে।'

মৃদু হেসে শহীদ বলল. 'হ্যাঁ, তা সে জানে বৈকি। তা যাকগে। আচ্ছা, মি.

গনি, আখতার চৌধুরীকে দেখছি না যে?',

ওসমান গনি উত্তর দিলেন, 'চৌধুরীকে ফোন করেছিলাম। বললেন, অসুস্থ বোধ করছেন বলে আসতে পারবেন না।'

শহীদ সাংবাদিকদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারাও সবাই আছেন?'

'হ্যাঁ, সব পত্রিকা থেকেই এসেছি আমরা।'

উত্তর দিলেন একজন। শহীদ সকলকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে এল। মি. সিম্পসন চেয়ারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন আগেই। শহীদ কামালকে ইঙ্গিত করল। কামাল বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘরের বাতি জ্বেলে দিল শহীদ দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে। সম্মুখের দরজাটা রইল ভেজানো। সকলকে বসতে অনুরোধ করল শহীদ। বসলেন সকলে। ডি. কস্টা বসল সামনের সারিতে। তার বাঁ পাশের একটা চেয়ার খালি পড়ে রইল। ডান পাশে বসেছেন মি. সিম্পসন। শহীদ একটা টেবিলের সামনে সকলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করল, 'উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের উদ্দেশ্যে বলছি। আপনারা আজ কঙ্কাল-রহস্য এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন। বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে হলে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিতে হয়। কিন্তু বেশি সময় আপনারাও ব্যয় করতে পারবেন না, আমিও দিতে পারব না। তাই বক্তৃতা বাদ থাকুক। অবশ্য বক্তৃতার দরকারও তেমন নেই। গতকালকের ঘটনা ছাড়া আপনারা সংবাদপত্রে সকল ঘটনাই জেনেছেন। সুতরাং কোন কিছুই জানতে বাকি নেই আপনাদের, বলা যায়। আপনারা শুধু জানেন না যে, গতরাতে এরফান মল্লিক নিহত হয়েছে। ছদ্মবেশে সে বসবাস করছিল টঙ্গীতে। সোলায়মান চৌধুরীর সঙ্গী হেস্টিংস একজন স্থানীয় গুণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক দিন থেকেই এরফান মল্লিককে বন্দি করে রেখেছিল তার নিজের বাড়িতে। অবশেষে মোটা টাকার চেক লিখে দিতে বাধ্য হয় এরফান মল্লিক। চেক হাতে পেয়েই হত্যা করে হেস্টিংস তাকে। তার আগে ওরা দু'জন কনস্টেবলকেও খুন করে। এরফান মল্লিকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কনস্টেবলদের। রাতের বেলা ডিউটির সময় ওরা কুশল জিজ্ঞেস করে যেত রোজ। গতকালও সম্ভবত কুশল জানবার জন্যে এসেছিল ওরা। হেস্টিংস আর শোভান হত্যা করেছে ওদেরকে। তারপর তাদের পোশাক পরে সাইকেল নিয়ে এরফান মল্লিকের লাশ সরাতে চেষ্টা করে। পথে এরফান মল্লিকের উকিলের গাড়ি দেখে ওরা। হেস্টিংস জঙ্গলের ভিতরে আত্মগোপন করে। শোভান কনস্টেবলের ছদ্মবেশে উকিল সাহেবকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য, পরে দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।'

শহীদ দম নিয়ে শুরু করল, 'আপনারা জানেন, এরফান মল্লিক সোলায়মান চৌধুরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এবং সে মি. সারওয়ার ও মি. গনির মোটা টাকা মেরে দিয়েছিল। ওঁরা তিনজনই এরফান মল্লিকের সন্ধানে ঢাকায় এসেছিলেন। তিনজনের মধ্যে দু'জন আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন এরফান

মল্লিকের সন্ধান পাবার জন্যে। আমরা সন্ধান দিতে পারিনি। প্রায় ছ'মাস পর মি. সারওয়ারের সাথে আলাপ হয় সোলায়মান চৌধুরীর। আমি নিশ্চিত নই, মি. সারওয়ারের আলাপটা হেস্টিংস বা ববের সাথেও হতে পারে। সোলায়মান চৌধুরীর নির্দেশ মোতাবেক মি. সারওয়ারকে দলে ভিড়িয়ে নেয় হেস্টিংস, এটাই আমার বিশ্বাস। ওরা মি. সারওয়ারকে দিয়ে মি. গনিকেও দলে ভিড়িয়ে নেয়। তবে মি. গনি কিছুই জানতেন না সোলায়মান চৌধুরীর নির্মম ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। সম্ভবত মি. সারওয়ারও সবটা জানতেন না। সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে যে বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া, তাও জানা ছিল না ওঁদের। ফলে মোটা টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে মিস সুরাইয়াকে পরবর্তী ছায়াছবির জন্যে চুক্তিবদ্ধ করেন ওঁরা। আর সোলায়মান চৌধুরী প্ল্যান করেছিলেন, তাঁর কাজ হাসিল হয়ে গেলে মেয়েকে নিয়ে চম্পট দেবেন তিনি বিদেশে। অ্যাডভান্স টাকা তাই যতটা সম্ভব আদায় করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি মেয়েকে দিয়ে চিত্র-প্রযোজকদের কাছ থেকে। সোলায়মান চৌধুরী ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এমন কি মি. সারওয়ার, মি. গনি এবং অন্যান্য চিত্র-প্রযোজকদের সর্বনাশ করার জন্যেও। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা জানত না সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়াও। তাই বাবার আদেশে সে পার্ট-টাইমে কেরানির চাকরি নেয় এরফান মল্লিকের বাড়িতে। আপনাদের হয়ত মনে আছে, গত সোমবারে নিহত হয় অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া, নিজের বাড়িতে। কিন্তু আসলে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া নিহত হতে পারে না। কেননা, প্রতি সোমবারেই সে যে টঙ্গিতে এরফান মল্লিকের কাজ করত। সোমবার দিন সে সেখানেই গিয়েছিল। আসলে বব এরফান মল্লিকের মেয়েকে ইডেন গার্লস কলেজের গেটের বাইরে থেকে কিডন্যাপ করে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়ার বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানে হত্যা করা হয় তাকে। নিহত হবার আগে এরফান মল্লিকের মেয়ে একজন কাজের লোককে কিছু টাকা দিয়ে আমার কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্যে পাঠায়। কিন্তু পত্রবাহক পথিমধ্যে বব কর্তৃক নিহত হয়। তবে চিঠিটা আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু অনেক দেরিতে। গিয়ে দেখলাম, চাকর-বাকরসহ সুন্দরী এক যুবতীকে খুন করা হয়েছে। যুবতীর মুখের চেহারা ক্ষতবিক্ষত। সোলায়মান চৌধুরী চেয়েছিলেন, সকলে জানুক নিহত হয়েছে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া। পুলিস একথা বিশ্বাস করলে প্রথমেই তারা খুঁজবে আবদুর রহমানকে। আবদুর রহমান অভিনেত্রী মিস সুরাইয়ার প্রেমিক ছিল এবং ওদের সম্পর্ক বেশ কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছিল না। এই কথা ভেবেই সোলায়মান চৌধুরী রহমানকেও হত্যা করান। হত্যা করা হল বটে, কিন্তু দেখে মনে হয় আত্মহত্যা। কৌশলে কাজটা করেছিলেন সোলায়মান চৌধুরী। যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে খুব সহজ-বোধ্য কেস। প্রেমিক কোন ব্যক্তিগত ক্রোধবশত প্রেমিকাকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। এমন তো প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেননি সোলায়মান চৌধুরী। আমি বুঝতে পারলাম, রহমানকেও খুন করা

হয়েছে।'

একটু চিন্তা করার জন্যে থামল শহীদ। তারপর বলল, 'আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসার একটা কারণ আছে। এই বাড়িটা হেস্টিংস আর ববের আস্তানা। সোলায়মান চৌধুরী হেস্টিংস আর ববের সাথে নিজের বাড়িতে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। আসলে, সামনাসামনি দেখা হয়ত মাসে, দু'মাসে একবারও করেন কিনা সন্দেহ। ওদের মধ্যে যোগাযোগ হয় ক্ষুদ্রাকৃতির ওয়্যারলেস যন্ত্রের মাধ্যমে। সেই রকম একটা যন্ত্র আমি হেস্টিংসের কাছ থেকে পেয়েছি। আমি জানি সোলায়মান চৌধুরীর পরিচয়। তিনি আপনাদের সকলেরই পরিচিত। নাম বদলে ঢাকার বুকেই বাস করছেন তিনি। আর, নিজের চেহারাও তিনি পালটে ফেলেছেন। প্লাস্টিক সার্জারী করে নতুন একটা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন তিনি।'

শহীদের কথা শুনে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'ভয় পাবেন না, সোলায়মান চৌধুরী এখানে এখন উপস্থিত নেই। তবে তাঁকে ডাকতে হবে কৌশলে। আমার বিশ্বাস, আমার ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি পারবেন না। এখানে তাঁকে ছুটে আসতেই হবে। আপনারা তাঁর দ্রুত পদশব্দ শুনতে পাবেন। এবার বলি, আমি কী কৌশলে ডাকব সোলায়মান চৌধুরীকে। সোলায়মান চৌধুরী খুব ভাল করেই জানেন, এরফান মল্লিকের মেয়ে নিহত হয়েছে তাঁর মেয়ের বাড়িতে। কিন্তু খুব ভাল করে জানা থাকা সত্ত্বেও এখনও তিনি নিজের মেয়েকে চোখে দেখেননি, এরফান মল্লিকের মেয়ে নিহত হবার পর। কেননা, সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া সেদিন থেকে গতরাত পর্যন্ত আটকা পড়েছিল এরফান মল্লিকের বাড়িতে। সে এখন এই বাড়িরই একটা ঘরে অবস্থান করছে। সোলায়মান চৌধুরীকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ডাকব আমি এখন। হেস্টিংসের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে কথা বলব আমি। তাকে চমকে দিয়ে হেস্টিংসের অনুকরণে ইংরেজিতে যা বলব তার বাংলা দাঁড়াবে এই রকম—মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে, চৌধুরী! আমার সন্দেহ হচ্ছে ভুলবশত বব খুন করে ফেলেছে আপনার মেয়েকে। যে মেয়েটিকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি এরফান মল্লিককে খুন করে সে মনে হয় আপনার মেয়ে নয়। এরফান মল্লিকের মেয়ে। আপনি অনুমতি দিলে খতম করে ফেলি একেও।'

শহীদ সকলের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'আমার কৌশলে কোন খুঁত না থাকলে সোলায়মান চৌধুরীকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতেই হবে এখানে।'

কথাটা বলে পকেট থেকে ছোট্ট একটা ওয়্যারলেস যন্ত্র বের করে নখ দিয়ে সুইচ অন করল শহীদ। তারপর হেস্টিংসের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে একটু আগে যা বাংলায় বলেছিল সেই কথাগুলোই ইংরেজিতে বলে গেল। তারপর মন দিয়ে কি যেন শুনল ও। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা। সুইচ অফ করে দিয়ে বলে উঠল ও, 'আপনারা কোন শব্দ না করে যে যার জায়গায় বসে থাকুন। দশ

মিনিটের মধ্যেই আসবেন সোলায়মান চৌধুরী।'

কথা শেষ করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। বাইরে গলা বের করে কামালকে ইঙ্গিত করল। কামাল শহীদের ইঙ্গিতে বারান্দায় একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করল। সোলায়মান চৌধুরী বাড়িতে ঢুকে সন্দেহবশত যেন পালাতে চেষ্টা করে সফল না হন, সেদিকে কড়া নজর রাখবে কামাল। ঘরে ঢুকে সকলের উদ্দেশে শহীদ বলল, 'আপনাদের এবার বেশ খানিকটা ধৈর্য এবং সাবধানতার পরিচয় দিতে হবে। দয়া করে কেউ কথা বলবেন না, ভুলেও নিজের আসন ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করবেন না, সিগারেট খাবেন না, জোরে নিঃশ্বাস ফেলবেন না এবং মোটেই ভয় পাবেন না। আমি দরজা ভেজিয়ে দিচ্ছি। তারপর আলো নিভিয়ে দেব। সোলায়মান চৌধুরী সিধে ঘরের ভিতরে ঢুকবেন, সাথে সাথে আলো জ্বালব আমি।'

শহীদ দরজা ভাল করে ঠেলে দিয়ে নিভিয়ে দিল আলো।

একমিনিট। দু'মিনিট। তিনমিনিট। চারমিনিট। কোথাও কোন শব্দ নেই।

পাঁচ মিনিট।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সকলে। অন্ধকার ঘর। কেউ দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। ঘরের ভিতরে কেউ আছে কিনা বোঝবার কোন উপায় নেই।

ছয় মিনিট।

কোথায় যেন একটা গাড়ি থামবার কর্কশ শব্দ হল। পরমুহূর্তে গাড়ির দরজা বন্ধ হল সশব্দে। তারপরই ভারি জুতোর শব্দ। ছুটন্ত শব্দ। বিচলিত, দ্রুত জুতোর শব্দ। আসছে। এগিয়ে আসছে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে একজোড়া জুতোর শব্দ! অন্ধকার ঘরের ভিতরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভেজানো দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে সকলে যে যার আসনে।

ভারি জুতোর শব্দ এসে গেছে। বারান্দার উপর দিয়ে তুমুল শব্দ করে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক দরজার সামনে এসে থেমে গেল জুতোর শব্দ। একমুহূর্তের নিস্তব্ধতা। পরমুহূর্তে ঝট্ করে খুলে গেল দরজা। প্রচণ্ড উত্তেজিত একটা কণ্ঠস্বর দরজার চৌকাঠের উপর থেকে আছড়ে পড়ল ঘরের ভিতরে, 'হেস্টিংস!'

পরক্ষণেই আর্তচিৎকার উঠল একটা। তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠেছে আগন্তুক। খোলা দরজা দিয়ে কেবল দেখা গেল, আগন্তুক ছায়ামূর্তিটা ঢলে পড়ল চৌকাঠের উপর। সাথে সাথে শব্দ হল সুইচ অন করার। পরমুহূর্তে চিৎকার শোনা গেল শহীদের, 'ইলেকট্রিকের কানেকশন কেটে দিয়েছে কেউ! টর্চ জ্বালুন, মি. সিম্পসন!'

কথাটা বলেই তড়াক করে লাফ দিয়ে বের হয়ে গেল শহীদ ঘরের বাইরে। মি. সিম্পসন রিভলভারটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলেন। ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন পকেটে। টর্চ বের করে জ্বালাতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ বিকট বুক-ফাটা

একটা আর্তনাদ উঠল পাশের ঘর থেকে। প্রথমে একটা তারপরই আর একটা।

টর্চটা পড়ে গেছে মি. সিম্পসনের হাত থেকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তিন চারটে চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হল। ঘরের ভিতরে অপেক্ষারত ভদ্রলোকগণ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দরজার দিকে ছুটে গেলেন দু'জন। ঠিক এমন সময় ঘরের ভিতরে ঢুকল শহীদ কামালকে নিয়ে। তারপরই জ্বলে উঠল ঘরের বাতি। শহীদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ঘরের প্রতিটি ব্যক্তির দিকে। ডি. কস্টার দিকে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ওর। ডি. কস্টা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে চৌকাঠের উপর পড়ে থাকা নিঃসাড় দেহটার দিকে। মি. সিম্পসনও তাকালেন সেদিকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'একি! এ তো আখতার চৌধুরী!'

ঘরের ভিতরে বিস্ময়বোধক গুঞ্জন উঠল। সকলেই ভীতস্বরে ফিসফিস করে উঠতে শুরু করল, 'আগন্তুক ভদ্রলোক যে চিত্র-প্রযোজক আখতার চৌধুরী! সোলায়মান চৌধুরী তাহলে কে?'

কামাল সকলকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আখতার চৌধুরীই ছদ্মবেশী সোলায়মান চৌধুরী। প্লাস্টিক সার্জারীর বদৌলতে সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন তিনি নিজের চেহারা। কিন্তু ওর বাঁ হাতটা অমন ঝলসে গেল কিভাবে? জ্ঞান হারিয়েছেন ভদ্রলোক। এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ ওঁর বাঁ হাতটা। কে নিজের হাতে আইন তুলে নেবার সাহস পেল?'

কারও মুখে উত্তর নেই কোন। সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে শুরু করল। শহীদকে দেখা যাচ্ছে না ঘরে। পাশের ঘরে গেছে সে। মি. সিম্পসন উপস্থিত পুলিস কমিশনারকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললেন, 'স্যার, আক্রমণকারী এই ঘরেই ছিল। আপনার সন্দেহ হয় কাউকে?'

কমিশনার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে পাশের ঘরে আর্তচিৎকার করে উঠল কেন? তুমি বলতে চাও, আখতার চৌধুরী ওরফে সোলায়মান চৌধুরীর প্রতি এসিড ছুঁড়ে পাশের ঘরে গিয়ে আরও দু'জনকে আহত করেছে আক্রমণকারী?'

শহীদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দরজার কাছ থেকে, 'ঠিক তাই। ও ঘরে গিয়ে আক্রমণকারী আহত করেছে হেস্টিংস আর ববকেও। আক্রমণকারী এ বাড়িতে একা আসেনি। একজন খানিকক্ষণের জন্যে ইলেকট্রিসিটির মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছিল। অন্যজন অন্ধকারের সুযোগে আখতার চৌধুরী ওরফে সোলায়মান চৌধুরীকে আহত করেছে। তারপরই পাশের ঘরে গিয়ে হেস্টিংস আর ববের একটা করে হাত কেটে নিয়ে ফিরে এসেছে আবার এই ঘরে। তারপর জ্বলে উঠেছিল আবার বাতি। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আক্রমণকারী এই ঘরের ভিতরেই এখনও রয়েছে। আর একটা দুঃখজনক খবর আছে। অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম পাশের ঘরে আত্মহত্যা করেছে। তার বাবার পরিচয় পেয়েই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সে।'

কমিশনারের হাতে রিভলভার। মি. সিম্পসনের হাতে রিভলভার। শহীদ এবং কামালের হাতেও রিভলভার। উপস্থিত চিত্র-প্রযোজক, সাংবাদিক, সম্পাদক পরস্পরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। মি. সিম্পসন ও কামাল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওসমান গনির দিকে। দরদর করে ঘামছেন ওসমান গনি। একবার কামাল আর একবার মি. সিম্পসনের দিকে বিমূঢ় চোখে তাকাচ্ছেন। শহীদের দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন। শহীদ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডি. কস্টার দিকে। ডি. কস্টা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জ্ঞানহীন আখতার চৌধুরী ওরফে সোলায়মান চৌধুরীর দিকে। মি. সিম্পসন শহীদের দেখাদেখি ড. কস্টার দিকে তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

অকস্মাৎ শহীদ গর্জন করে উঠল ডি. কস্টার দিকে রিভলভার তাক করে, 'ধরা পড়ে গেছ তুমি, কুয়াশা! মাথার ওপর হাত তুলে উত্তর দাও আমার প্রশ্নের।'

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডি. কস্টা শহীদের দিকে।

শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে ডি. কস্টার আপাদ-মস্তক পরখ করতে করতে বলে উঠল, 'তোমার ছদ্মবেশ আমাকে ধোঁকা দিতে পারেনি, কুয়াশা। তুমিই আহত করেছ, সোলায়মান চৌধুরী, হেস্টিংস আর ববকে।'

ডি. কস্টা হঠাৎ বিষম কণ্ঠে হাঃ হাঃ করে হেসে ফেলে বলে উঠল, 'টোমার ডেকছি ব্রেনের স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে, মি. শহীদ! আমাকে টুমি কুয়াশা মনে করে অপমান করছ মহট সাইনটিস্ট কুয়াশাকে। টোমার জানা উচিট, আমার চৌড্ড পুরুষ টপস্যা করলেও হামি কুয়াশা হটে পারি না।'

'মাথার ওপর হাত তোলো, কুয়াশা!'গর্জন করে উঠলেন মি. সিম্পসন রিভলভার উঁচিয়ে।

'মাঠা খারাপ! বলছি না, হামি ডি. কস্টা!'

শহীদ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, 'আমি জানি, কুয়াশা, তুমিই কঙ্কালের আবিষ্কারক। বল, সত্যি কিনা, তুমি আখতার চৌধুরীর বাড়ি যাওনি?'

ডি. কস্টাকে একটু চিন্তিত দেখাল। শহীদের দিকে তাকিয়ে তারপর বলে উঠল, 'কথাটায় ভুল আছে একটু। আমি না, কঙ্কাল গিয়েছিল বটে আখতার চৌধুরীর বাড়িতে। তখন জানা ছিল না কুয়াশার, আখতার চৌধুরীই আসলে সোলায়মান চৌধুরী। কঙ্কাল গিয়েছিল টাকা লুট করতে। আখতার চৌধুরীর মেয়ে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম তার অ্যাকাউন্টের সব টাকা বাবার আদেশে তুলে রেখে এসেছিল বাবারই কাছে। খবর পেয়ে কঙ্কাল সেখানে যায়, এবং টাকাটা সহজেই হস্তগত করে। আখতার চৌধুরী অবশ্য স্বীকার করেনি কথাটা। কেননা সেক্ষেত্রে তার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'আর ওসমান গনির বাড়িতেও তুমি দু'জন কঙ্কালকে পাঠিয়েছিলে, তাই না? মি. ওসমান গনির ছদ্মবেশে ছিল একজন, অপরজন মি. সারওয়ারের ছদ্মবেশে। আমার বিশ্বাস, তুমি চেয়েছিলে, মি. ওসমান গনির দ্বারা

আমাদের সমস্যা সমাধান করে দিতে। তাই মি. গনির মনে মি: সারওয়ার সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করার প্ল্যান নাও। তুমি জানতে, ওসমান গনি সবকথা আমাদেরকে না বলে পারবেন না। হয়েছিলও তাই। তাছাড়া, তোমার কঙ্কালরাই রক্ষা করে মহুয়া এবং লীনাকে। তারও আগে তোমার কঙ্কালকে যেদিন আমি অনুসরণ করে আহত হয়েছিলাম, সেদিনও তুমি আমাদের প্রতি নরম ভাব প্রকাশ করেছিলে। ইচ্ছে করলেই তোমার কঙ্কাল আরও আগে গাড়ি থেকে আয়রন-বল ফেলে আমার আর কামালের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারত। তোমার কঙ্কাল আমাদেরকে সমতলভূমি পর্যন্ত নিয়ে যাবার পরই বিপদে ফেলার ভান করেছিল। এবং তা তুমিই করিয়েছিলে। আমার জানা আছে, কঙ্কাল স্রেফ অত্যাশ্চর্য এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এর নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নেই। একে পরিচালনা করতে হয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এবং তুমি তাই করও। কিন্তু তুমি আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকলেও আমরা তোমার অন্যায়, বে-আইনী কর্মতৎপরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। তোমাকে গ্রেফতার করা হল, কুয়াশা। তুমি যতদিন ক্ষতিকর বৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলে, ততদিন আমরা তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে আবার অন্যায়, বে-আইনী কাণ্ড শুরু করেছ। এর সাজা পেতে হবে বৈকি তোমাকে। মি. সিম্পসন, কুয়াশার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন।'

মি. সিম্পসন পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করে সামনে পা বাড়ালেন। ডি. কস্টা অনড় দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। মি. সিম্পসন কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ দ্রুত পা বাড়াল সে দরজার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল কামাল ও মি. সিম্পসন। দু'জন মিলে দুটো হাত ধরে টান দিল ডি. কস্টার। ওদের দু'জনের হাতেই ডি. কস্টার দুই হাত কাঁধ থেকে আলগা হয়ে চলে এল। চমকে উঠে হাতহীন ডি. কস্টার দিকে তাকিয়ে রইল মি. সিম্পসন ও কামাল। দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ডি. কস্টা। পুলিস কমিশনার গুলি করলেন পিঠ লক্ষ্য করে।

পরপর তিনটে গুলি বিঁধল ডি. কস্টার পিঠে। থামল না সে। আহত হয়েছে বলেও মনে হল না। মি. সিম্পসন রিভলভার উঁচিয়ে তাক করলেন। শহীদ বলে উঠল, 'থাক, মি. সিম্পসন। ও কুয়াশাও নয়, ডি. কস্টাও নয়। ও কঙ্কাল। কুয়াশার সর্বশেষ এবং মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর আবিষ্কার!'

ঘরের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল ডি. কস্টার ছদ্মবেশে কঙ্কাল। ঘরের ভিতরে তার গমগমে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কুয়াশা আবার অত্যাচারীর সাজা দেবে নিজের হাতে। আবার সে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে দুষ্টের দমনে। আবার সে বিভীষিকা হয়ে দেখা দেবে অপরাধীদের সামনে। বিদায়। আবার দেখা হবে, কর্তব্যপরায়ণ বন্ধুগণ।'

মাথা নিচু করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সকলে। শহীদ ভাবছে, আবার শুরু হবে দুঃস্বপ্নে ভরা রাত, আবার শুরু হবে উত্তেজনা ভরা দিন। আবার পূর্ণোদ্যমে কাজে নামতে হবে কুয়াশাকে গ্রেফতার করার জন্যে।

কুয়াশা ২৬

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৭০

এক

কুয়াশার ডায়েরী থেকেঃ

বুয়েন্স এয়ার্সঃ ৫ জুলাই।

প্লাজা হোটেলের গেটের সামনে গতকাল যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আজ তার প্রথম পর্বের অবসান ঘটল। জানি না, এখানে এই প্রথম পর্বেই এই ঘটনার পূর্ণ সমাপ্তি ঘটবে, না ভবিষ্যতে অন্য কোন আশ্চর্য ঘটনার মধ্য দিয়ে তা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছুবে।

প্লাজা হোটেলে এক সপ্তাহ ধরে আন্তর্জাতিক বংশানুক্রম বিজ্ঞান সম্মেলন চলছিল। আজকে তা শেষ হল। গতকাল আমি যখন সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরোচ্ছিলাম লাঞ্চের তখনও কিছুক্ষণ বাকি ছিল। ট্যাক্সির জন্যে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নোংরা জীর্ণ পোশাক পরা এক স্থবির-প্রায় বৃদ্ধ হোটেলে ঢুকবার জন্যে দারোয়ানের কাছে কাকুতি-মিনতি করছিলেন এবং দারোয়ান তাঁকে ধমকে তাড়াবার চেষ্টা করছিল। বৃদ্ধ কথা বলছিলেন জার্মান ভাষায় আর দারোয়ান বলছিল স্পেনীয় ও ইংরেজি মেশানো বিচিত্র এক ভাষায়। বৃদ্ধের নিবেদনে স্বভাবতই কর্তব্যপরায়ণ দারোয়ানের মন গলবার কথা নয়। প্রথমটায় আমিও ভেবেছিলাম লোকটা ভিখিরি-টিখিরি হবে। কিন্তু তাঁর চেহারায় বিশেষ করে তাঁর সবুজ চোখের তারায় এক আশ্চর্য দ্যুতি দেখতে পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম আমি। বৃদ্ধও আমাকে দেখলেন আপাদমস্তক। তারপর দারোয়ানকে বিস্মৃত হয়ে আমার দিকেই এগিয়ে এলেন। আমি ভাল করে দেখলাম, সত্যি অসাধারণ দীপ্তিময় বৃদ্ধের চোখ দুটো।

কিন্তু বৃদ্ধ ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তিন পা হেঁটে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েই তিনি হাঁপাতে লাগলেন। আমার বুকে আঁটা প্লাস্টিকের প্লেটের দিকে তাঁর দৃষ্টি। তাতে লেখা ছিল আমার পোশাকী নাম। পরিচয়ঃ আন্তর্জাতিক বংশানুক্রম বিজ্ঞান সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি। সেটাতে চোখ বুলিয়ে বৃদ্ধ কি যেন আমাকে বলতে চাইলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। কাশতে লাগলেন তিনি। শুকনো কাশি এবং সে কাশি সহজে থামল না। কাশির প্রচণ্ড দমকে তিনি ফুটপাতের উপর বসেই পড়লেন। অভিজাত হোটেলের দারোয়ানের

তা সহ্য হল না। সে চটে-মটে এগিয়ে এল। স্পেনীয় ককনি আমার জানা নেই, তবে তার অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হল, মুখ নিঃসৃত শব্দগুলো যথেষ্ট অভিজাত না-ও হতে পারে। ইশারায় তাকে বাধা দিয়ে বৃদ্ধকে আমি তুলে নিয়ে একটু দূরে গেলাম। আমার কাণ্ডটা দেখে দারোয়ান অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধের কাশি থেমেছিল। তাঁকে আমি বললাম, 'আমায় কিছু বলবেন?'

মাথা নাড়লেন তিনি। একটু বিশ্রাম নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'জার্মান জান?' তাঁর উচ্চারণ শ্লেষ্মাজড়িত ফ্যাঁসফেঁসে।

'জানি, কিছু কিছু।'

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'তুমি তো জেনেটিকস সম্মেলনে যোগ দিচ্ছ। আচ্ছা বলতে পার, ম্যানফ্রেড শেলবুর্গের অনুপস্থিতিতে কোন জেনেটিকস সম্মেলন হতে পারে?'

'ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ!' আমি অবাক হয়ে উচ্চারণ করলাম।

বৃদ্ধের ঠোঁটটা বেঁকে গেল, 'ওহ্, তোমরা তাঁর নামটাও শোননি বোধহয়!'

ম্যানফ্রেড শেলবুর্গের নাম আমি শুনেছি। শুধু আমি না, জেনেটিকস সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারাও শুনেছে। তাঁকেই তো ঐ বিজ্ঞানের পিতা বলে গণ্য করা হয়। হিটলারের আমলে জার্মানির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন ছিলেন তিনি। জার্মান বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন বেশ কয়েক বছর। আমি তাঁর নাম শুনেছি, তাঁর বই পড়েছি। বই-এর মলাটে, পত্র-পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখেছি। এই সম্মেলনেও বারবার তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁকে দেখবার সুযোগ আমার হয়নি। শুনেছি, বার্লিনের পতনের দিন তাঁকে তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রসহ শেষবারের মত দেখা গিয়েছিল। পরে শোনা যায়, তিনি মারা গেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে যুদ্ধোত্তর কালে মিত্রপক্ষের গোয়েন্দারা তাঁকে খোঁজা-খুঁজি করেনি। যুদ্ধ-অপরাধীদের তালিকায় তাঁরও নাম ছিল।

আমি বললাম, 'তিনি তো মারা গেছেন।'

করুণ হাসি হাসলেন বৃদ্ধ, 'ভুল। হিটলারের মানবতা বিরোধী অপরাধে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করতে হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নিজ দেশে বিরোধী শক্তির হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে সে চায়নি। তাই এক গোয়ালার হাতে সে তার শিশুপুত্রকে তুলে দিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। তারপর থেকে সে জীবনমৃতের মতই জীবন-যাপন করে আসছে।'

সন্ধানী দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক এতদিন পরে এই অবিশ্বাস্য খবর কোত্থেকে পেলেন? কে ইনি? ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ স্বয়ং? ড. শেলবুর্গের যে ছবি দেখেছিলাম এই রোগপাণ্ডুর বৃদ্ধের চেহারার সাথে তার কোন সাদৃশ্য নেই। কিন্তু বৃদ্ধের দ্যুতিময় দুটো চোখের সাথে সুদূর অতীতে দেখা ছবির

চোখ দুটোর যেন সাদৃশ্য দেখতে পেলাম অনেকটা।

সন্দেহ ঘুচল না। তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনিই কি তাহলে ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ?'

আমার প্রশ্নটা বোধহয় তাঁর কানে গেল না। চলমান জনস্রোতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি বোধহয় তখন অতীত বার্লিনের কোন স্মৃতিচারণ করছিলেন। একটু সরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'সিগারেট আছে?'

সিগারেট কেস বাড়িয়ে ধরলুম। কিন্তু উনি সিগারেট নিলেন না। আনমনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু পাঁচ-ছয় পায়ের বেশি হাঁটতে পারলেন না। হাঁপাতে লাগলেন। আমি দ্রুত তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেহারায় তাঁর যন্ত্রণার ছাপ। কষ্ট হচ্ছিল খুব।

আমি বললাম, 'হের শেলবুর্গ, আপনাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিই?'

জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না। একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন, 'কে বললে আমি শেলবুর্গ?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ভুল হয়ে গেছে আমার। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে চলুন কোন লাঞ্চ কাউন্টারে গিয়ে বসি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগছে।'

লোলচর্ম বৃদ্ধের চোখ দুটোতে যেন আগুন জ্বলে উঠল। কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'নো, মি. আলী। থ্যাঙ্কস। কিন্তু আমি ভিখিরী নই। জার্মানরা ভিক্ষা নিতে জানে না।'

'না না, আমি তা বলিনি,' ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালাম।

আবার কাশতে শুরু করলেন বৃদ্ধ। এবারেও কাশির দমকে তিনি বুক চেপে ধরে ফুটপাতের উপর বসে পড়লেন। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। একটু অপেক্ষা করে ট্যাক্সি ডাকলাম আমি। বৃদ্ধকে জোর করেই ট্যাক্সিতে তুললাম। অবশ্য আমাকে বাধা দেবার মত শক্তিও বৃদ্ধের দেহে ছিল না। সিটের গদীতে হেলান দিয়ে আচ্ছন্নের মত বসে রইলেন তিনি।

ট্যাক্সি চালককে বললাম, 'সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে চলে যাও।'

হাসপাতালে যখন গাড়ি থামল তখন তিনি অচৈতন্য প্রায়।

ভর্তি করাবার জন্যে পকেট থেকে কাগজপত্র বের করতে হল। আমার ধারণা যে নির্ভুল, তার পরিচয় পাওয়া গেল। জার্মান পাসপোর্ট ছিল তাঁর পকেটে। নামটা অন্যঃ ফ্রেডম্যান লিণ্ডবার্গ। কিন্তু পাসপোর্টে যে ছবিটা আছে ঠিক সেই ছবিটাই দেখেছি ম্যানফ্রেড শেলবুর্গের বইয়ের মলাটে। দেখেছি পুরানো জার্মান সায়েন্স ম্যাগাজিনে। না, কোন ভুল নেই। ইনিই ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ।

প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন, 'একেবারে শেষ মুহূর্তে নিয়ে এসেছেন। দেহে হাজারোটা রোগ বাসা বেঁধেছে। ফুসফুসটা বিধ্বস্ত প্রায়। চল্লিশ

ঘন্টা বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে।'

খরচ বাবদ অগ্রিম অর্থ দিয়ে চলে এলাম।

সকালে হাসপাতাল থেকে ফোন এলঃ ৩৫৮ নম্বর বেডের রোগী ফ্রেডম্যান শেলবুর্গ এখুনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

সোজা চলে গেলাম হাসপাতালে।

নোংরা জীর্ণ পোশাকগুলো ছাড়িয়ে ফেলাতেই বোধহয় ড. শেলবুর্গকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখাচ্ছিল। চেহারাতেও একটা প্রশান্তির ভাব। আমাকে দেখে তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'বোস আমার কাছে। আমার সময় হয়ে এসেছে। তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। তাই ডেকেছি।'

'বলুন।'

'স্বীকার করছি, আমিই ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ। তোমরা যাকে বল, ফাদার অব জেনেটিকস। এ অভিধার উপযুক্ত আমি কিনা তা জানি না, তবে আমি এমন একটা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলাম যা এখনও তোমাদের কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ। আমিই প্রথম পৃথিবীতে ইউজেনিকস সম্ভব করে তুলেছি। মানুষের হাজার হাজার বছরের স্বপ্নকে আমি বাস্তবায়ন করেছি। এগুলোকে আমার অসুস্থ মনের বিকার বলে মনে কোরো না।'

অবিশ্বাস আমি করিনি। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

ড. শেলবুর্গ একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন, 'আমিই সুপারম্যান গড়ে তুলেছিলাম হিটলারের নির্দেশে। হিটলার চেয়েছিল, ভবিষ্যতের জার্মান তথা সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে একাধিক সুপারম্যান। আমার উপর দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল। আমি প্রথমে অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে টিকতে পারিনি। আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এক গোপন গবেষণাগারে। পরীক্ষামূলকভাবে একটা সুপারম্যান আমি গড়ে তুলেছিলাম। জার্মানির তখন পতন আসন্ন। বার্লিনের পতনের দিনে সুপারম্যান বেবীকে নিয়ে আমি পালিয়েছিলাম বিধ্বস্ত গবেষণাগারের ভাঙা দেয়াল টপকে। যদিও জানতাম, আমি এক ফ্র্যাংকেনস্টাইনের জন্ম দিয়েছি তবু নিজের বৈজ্ঞানিক কীর্তি হিসেবে তাকে প্রাণে মারতে পারিনি। তাছাড়া সে-ও তো একটা প্রাণ। তাকে হত্যার কি অধিকার আছে আমার? আমি যে বিজ্ঞানী, আমি যে স্রষ্টা। পরিচিত এক গোয়ালার হাতে তাকে সঁপে দিয়ে আমি পালিয়ে এলাম। জানি না, সেই গোয়ালা বা সেই সুপারম্যান শিশু বেঁচে আছে কিনা। যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে শয়তানের বয়স এখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে।'

আবার থামলেন তিনি। মিনিট পাঁচেক চোখ বন্ধ করে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, 'এসব তোমাকে বলছি এই জন্যে যে, তুমিই আমার জীবনের শেষ বন্ধু। তুমিও জেনেটিকস বিজ্ঞানী এটাও তার অন্যতম কারণ। সুপারম্যানকে

ডেভলপ করার বিদ্যা তোমাকে বলতে পারতাম, কিন্তু বলব না। কারণ পৃথিবীর সুপারম্যান দরকার নেই। এমনিতে পৃথিবীতে এত বৈষম্য। তা আর বাড়ানো উচিত নয়। তাছাড়া তোমরা যে সুপারম্যান গড়তে গিয়ে স্বার্থে অন্ধ হয়ে অমানুষ গড়ে তুলবে না, কে তার নিশ্চয়তা দেবে? আমার এক ইণ্ডিয়ান ছাত্র এদিকে ঝুঁকেছিল। তাকেও আমি সেই গূঢ় রহস্যের সন্ধান দিইনি। তবে সে ছিল অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী, আর সে নির্ভুল পথ ধরেই এগোচ্ছিল, এমন কি তাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। আমার বিশ্বাস, সে তার সাধনায় হয়ত ইতিমধ্যেই সিদ্ধিলাভ করেছে। তোমাকে আমার অনুরোধ, যদি কখনও সম্ভব হয় তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে অনুরোধ কর, সে যেন সুপারম্যান সৃষ্টি করে মানবতার অকল্যাণ না ঘটায়। বল, তুমি চেষ্টা করবে? আর যদি সে জন্ম দিয়েই থাকে তাহলে তাকে ধ্বংস করতে হবে। জানি না, সেটা সম্ভব কিনা।'

আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, 'আপনার সেই ইণ্ডিয়ান ছাত্রের নাম কি, হের ডক্টর?'

'লুকম্যান এইচ কিম।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ভারতে তো এই ধরনের নাম হয় না সাধারণত? বৃটিশ বা অন্য কোন জাতি না তো?'

মাথা নেড়ে ড. শেলবুর্গ বললেন, 'আমার স্মরণশক্তি এখনও তীক্ষ্ণ আছে। সে ছিল, বেঙ্গলী মুসলিম। ইণ্ডিয়া তো এখন ভাগ হয়ে গেছে। কে জানে কোথায় আছে সে, আর বেঁচে আছে কিনা।'

নার্স এরমধ্যে দু'বার উঁকি দিয়ে গেছে। এবারে সে এসে বলল, 'মাফ করবেন, আপনি দয়া করে উঠুন। ওঁর আর কথা বলা উচিত নয়।'

আমি লজ্জিত হলাম। রোগপাণ্ডুর বৃদ্ধের উজ্জ্বল দুটো চোখের দিকে চেয়ে আমি বিদায় প্রার্থনা করলাম। উনি আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নার্সের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় সাহস পেলেন না।

ক্লান্তকণ্ঠে শেষবারের মত তিনি বললেন, 'অ'রভোয়া। আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বৃদ্ধের পরমায়ু নিঃশেষিত। বোধহয় কাউকে না কাউকে নিজের কথাগুলো প্রকাশের জন্যেই মনের জোরে তিনি টিকে ছিলেন এতদিন। তাঁকে অকারণ সান্ত্বনা দেবার তাই প্রয়োজন মনে করিনি।

বিকেলে হাসপাতাল থেকে ফোন এলঃ ফ্রেডম্যান লিণ্ডবুর্গ পরম করুণাময়ের সুশীতল ছায়াতলে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমেন। আমেন।

হামবুর্গঃ ৬ আগস্ট।

ড. শেলবুর্গ মারা গেছেন কিন্তু আমার মনের মধ্যে এক গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি

করে দিয়ে গিয়েছেন। সুপারম্যান বেবীর সন্ধানে আমি জার্মানিতে ঘুরে বেরিয়েছি একমাস ধরে। যে গোয়ালার কাছে শেলবুর্গ সুপারম্যান বেবীকে সঁপে দিয়েছিলেন, তার খোঁজ পাওয়া গেল এখানে, হামবুর্গে জানতে পারলাম, সে শিশুটাকে হামবুর্গের একটা এতিমখানায় ভর্তি করে দিয়েছিল।

এতিমখানায় খোঁজ নিলাম। তারা জানাল, শিশুটিকে এক ভদ্রলোক নিয়ে গেছেন দত্তক হিসেবে। পালক পিতার নাম বলল না ওরা। তবে আমি খোঁজ করে জানতে পেরেছি, 'লুকম্যান এইচ কিম' নামে এক বৃটিশ নাগরিক শিশুটিকে দত্তক নিয়েছেন। কিমের ঠিকানাটা এখনও পাইনি।

দুই

কয়েক মাস পরে এক গভীর রাতে।

টঙ্গীর হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার সেলিম আতহার ও পারভেজ ইমাম ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরছিল। রাত তখন বারোটার কাঁটায় পৌঁছেছে। আরও অনেক আগেই ফিরতে পারত কিন্তু বিনি পয়সার মদ পেয়ে পারভেজ আকণ্ঠ টেনেছে। ঘরে ফেরারও তাড়া ছিল না। পারভেজ অবিবাহিত ও সেলিম আতহারের স্ত্রী-রত্নটি পিত্রালয়ে নাইয়রে গেছেন।

রাতগুলো অবশ্য ওদের কাছে দামি কম নয়। দিনের কাজের শেষে প্রায়ই ওরা রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর ড. কাসেম আল-রাজীর সঙ্গে গবেষণা চালায়। আজকেও ওদের রিসার্চ সেন্টারে যাবার কথা ছিল। কিন্তু ড. রাজী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রোগ্রামটা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং আমন্ত্রণ সেরে তাড়াতাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না। ওদের রাতের অপর সঙ্গী রুহুল করিম ডিনারের শেষেই ভেগেছে। ড. রাজীও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি অসুস্থতার জন্যে আসতে পারেননি।

আমন্ত্রিতের সংখ্যা নগণ্য। আমন্ত্রণকর্তা আলী সাহেব একজন ইনডেন্টার। রিসার্চ সেন্টার বিদেশ থেকে কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আনবে। তার ইনডেন্ট পাওয়ার জন্যে ভদ্রলোক কিছুদিন ধরে দৌড়াদৌড়ি করছেন, সম্ভবত ড. রাজীকে পটানোর জন্যেই এক অভিজাত হোটেলে এই নৈশ-ভোজের আয়োজন করেছিলেন। নৈশ-ভোজের পরে ছিল পানীয়ের অঢেল ব্যবস্থা। আলী সাহেব শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁকে বাসায় ফিরতে হয়েছিল। তবে তাঁর কর্মচারীরা ভদ্রতার ত্রুটি করেনি।

মদ্যপানে সেলিমের ততটা অনুরাগ নেই। বেশ কয়েকজন পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছিল পার্টিতে। গল্প-গুজব করে বেশ কাটল।

সেলিম এখন ভাবছিল অন্য কথা। সে পারভেজকে বলল, 'ড. রাজী কি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?'

অতর্কিত প্রশ্নটার অর্থটা বুঝতে পারল না পারভেজ। সে অবাক হয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, 'তার মানে?'

'আমার মনে হয়, পিউরিটান ড. রাজী এভাবে এড়িয়ে গেলেন আলী সাহেবকে। যদি কোন কারণে তাকে ইনডেন্ট না দিতে পারেন, তখন যেন চক্ষু-লজ্জায় পড়তে না হয়।'

পারভেজ এতটা তলিয়ে দেখেনি। সে বলল, 'বলতে পারব না। তবে পিউরিটান যারা তারা তো মিথ্যে কথা বলে না।'

সেলিম তার যুক্তির অসারতা অনুভব করে চুপ হয়েগেল।

গাড়িতে আর কোন কথা হল না। সেলিমের বাসার কাছে এসে পড়েছিল গাড়িটা। পারভেজ চালাচ্ছিল। সে গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে বলল, 'কিরে নামবি?'

'তো কি করব? তুইও নাম না, সারারাত গল্প করা যাবে।'

'তারচেয়ে বরং চল ড. রাজীর খবর নিয়ে আসি।'

'এত রাতে? উনি নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন।'

'রাত আর কত হয়েছে। সাড়ে বারোটা। দুটোর আগে তো ওঁর ঘুমের কথা কল্পনাই করা যায় না।'

'তবে চল ঘুরে আসি।'

স্পীড বাড়িয়ে দিল পারভেজ।

মিনিট দশেক পরে গাড়ি ড. রাজীর গেটের সামনে থামল। গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে সেলিম দেখল, ড. রাজীর শয়নকক্ষে ম্লান নীল আলো জ্বলছে। জেগে থাকলে উজ্জ্বল আলো জ্বলত। আর বাসায় না থাকলে জ্বলত ম্লান লাল আলো।

সে বলল, 'উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়, শোবার ঘরে নীল আলো জ্বলছে। পারভেজও উঁকি দিয়ে দেখল। তবু কয়েকবার হর্ন বাজাল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না।'

'চল, ফেরা যাক।'

গাড়িতে স্টার্ট দিল পারভেজ। সেলিম একটা সিগারেট ধরাল। সামনের দিক থেকে একটা গাড়ি আসছিল। সরু পথ। স্পীড কমিয়ে দিয়ে বাঁ দিকে সরে আগত গাড়িটার জন্যে আর একটু জায়গা দিল পারভেজ। ওদিকটায় খাল। খেয়াল না করলে দুর্ঘটনা অনিবার্য।

গাড়ির নম্বর পড়া সেলিমের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। চোখ দুটো তার আপনাআপনি নম্বর প্লেটের দিকে নিবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না এবং নম্বরটা পড়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। গাড়িটা পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই পেছনের জানালা দিয়ে গাড়িটার নম্বর আবার দেখল।

আপন মনে উচ্চারণ করল সেলিম, 'আশ্চর্য!'

পারভেজ মুখ ফিরিয়েই বলল, 'কি হল রে?'

'ড. রাজীর গাড়ি।'

'ড. রাজীর গাড়ি? বলছিস কি, সেটা তো ড. রাজীর গাড়ি-বারান্দাতেই দেখে এলাম!'

'কিন্তু নম্বর তো একেবারে অভিন্ন। আর এটাও লাল রং-এর ফিয়াট।'

'তা অবশ্য ঠিক, লাল রং-এর ফিয়াট। দেখেছি আমিও। কিন্তু নম্বর পড়তে নিশ্চয়ই ভুল করেছিস।'

'অসম্ভব,' দৃঢ় গলায় বলল সেলিম।

'তাহলে চল তো, রিসার্চ সেন্টারে খবর নিয়ে আসি। সন্দেহ যখন হয়েছে তখন সেটা ভঞ্জন করাই ভাল।'

মোসলেম বিশ্বাস এ সপ্তাহের নাইটগার্ড। লোহার বিরাট গেটটার পিছনে একটা টুলের উপর বসে বক সিগারেট টানছিল। গাড়ির শব্দ কানে যেতেই সে বাইরের দিকে তাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা পিছনে লুকাল।

সেলিম ও পারভেজ গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওরা জানে, রাতে ড. রাজী নিজে রিসার্চ সেন্টারে না থাকলে ওদেরও প্রবেশের অধিকার নেই। মোসলেম বিশ্বাস তাই গেট খোলবার পাঁয়তারা না করায় ওরা অবাক হল না।

ওরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মোসলেম বিশ্বাস বলল, 'বড় সাহেব তো এখন নেই, স্যার। একটু আগে, এই মিনিট পনের আগে চলে গেছেন।'

সেলিম ও পারভেজ অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। সেলিম নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কতক্ষণ ছিলেন?'

'ঘন্টা দু'য়েক ছিলেন। একটা বড় সুটকেস সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ওঁকে অসুস্থ বলে মনে হল।'

'কিছু বলেছিলেন আমাদের কথা?'

একটু ইতস্তত করে মোসলেম বিশ্বাস বলল, 'বলেছিলেন যে, আপনারা তিনজন এলে যেন বলি, আজ রাতে উনি একাই কাজ করবেন ল্যাবরেটরিতে।'

আবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল সেলিম ও পারভেজ। এটাও তো এক অদ্ভুত ব্যাপার! দু'জনের একজনও এমন কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

'নিজের গাড়িতেই এসেছিলেন, না বেবীট্যাক্সিতে?'

'নিজের গাড়িতেই।'

সেলিমের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে মোসলেম বিশ্বাস একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কোন গোলমাল হয়নি তো, স্যার?'

মোসলেম বিশ্বাসের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে সেলিম বলল, 'না,

গোলমাল কিসের? উনি অসুস্থ অবস্থাতেও এসেছিলেন, সেটাই চিন্তার বিষয়। চলি আমরা।'

'চল, পারভেজ।'

'চল।'

দু'জন গিয়ে গাড়িতে উঠল। পারভেজ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'তাহলে দাঁড়ালটা কি?'

'তুই তো গাড়িটা ঠিক দেখেছিলি ড. রাজীর বাসায়?'

'নিশ্চয়ই। তা জানিস তো, মদ যত বেশি খাব আমার ইন্দ্রিয়গুলোও তত তীক্ষ্ণ হবে।'

'কিছু একটা রহস্য আছে এর মধ্যে।'

'তা তো বটেই, এবং সেটা উদঘাটন করতে হবে। ড. রাজী যে রিসার্চ সেন্টারে আসেননি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ নিশ্চয়ই অন্য লোক, ড. রাজীর ছদ্মবেশে এসেছিল। কিন্তু তা-ও যেন বিশ্বাস হতে চায় না।'

'কিন্তু ছদ্মবেশ কি এতই নিখুঁত হতে পারে? তাছাড়া বেশ ছদ্ম হলেও কণ্ঠ তো আর ছদ্ম নয়? চলাফেরাটাও নয়। মোসলেম বিশ্বাস নিশ্চয় টের পেত। সে তো চালাক লোক।'

সেলিম বলল, 'এখন তো তাই মনে হচ্ছে। এখন কি করতে চাস?'

সেই কথাই ভাবছিল পারভেজ। হঠাৎ একটা কথা তার কানে কানে কে যেন বলে গেল। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চাপল সে।

'কি রে, জবাব দিচ্ছিস না যে? এখন কি করা উচিত, বল কিছু?'

'আমার যতদূর মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে প্রকাশ্যে হৈ-চৈ না করে গোপনে খোঁজ নেওয়া উচিত আপাতত।'

'কিন্তু তাতে যদি এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়? তার মানেটা ভেবে দেখেছিস? কে জানে, ছদ্মবেশীর লক্ষ্যটা কি। আমার তো সন্দেহ হয়…।'

'সে আশঙ্কা আমারও হচ্ছে। কিন্তু কয়েকদিন নিজেরাই গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখি। ড. রাজীর কানে এখুনি কথাটা তুলে লাভ নেই। অবশ্য অন্য সূত্রে তিনি জানতে পারলে কিছু করার নেই। আর দেখাই যাক না।'

সেলিম বলল, 'বেশ। তবে তাই হোক।'

তিন

এক সপ্তাহ পরে।

হাকিম রিসার্চ সেন্টারটা যে এলাকায় অবস্থিত একদা তা ছিল গভীর জঙ্গল। এখন তা অনেকটা ফাঁকা হয়েছে। এখানে-সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় কল-

কারখানা। আবাসিক ভবনও উঠেছে দু'একটা। কিন্তু দিনের বেলা জনসমাগম থাকলেও রাতে এলাকাটা নির্জনতায় ধুঁকতে থাকে। অতীতের স্মৃতি হিসেবে এখানে-সেখানে এখনও যে ঝোপ-ঝাড়গুলো আছে সেখানে বাঘের ডাক না শোনা গেলেও সন্ধ্যার পর থেকেই শিবাকুলের আলাপনে জায়গাটা মুখর হয়ে ওঠে।

রিসার্চ সেন্টারের গেটটা উত্তরমুখী। মেইন রোড থেকে প্রায় একশ' গজ প্রাইভেট পথটা রাতে বিদ্যুতের আলোকে ঝলমল করছে। পথটার দু'পাশে অর্থাৎ উত্তরে ও দক্ষিণে ছোটখাটো ঝোপঝাড়। পূর্বদিকের জঙ্গলগুলো একটু বেশি ঘন। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই দু'জন লোক ইতিউতি করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। তাদের দৃষ্টি রিসার্চ সেন্টারের বাইরের আলোক-উজ্জ্বল কংক্রিটের পথটার দিকে। তারা অবস্থানস্থলটাও বেছে নিয়েছে কংক্রিটের পথটার কাছেই। ওদের একজন কুয়াশা। অন্যজন তার অন্যতম যোগ্য সহকারী কলিম। আরও কয়েকজন লুকিয়ে আছে রিসার্চ সেন্টারের চারদিকে।

কুয়াশা নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। সে খবর পেয়েছে, ড. রাজীর আজ রাতে রিসার্চ সেন্টারে আসবার সম্ভাবনা নেই। নাইটগার্ড তা জানে না। তাই এই রাতটাই সে বেছে নিয়েছে রিসার্চ সেন্টারে অভিযান চালানোর জন্যে।

ঘন্টা দু'য়েক চুপচাপ বসে রইল ওরা। কিন্তু কতক্ষণ আর এমন করে বসে থাকা যায়? উসখুস করতে লাগল কলিম। সে বলল, 'রাত তো বারোটা বাজতে চলল। মান্নান তো এখনও এসে পৌঁছুল না।'

কুয়াশা বলল, 'আরও কিছুক্ষণ দেখা যাক।'

কুয়াশার দৃষ্টি তখন গেটের দিকে অগ্রসরমান একটা ভক্সলের উপর। গাড়িটা দেখে চমকে উঠল কুয়াশা। চমকে উঠল কলিমও। আরে, এটা যে তাদেরই গাড়ি! এই গাড়ি নিয়েই তো মান্নান সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গেছে। তার তো এভাবে গাড়ি নিয়ে রিসার্চ সেন্টারে আসবার কথা ছিল না। ব্যাপারটা কি?

'ভাইয়া, সর্বনাশ! এ যে দেখছি আমাদেরই গাড়ি। মান্নান তো এই গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যায়। ও এখানে কেন?'

'ঠিক আছে, চুপ করে বসে থাক। দেখ, কি হয়,' গাড়িটার দিকে চোখ রেখে কুয়াশা বলল।

গাড়িটা এসে রিসার্চ সেন্টারের গেটের সামনে থামল। ঠিক ওদের নাকের ডগায় পার্ক করে যে লোকটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে মান্নান নয়, সে হচ্ছে রিসার্চ সেন্টারের খোদ বড়কর্তা ড. কাসেম আল-রাজী। কুয়াশা এবার ভীষণভাবে চমকাল, সর্বনাশ হয়ে গেছে! ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে।

কুয়াশা চঞ্চলভাবে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, কলিম। মান্নান বোধহয় ধরা পড়েছে। এখুনি ওর খোঁজে বেরুতে হবে। তার আগে এক কাজ কর...গাড়ির বুটটা চট করে দেখে আয়, ভিতরে মান্নান আছে কিনা।'

কলিম সন্তর্পণে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। ড. রাজী তখন গেটের ভিতরে ঢুকে গেছেন। গেট বন্ধ হয়ে গেছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেল কলিম। মাত্র ছয়-সাত হাত দূরে গাড়িটা। পেছনে বুটের দিকে একটা গাছের ছায়া পড়েছে। তাতে করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সুবিধেই হল কলিমের। সে বুটের হ্যাণ্ডেল ঘোরাল। তারপর একহাতে ঢাকনাটা তুলে ধরার চেষ্টা করল। উঠল না ঢাকনাটা। চাবি লাগানো আছে নিশ্চয়ই। তাতে করে ভিতরে মান্নানের থাকবার সম্ভাবনাই বেশি। উত্তেজনায় একটা ঝড় বয়ে গেল কলিমের বুকের মধ্যে। সে দ্রুত প্যান্টের পকেট থেকে কয়েকটা বাঁকানো শিক বের করল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে তার মধ্যে থেকে একটা শিক বেছে নিয়ে চাবির গর্তে ঢুকিয়ে দিল। কয়েকবার এদিক-ওদিক ঘোরাতেই কটকট করে আওয়াজ হল। শিকটা বের করে আবার ঢাকনাটা তুলে ধরার চেষ্টা করল। এবারে সফল হল সে। ঢাকনাটা দুই ইঞ্চি পরিমাণ তুলে পেন্সিল টর্চ বের করল সে পকেট থেকে। বুটের মধ্যে টর্চটা ঢুকিয়ে দিয়ে জ্বালল। না, ভিতরটা একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই। নিরাশ হল কলিম।

সে ফিরে আসতেই কুয়াশা বলল, 'তুই এখুনি চলে যা। দ্যাখ, মান্নানের কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা।'

কলিম জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হল।

কুয়াশার মনের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে। সে বুঝতে পেরেছে, ভেস্তে যেতে চলছে তার প্ল্যান। এত সাবধানতা সত্ত্বেও জানাজানি হয়ে গেছে তার প্ল্যান? শুধু তাই নয়, তার প্ল্যান ব্যবহার করে তাকেই বোকা বানাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বন্ধু, কুয়াশা মনে মনে তাকে চ্যালেঞ্জ করল, দেখা যাক, চূড়ান্ত লড়াইয়ে কে জেতে কে হারে।... নিজেকে যতই তুমি লুকিয়ে রাখ আমার কাছে ধরা পড়ে গেছ। আমি জানি, তুমি এখন পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারনি। পারবে, এমন আশাও তুমি কোরো না। আজকে এখানেই তোমার সাথে আমার চূড়ান্ত বোঝাপড়া হবে। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

ঘড়ি দেখল কুয়াশা। রাত একটা। এক ঘন্টা হল ড. রাজী ভিতরে গেছেন। এখনও বেরুচ্ছেন না। অথচ কুয়াশা জানে, তাঁর বেশিক্ষণ ভিতরে থাকার কথা নয়। থাক যতক্ষণ খুশি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না কুয়াশাকে। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এ কলিম। সে গভীর উৎকণ্ঠার সাথে বলল, 'ভাইয়া, মান্নানকে পাওয়া গেছে। পাশে একটা ঝোপের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল সে। অবস্থা খুবই খারাপ। কিছুতেই জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। বোধহয় বাঁচবে না। আপনি আসুন। এখন তো আর ডাক্তার পাওয়া যাবে না কাছে পিঠে।'

'বলিস কিরে!' উদ্বিগ্ন হল কুয়াশা, 'কিন্তু এখানে যে আমার থাকা দরকার?'

'তাহলে মান্নানকে বাঁচানো যাবে না। অবস্থা খুবই খারাপ।'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল কুয়াশা। কোনকিছুর বিনিময়েই সে তার সহকারীদের হারাতে পারে না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, মান্নানকে দেখিয়ে দিয়ে তুই আবার ফিরে আসবি এখানে। কিছু ঘটলে আমায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দিবি।'

মিনিট পনের পরে কলিম আবার যথাস্থানে ফিরে এল। সে বসতেই একটা লাল রঙের ফিয়াট গেটের সামনে এসে থামল। কলিম সবিস্ময়ে দেখল, মান্নানের ভক্সল থেকে যিনি নেমেছিলেন আর ফিয়াট থেকে এইমাত্র যিনি নামলেন তাঁরা দু'জন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ এই গাড়িটা থেকেও রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর ড. কাসেম আল-রাজীই নামলেন। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কলিম। যমজ ভাই নয়ত? নিশ্চয়ই না, দু'জনের একজন নিশ্চয়ই নকল। কিন্তু কোনটা। সম্ভবত প্রথমে যে এসেছে সেই-ই। মান্নানকে সে-ই পিটিয়ে আধমরা করেছে। সে-ও দেখে নেবে। দাঁতে দাঁত ঘষল কলিম।

ড. রাজী গাড়ি থেকে নেমে ভক্সলটার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখটা অন্ধকারের দিকে থাকায় কলিম দেখতে পেল না। কিন্তু সে বুঝতে পারল, গাড়িটা দেখে ভদ্রলোক বিস্মিত হয়েছেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে।

কলিম দেখল, ড. রাজী ধীরে ধীরে গেটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু কেউ গেট খুলল না। দাঁড়িয়েই আছেন ড. রাজী। বৈদ্যুতিক ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে বারবার। কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল।

আর তারপরেই ঘটল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটাঃ

সামনের ঝোপের অন্ধকার থেকে বিরাট পাহাড়ের মত একটা মূর্তি বেরিয়ে এল। কেঁপে উঠল কলিম। মানুষের মতই দেখতে, কিন্তু মানুষের চেয়েও দেড়গুণ বেশি লম্বা আর বিশাল লোকটার বপু। লাল টকটকে গায়ের রঙ। পরনে শুধু মাত্র একটা জাঙ্গিয়া। সে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় অথচ নিঃশব্দে ড. রাজীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ড. রাজীও বোধহয় ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। দৈত্যাকার মূর্তিটা তাঁর চোয়াল দুটো চেপে ধরল।

কলিমের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। সে কি স্বপ্ন দেখছে? না, এ তো স্বপ্ন নয়। অথচ বিশ্বাস করা যাচ্ছে না নিজের চোখকে। কি ভয়ঙ্কর আর কি বিশাল ঐ মূর্তিটা! না, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকেও সে ভরসা পেল না। ভাইয়া তো কাছেই আছে, তাকেই খবরটা দিয়ে আসা উচিত।

সন্তর্পণে প্রস্থান করল কলিম। রাস্তায় উঠে সে প্রাণপণে দৌড়ুতে

লাগল।

পরদিন সকালে।

নিজের শয্যাপ্রান্তে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন ড. কাসেম আল-রাজী। জানালার ভিতর দিয়ে তাঁর ভয়ার্ত বিভ্রান্ত দৃষ্টি দূর আকাশের দিকে প্রসারিত। কিন্তু আজ তিনি দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে চেতনাহীন। গতরাতে এক ভয়ঙ্কর, অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ঘটেছে তাঁর। শঙ্কায় ও বিস্ময়ে সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাই ভাবছিলেন তিনি।

গত পঁচিশ বছর ধরে ড. রাজী হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে জড়িত। সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক ড. লোকমান হাকিমের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। ভদ্রলোক এই সেন্টার স্থাপনের সময়েই তাঁকে সহকারী করে নেন।

ড. হাকিম ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভা। দেশীয় উদ্ভিদ থেকে মৌলিক ওষুধ আবিষ্কারই ছিল এই রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের বিঘোষিত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য তাঁরা সাফল্যের সাথেই অনুসরণ করে এসেছেন এতদিন। গোড়ার দিকে সেন্টারটা ছিল ছোট। এখন তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। একতলা ভবন দ্বিতল হয়েছে। স্টাফ বেড়েছে। ফরমায়েশ বেড়েছে। দেশে-বিদেশে খ্যাতি হয়েছে। ভেষজ শিল্পে হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার একটা বিশিষ্ট নাম। কিন্তু বিঘোষিত লক্ষ্য ছাড়াও রিসার্চ সেন্টারে একটা গোপন গবেষণা তিনি এবং ড. হাকিম গোড়া থেকেই চালিয়ে আসছিলেন এবং সেটা করা হত আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে। শুধু তাঁরা দু'জনই নয়, সেলিম আতহার, পারভেজ ইমাম ও রুহুল করিম নামে তিনজন সহকারীও তাঁদের আছে ঐ গোপন গবেষণাগারের জন্যে। পঁচিশ বছর ধরে একনাগাড়ে গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। মাত্র চারমাস আগে সাফল্য এসেছে এবং তার একমাস পরেই এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ড. লোকমান হাকিম। তাঁর মৃত্যুতে কাজের হয়ত অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারত কিন্তু পারভেজ ইমাম ড. হাকিমের চাইতেও প্রতিভাধর বিজ্ঞানী বলে ক্ষতিটা পূরণ হয়েই শুধু যায়নি বরং আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে তাঁদের গবেষণার পরবর্তী পর্যায়।

তাঁদের এই গবেষণা চলত প্রধানত রাতে। দিনে তাঁরা সেন্টারের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা আগে নিয়মিত রাতে কাজ করতেন কিন্তু মূল গবেষণায় সাফল্য এসেছে বলে কাজের তাড়াটা এখন অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং নিয়মিত রাতে কাজ করার দরকার হয় না।

গতরাতেও তাঁর যাবার কথা ছিল না। পারভেজ ও সেলিম আতহার গত কয়েক দিন ধরে কি এক অজ্ঞাত কারণে চিন্তিত। বাকি থাকে রুহুল করিম। কিন্তু সে তো ইঞ্জিনিয়ার আসলে। সুতরাং তিনি গতরাতে ল্যাবরেটরিতে যাবেন না বলেই ঠিক করেছিলেন।

কয়েকদিন ধরে তিনি নিজেও কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছিলেন। মাসখানেক আগে আমেরিকান এক ভদ্রলোক তাঁকে এমন কতকগুলো রহস্যজনক প্রশ্ন করে গেছেন এবং এমন কতকগুলো খবর নিয়ে গেছেন যার পর থেকে তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের উপর যেন শীঘ্রই একটা বিপদ নেমে আসছে। মনটা অস্বস্তিতে ভরে ছিল তাঁর। যুক্তি দিয়ে তিনি সেটাকে দূর করতে পারছিলেন না।

কাল সন্ধ্যায় বাসায় বসে পড়তে পড়তে সেই আশঙ্কাটাই তাঁর মনটাকে অশান্ত করে তুলেছিল। জোর করে মনটাকে উদ্বেগমুক্ত করে তিনি ঘুমোতে গিয়েছিলেন। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। কাপড়-চোপড় পরে তিনি নিশির ডাকে পাওয়া লোকের মত রিসার্চ সেন্টারে চলে গেলেন।

পাহারায় মোতায়েন ছিল পেশোয়ারী তরুণ তারিক খাঁ। গেটের কাছে গাড়ি থামাতেই অবাক হয়েছিলেন তিনি নীল রং-এর একটা ভক্সল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সেখানে অতরাতে ভক্সলে করে কে আসতে পারে তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। গাড়িটা ভাল করে দেখে তিনি একটু চিন্তিত মনেই গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারিক খাঁ তখন গেটে ছিল না। বোধহয় ভিতরে রাউণ্ড দিতে বেরিয়েছিল। গেট সংলগ্ন বোতাম টিপলেন তিনি। দোতলায় সিকিউরিটি রুমে বৈদ্যুতিক ঘন্টা বেজে উঠল। রিসার্চ সেন্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চমৎকার। নাইটগার্ড ছাড়াও একজন সিকিউরিটি গার্ড থাকে দোতলায় সিকিউরিটি রুমে। তার প্রধান কাজ হল একটা ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন সেটের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা। আর নাইটগার্ড রাউণ্ডে বেরোলে যদি ড. রাজী বা তাঁর তিন প্রধান সহকারী ঢুকতে বা বেরোতে চায় তাহলে গেট খুলে দেওয়া।

ড. রাজী আশা করছিলেন, সিকিউরিটি গার্ড এসে গেট খুলে দেবে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু নাইটগার্ড বা সিকিউরিটি গার্ড দু'জনের একজনেরও পাত্তা নেই। বারবার ঘন্টা টিপতে লাগলেন তিনি। কিন্তু কেউ না আসায় তাঁর বিরক্তি ক্রমশ ক্রোধে রূপান্তরিত হল। আবার একটু উদ্বিগ্নও হলেন তিনি। রিসার্চ সেন্টারের ভিতরে কোন গোলমাল হয়নি তো? তাঁর আশঙ্কাটাই কি শেষ পর্যন্ত সত্য হল?

গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরের দিকে তাকালেন তিনি। ভিতরে উজ্জ্বল আলোয় বাগানটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কারও আসবার তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কি? তিনি কি অপেক্ষা করবেন, না ফিরে যাবেন?

হঠাৎ তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর পিছনে চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। মুখ ফেরালেন তিনি। বিশাল একটা মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পিছনে। তিনি ভয়ে আর্তনাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা বলিষ্ঠ থাবা তাঁর চোয়াল দুটো সাঁড়াশীর মত চেপে ধরল। টুঁ-শব্দটিও করতে পারলেন না তিনি। গেটের মাথার অতি উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় থাবার মালিককে এক নজর দেখে তিনি প্রচণ্ড ভয়ে চোখ

বুজলেন। তার সমস্ত দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল।

এখনও সেই ভয়ালদর্শন মূর্তিটা তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। বিশাল সেই মূর্তি। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অস্বাভাবিক। দৈত্যাকার চেহারা। অবয়বটা মানুষের মতই। মূর্তিটা একটু নিচু হয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে ছিল বলে আলোটা সরাসরি তার মুখের উপর পড়েনি। তবু অস্পষ্ট আলোয় তিনি দেখেছিলেন তার ভয়ালদর্শন রূপটা। বিরাট মুখটা মানুষের মতই, তবে রোমহীনবলে মনে হয়েছিল। মাথাতেও এতটুকু চুল দেখেননি তিনি। কি ভয়ঙ্কর আর কুৎসিত দেখাচ্ছিল তার টকটকে মুখ আর বুকটা! মনে হচ্ছিল, যেন গা থেকে চামড়া খসিয়ে নিয়েছে অথবা বলা যেতে পারে, আগুনের আঁচে মাংস যেন ঝলসে গেছে। বড় বড় গোলাকার চোখ দুটোতে যেন জিঘাংসার আগুন জ্বলছে। সবচেয়ে হিংস্র দেখাচ্ছিল তার দাঁতগুলো। চকচকে ছুরির মত দু'পাটি দাঁত। তার মধ্যে দিয়ে জিহ্বাটা বেরিয়ে এসেছে। ত্রিকোণাকৃতি থ্যাবড়া-নাকটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠছে। নিঃশ্বাসটাকেও যেন আগুনের হলকার মত মনে হচ্ছিল তাঁর। যতক্ষণ চোখ তাঁর খোলা ছিল, মনে হয়েছিল সেই করালদর্শন জীবটা মৃত্যুর মত দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ড. রাজীর চোয়ালে চাপটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, চোয়াল দুটো এই মুহূর্তেই ভেঙে যাবে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছিলেন। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেলেন সকালে। ধীরে ধীরে চোখ মেললেন এবং অবাক হয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর নিজের শয়নকক্ষে নিজের শয্যাতেই শুয়ে আছেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। না কোন সন্দেহ নেই। বিহ্বল হয়ে বসে রইলেন শয্যাপ্রান্তে। কোথায় কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে, কি যেন ঘটেছে, ঠিক স্মরণে আসছে না।

আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ল তাঁর। রিসার্চ সেন্টারে গিয়েছিলেন তিনি গতরাতে। তারিক খাঁকে গেটে দেখতে পাননি। তারপর…।

ভয়ে চোখ বুজলেন তিনি। দিনের আলোতেও তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল আর একবার। রিসার্চ সেন্টারের সামনে সাক্ষাৎ ঘটেছিল এক ভয়ালদর্শন দানবের সাথে। কি ভয়ঙ্কর তার চেহারাটা! কল্পনাতীত বীভৎস সেই মূর্তি। তিনি কি স্বপ্ন দেখছিলেন? ওটা কি দুঃস্বপ্ন অথবা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা? না, তা নয়। এখনও তাঁর চোয়াল ব্যথা করছে। কি প্রচণ্ড শক্তিতে সেই বিকট প্রাণীটা তাঁর চোয়াল চেপে ধরেছিল! কিন্তু কে বা কি ঐ কদাকার দৈত্যাকার মূর্তিটা? অমন বিশাল আকারের মানুষের আকৃতির কোন প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে তিনি জানেন না। ওটা গরিলা নয়, শিম্পাঞ্জীও নয়। তাহলে কি গ্রহান্তরের কোন প্রাণী? নিজেরই হাসি পেল এই অদ্ভুত কল্পনাতে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ওটা মানুষ। নিয়াণ্ডারথাল মানুষ নয়, হোমোসেপিয়েন। কিন্তু হোমোসেপিয়েন আকারে কেমন করে অতটা বিশাল হবে? চেহারা অবশ্য কদাকার হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ঐ মূর্তিটা কেন

এসেছিল রিসার্চ সেন্টারের গেটে? ভিতরে ঢোকবার জন্যে? উদ্দেশ্যটা আসলে কি? নীল রংয়ের ভক্সলটাই বা কার? ওটাই বা কেন অতরাতে রিসার্চ সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল? তাঁর কোন সহকারীর বা সেন্টারের আর কারও গাড়ি ওটা নয়, তা তিনি জানেন।

...বাসায় ফিরিয়ে আনল তাঁকে কে? হাজারোটা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় জমাল। কোনটারই সদুত্তর পেলেন না। একটা জটিল আবর্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলেন তিনি। একটা সন্দেহ তাঁর মনে উঁকি দিতে লাগল বারবার।

ড. রাজীর সংসারটা অতি ক্ষুদ্র। বন্ধন বলতে একটি মাত্র কন্যা-সন্তান। স্ত্রী বহুদিন হল জান্নাতবাসিনী। অন্তঃহীন স্নেহে মেয়ে রাকুকে ড. রাজী লালন-পালন করেছেন এবং সে তাঁর অতি গর্বের ধন। রাকু অর্থাৎ রোকেয়া মিউনিক ইউনিভার্সিটি থেকে জেনেটিকস-এ ডক্টরেট পেয়েছে। দেশে ফেরার আগে কন্টিনেন্ট সফর করছে। যে-কোন দিন ফিরে আসতে পারে। আপাতত বাবুর্চি মইনুল ও মধ্যবয়সী পুরানো চাকর জাকেরকে নিয়েই তাঁর সংসার। রাতে কি করে তিনি বাসায় ফিরে এলেন সে রহস্য হয়ত তাদের জানা আছে।

জাকেরকে ডাক দেবেন বলে ঠিক করলেন ড. রাজী। কিন্তু দরকার হল না। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'হুজুর?'

'জাকের?'

'জ্বে। আপনার নাস্তা তৈরি।'

'এদিকে শুনে যা।'

পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল জাকের। ড. রাজীকে বাইরে বেরোবার পোশাকে মায় জুতো পরিহিত অবস্থা দেখেও সে বিচলিত হল না। উনি যে রাতে রিসার্চ সেন্টারে কাজ করেন এবং অনেক সময় একদম সকাল করে বাসায় ফেরেন, তা সে জানে।

'এক কাপ চা দিয়ে যা।'

একটু অবাক হল জাকের। এটা একটা নতুন ঘটনা। বেড-টির অভ্যাস ড. রাজীর কোনদিনই ছিল না।

'হুজুর।'

ব্যাপারটা নতুন বলে যে জাকের অবাক হচ্ছে তা বুঝতে পারলেন ড. রাজী। তিনি বললেন, 'শরীরটা ভাল লাগছে না। চা নিয়ে আয়। দেখি, যদি ভাল লাগে।'

'আচ্ছা,' বেরিয়ে গেল জাকের।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ড. রাজী। রাতের ভয়াবহ ঘটনাগুলো আবার চিন্তা করতে লাগলেন। এতক্ষণে তিনি এটা বুঝতে পেরেছেন যে, কিভাবে রাতে তিনি ফিরেছেন জাকেরও তা জানে না। মইনুলও নয়। তাহলে তিনি কেমন করে এলেন?

টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ড. রাজী জানালা ছেড়ে এসে রিসিভারটা তুললেন, 'হ্যালো? রাজী বলছি।'

ওদিক থেকে কম্পিত কণ্ঠ কানে এল, 'ছ্যার, ছিকিউরিটি গার্ড হাতেম আলী বলছি। এদিকে ছর্বনাছ হয়ে গেছে, ছ্যার!'

'কি হয়েছে?'

'তারিক খাঁ মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' চরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন ড. রাজী।

'হ্যাঁ, ছ্যার, বাগানের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ছারা গায়ে রক্ত,' কম্পিত কণ্ঠে হাতেম আলী জানাল।

'রক্ত! সর্বনাশ!' চমকে উঠলেন ড. রাজী।

'হ্যাঁ, ছ্যার। ঘাছ পর্যন্ত ভিজে গেছে।'

'মানে…খু-উ-ন হয়েছে তারিক খাঁ?' উত্তেজনায় তোতলাতে লাগলেন ড. রাজী।

'তাই তো মনে হচ্ছে, ছ্যার। আরও ছ্যার, অবাক কাণ্ড ঘটেছে।'

'কি?'

'গেটের ছ্যার, ঐকটা ছিক বাঁকানো। আর তালাটা ভেঙে পড়ে আছে গেটের ভিতরে!'

'পুলিসে খবর দিয়েছ?'

'এখনও দেইনি, ছ্যার। আমি তো এইমাত্র দেখলুম।'

'রাতে কিছুই টের পাওনি তুমি?'

'না, ছ্যার।'

'ঘুমিয়েছিলে বোধহয়?'

কোন জবাব শোনা গেল না।

'হ্যালো?'

'জ্বি, ছ্যার।'

'জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ছ্যার। ছরীরটা ভাল ছিল না। একটু জ্বর-জ্বর এছেছিল কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি। এই একটু আগে ঘুম ভেঙেছে। নিচে নেমে দেখি এই অবছ্থা।'

'যাক, পুলিসে খবর দাও। আর, আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি। পুলিস আসবার আগে দারোয়ান ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দিয়ো না।'

'আচ্ছা, ছ্যার।'

রিসিভার রেখে দিলেন ড. রাজী।

আধঘন্টা পরে তিনি রিসার্চ সেন্টারের দিকে রওয়ানা দিলেন। গতরাতের কথাই ভাবছিলেন গাড়ি চালাতে চালাতে, আর যতই ভাবছিলেন ততই তাঁর মনে হচ্ছিল, রিসার্চ সেন্টারে ভেষজের গবেষণার আড়ালে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা

অতি সঙ্গোপনে যে মৌলিক ও যুগান্তকারী গবেষণা চালিয়ে সম্প্রতি সাফল্য অর্জন করেছেন, যেভাবেই হোক তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা ফাঁস হয়ে গেছে এবং যারা রিসার্চ সেন্টারে এই ভয়াবহ কাণ্ড গতরাতে ঘটিয়েছে ঐ গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে সন্ধান লাভই ছিল তাদের লক্ষ্য। সেন্টারের কর্মচারীদের ধারণা যে, তাঁরা চারজন রিসার্চ করেন তাঁর নিজস্ব চেম্বারে। আসলে তাঁর চেম্বারটা হল ভূ-গর্ভস্থ গবেষণাগারের প্রবেশ পথ। ঐ কক্ষটার দেয়ালে যে বিরাট একটা আয়রন সেফ আছে, সেটা হচ্ছে একটা লিফট। সেটা নিচে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড গবেষণাগারে চলে গেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছেন ঐ আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে। তার ফলাফল জানাজানি হলে বিশ্বব্যাপী তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কারণ আণবিক বোমা আবিষ্কার বা মানুষের চাঁদে অবতরণের চাইতে তাঁদের সাফল্য এতটুকু তুচ্ছ নয়। এই আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির ইতিহাস পর্যন্ত পাল্টে যেতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি আছে মারাত্মক। তাঁদের আবিষ্কার মানুষের যেমন পরম কল্যাণ সাধন করতে পারে তেমনি সামান্য ভুল হলে অথবা কোন অবিবেচক অপরাধীর হাতে পড়লে মানবজাতি নিশ্চিহ্নও হয়ে যেতে পারে অথবা নিশ্চিহ্ন না হলেও পৃথিবীটা একটা নরকে পরিণত হতে পারে। আবিষ্কারের সেই অকল্যাণকর দিকটা যতদিন তাঁরা দূর করতে না পারবেন ততদিন তাঁরা তা প্রকাশ করতে চান না। ড. লোকমান হাকিম বারবার তাঁর এবং তাঁর সহকারীদের প্রতি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে গিয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মানুষের অমঙ্গল হয় এমন কিছু তাঁরা করবেন না। তাছাড়া ড. রাজী জানেন এবং ড. হাকিমও জানতেন যে, এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ পেলে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের তালিকায় তাঁদের নাম যুক্ত হবে।

ড. হাকিম ছিলেন দূরদর্শী লোক। তাঁদের আবিষ্কারের ফলাফল জানবার জন্য যে চেষ্টা হতে পারে তিনি সে পূর্বাভাসও দিয়ে গেছেন এবং সেই জন্যেই তিনি ড. রাজীর রুমের প্রবেশ পথে সিকিউরিটির ব্যবস্থাও করে গেছেন। ড. হাকিমের সতর্কবাণী আজ তাঁর বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

ড. রাজী নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ঐ দৈত্যাকার প্রাণীটির রহস্যটা কি? আপাতত কোন মানবীয় যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে তিনি তো এ নৈসর্গিক ঘটনাটার ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। ওটা তো অশরীরী আত্মা নয়, তাঁর উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, মানসিক বিকার বা বিভ্রম নয়, হ্যাল্যুসিনেশনও নয়। তাঁর অস্তিত্বের মতই ওটাও সত্য।

তিনি জানেন, পুলিসকে এসব বলে কোন ফায়দা হবে না। পুলিস তাঁকে বিশ্বাস করবে না। বরং তাঁকে হয়ত উন্মাদ বলে মনে করবে। সেটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। তিনি যদি নিজের চোখে মূর্তিটাকে না দেখতেন তাহলে অতি বিশ্বাসভাজন লোকের কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনিও ব্যাপারটাকে

মানসিক বিকারজনিত কল্পনার ফল বলে মনে করতেন।

ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান তাঁর বন্ধু মি. সিম্পসন এখন এখানে থাকলে ভাল হত। ড. রাজী তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারতেন। কিন্তু চিকিৎসার জন্যে ভদ্রলোক জুরিখ গিয়েছেন। কবে ফিরবেন, কে জানে। পুলিসের বড়কর্তাদের আর কারও সঙ্গে তাঁর জানাশোনা নেই।

চার

রিসার্চ সেন্টারে জনসমাগম শুরু হয়েছে। কর্মচারীরাও দু'একজন করে আসছে। সকাল থেকে দারোয়ান মোসলেম বিশ্বাসের ডিউটি। সে এসে গেটের দায়িত্ব নিয়েছে। কিছু মাল ডেলিভারী দেবার কথা ছিল সকালে। তা নেবার জন্যে ট্রাক এসেছে। ইনডেন্টার আলী সাহেবও এসেছেন।

কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। গেটের বাইরে ছোট ছোট দলে জটলা পাকাচ্ছে তারা। উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, গুজবের ফানুসটাও ক্রমেই স্ফীততর হচ্ছে।

পারভেজ ও সেলিম আতহার এসে পৌঁছুল। সেলিমের গাড়ি সার্ভিসিং-এ গেছে। পারভেজ সেন্টারে আসবার পথে ওকে নিয়ে এসেছে। গেটের বাইরে জটলা দেখে ওরা অবাক হল। পারভেজ গাড়ি পার্ক করে বন্ধ গেটের দিকে তাকিয়ে কাছেই দাঁড়ানো একজন পরিচিত কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি সাদউদ্দিন সাহেব, আপনারা সব বাইরে দাঁড়িয়ে, দারোয়ান নেই গেটে?'

ঘটনাটা সবিনয়ে প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক।

অবাক হয়ে শুনল পারভেজ ও সেলিম। তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। সেলিম বিড়বিড় করে কি যেন বলল।

অন্য একজন কর্মচারী বলল, 'গেটটাও নাকি খোলা ছিল। গেটের বিরাট মজবুত তালাটা নাকি, স্যার, মুচড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে।'

'বলেন কি!' বিস্ময় চরমে উঠল সেলিমের, 'ও তালা ভাঙার মত শক্তি তো মানুষের নেই!'

'শুধু কি তাই স্যার, গেটের অমন ইস্পাতের মজবুত শিকও অনেকটা বাঁকিয়ে ফেলেছে,' চোখ দুটো বড় বড় করে সাদউদ্দিন সাহেব জানালেন।

'কি ভয়ানক ব্যাপার!' পারভেজ বলল।

'এ যে ভূতের খেলা শুরু হল রে। চল তো দেখে আসি। আপনাদের বোধহয় ঢুকতে দিচ্ছে না?' কণ্ঠে তার উদ্বেগের ছাপ।

'ডিরেক্টর সাহেব কাউকে ঢুকতে দিতে নিষেধ করেছেন। তবে আপনারা স্যার, ঢুকতে পারেন,' পারভেজ ও সেলিমকে দেখে দারোয়ান বলল।

কিন্তু ওরা ঢুকল না। গেটটা দেখতে লাগল দু'জন।

কর্মচারীটি মিথ্যা বলেনি। গেটের ডাইনের পাল্লাটার দ্বিতীয় শিকটা বেশ কিছুটা বাঁকানো। যেটুকু ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে তা দিয়ে অনায়াসে পাঁচ-ছয় বছরের একটা শিশুকে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শিকটার পাশেই তালা ঝোলাবার আংটা। বোধহয় বাইরে থেকে হাত ঢুকিয়ে তালাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

সেলিম সবিস্ময়ে বলল, 'দেখেছিস কি ভয়ানক কাণ্ড?'

পারভেজ নীরবে মাথা নাড়ল।

দারোয়ান মোসলেম বিশ্বাস ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'আমার মনে হয়, কাজটা মানুষ করেনি, স্যার।'

'ঠিক ধরেছ, করেছে ভূতে। তবে তোমার-আমার মত রক্ত-মাংসের ভূত সে,' বিরক্তি প্রকাশ করল পারভেজ।

মোসলেম বিশ্বাস সাহেবদের সামনে আর যুক্তিতর্ক করার সাহস পেল না। সে বলল, 'স্যার, আপনারা কি ভিতরে ঢুকবেন?'

'না, থাক। সবাই বাইরে রয়েছেন, আমাদের সে ক্ষেত্রে ভিতরে যাওয়া উচিত নয়। হয়ত এমন কিছু করে ফেলতে পারি যাতে সাক্ষ্য-প্রমাণ নষ্ট হবে,' সেলিম জবাব দিল।

পারভেজ বলল, 'ঠিক বলেছিস।'

দু'জন একপাশে সরে গেল।

ক্ষোভ প্রকাশ করে সেলিম বলল, 'কিরে, ব্যাপারটা তাহলে এই পর্যন্ত গড়াল? তখনই বলেছিলাম, ড. রাজীকে বলা দরকার। তুই রাজি হলি নে, বেচারা তারিক খাঁ বিনা দোষে প্রাণে মারা গেল। আমরা তো খোঁজখবর নিতে গিয়ে কিছুই করতে পারলাম না। মাঝখানে এই কাণ্ড ঘটে গেল।'

পারভেজ জবাব দিল না। কি যেন ভাবতে লাগল সে।

আলী সাহেব কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি সেলিম ও পারভেজকে দেখে এগিয়ে এলেন।

'এই যে আলী সাহেব, কি খবর?' সেলিম প্রশ্ন করল।

'আর খবর। সে তো এখানে এসেই শুনতে পেলাম। আর এক খবর শুনেছেন আপনারা? মেহার-পাড়ার এক ভদ্রলোক বলছিলেন, কে নাকি গতরাতে এখানেই এক ঝোপের মধ্যে রাক্ষসের মত বিরাট একটা মানুষ দেখেছে।'

সেলিম প্রশ্ন করল, 'জেগে, না ঘুমিয়ে?'

প্রশ্নটা শুনে হাসলেন আলী সাহেব। তিনি বললেন, 'আপনি তো সাহেব উড়িয়েই দিলেন; কিন্তু তালা ভাঙা, শিক বাঁকানো, যা সব শুনছি তাতে বলুন তো সাহেব একেবারে উড়িয়ে দিই কি করে? অবশ্য যেমনটা বলেছে হয়ত সত্যি নয়। খবরটাও ভদ্রলোকের কানে একটু পল্লবিত হয়েই এসেছে। যতদূর মনে হয়, লম্বা-চওড়া কোন লোককে দেখেছে কেউ। তারপর এই সব খবর শুনে এটা-ওটা মিলিয়ে বেশ পরিবেশনযোগ্য করে তুলছে ব্যাপারটা।'

পারভেজ আলী সাহেবের লম্বা-চওড়া সৌষ্ঠবময় স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে তরলকণ্ঠে বলল, 'তাহলে মনে হচ্ছে আপনাকেই দেখেছে কেউ।'

'তা মশাই ইচ্ছে করলে রাতের বেলা দু'চারজনের চোখ ছানাবড়া করতে পারি বটে,' আলী সাহেব হাসতে হাসতে বললেন।

সেলিম পথের দিকে চেয়েছিল। একটা পুলিসের গাড়ি এসে থামল। ঠিক তার পিছনে এল ড. রাজীর গাড়ি। পুলিসের গাড়ি থেকে নামলেন সমসের দারোগা। ভদ্রলোককে সেলিম চেনে। প্রশস্ত টাক ও নধর কান্তি এ তল্লাটে তাঁর সুনাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

পরিচয় শেষে ড. রাজী সমসের দারোগাকে নিয়ে রিসার্চ সেন্টারে ঢুকলেন। দারোয়ান ওঁদেরকে অকুস্থলে নিয়ে গেল। তার আগে তিনি বাঁকানো শিকটা দেখলেন এবং একটা রুমালের মধ্যে আলগোছে ভাঙা তালাটা তুলে একজন কনস্টেবলের হাতে সঁপে দিলেন।

কসমস ফুলের বেডের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে নিস্পন্দ দেহটা। গায়ের খাকী জামাটার রক্ত শুকিয়ে গিয়ে কালচে রং ধারণ করেছে। বুকের কাছে মাটিতেও রক্তের দাগ। বাঁ হাতটা গায়ের তলে। কোনাকুনি করে কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত গুলির বেল্ট। বন্দুকটা পড়ে আছে কয়েক হাত দূরে। ঝাঁকড়া চুলে মুখটা আচ্ছন্ন। তবু চেনা যায় তারিক খাঁকে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ। সেলিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সমসের দারোগা বললেন, 'দেখবার কিছু নেই। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা লাশটা ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দিতে চাই।'

'না না, আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। এটা হচ্ছে মার্ডার কেস। অপরাধী যাতে ধরা পড়ে তার জন্যে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।'

সেলিম একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'পিঠে জামাতে একটা ফুটোর মত দেখা যাচ্ছে না? রক্ত ঐ জায়গাতে সবচেয়ে বেশি জমাট বেঁধেছে।'

সমসের দারোগা বলল, 'ছোরা মেরেছে বলে মনে হয়, গুলি করাটাও অসম্ভব নয়। কেউ আওয়াজ-টাওয়াজ শুনেছে নাকি?'

'সেরকম তো কারও কাছে শুনিনি এখন পর্যন্ত,' ড. রাজী বললেন। 'হাতেম আলী তো সারারাত ঘুমিয়েই কাটিয়েছে।'

'হাতেম আলী আবার কে?' সমসের দারোগা প্রশ্ন করলেন।

'সিকিউরিটি গার্ড।'

'সে-ও কি রাতে ছিল নাকি রিসার্চ সেন্টারের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। রাতে দু'জন লোক থাকে। একজন থাকে গেটে, আর একজন থাকে সিকিউরিটি রুমে,' সিঁড়ির পূর্বদিকের দোতলার কক্ষটা দেখিয়ে বললেন ড. রাজী। 'তার কাজ অবশ্য শুধু সি. সি. টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা।'

'সেটা আবার কেন?'

'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। চলুন, রিসেপশন রুমে গিয়ে বসা যাক,' সেলিম প্রস্তাব করল।

'সেই ভাল,' পারভেজ বলল।

রিসেপশন রুমে গিয়ে বসল সবাই। সমসের দারোগা লাশটা সরাবার জন্য কনস্টেবলদেরকে নির্দেশ দিলেন। কর্মচারীদের ঢুকতে দেবারও অনুমতি দিলেন।

সি. সি. টিভির ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন ড. রাজী। তিনি জানালেন যে, তাঁর নিজের চেম্বারটায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল থাকে বলে তাঁর দরজার দিকে মুখ করে সি. সি. টিভির ক্যামেরা ফিট করা আছে এবং সিকিউরিটি গার্ডের কাজ হল, টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা।

দারোগা তাঁর ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'সারা দিন-রাতই সিনেমার ব্যবস্থা আছে তাহলে?'

'না। রাত দশটা থেকে ও ব্যবস্থা। সেকেণ্ড শো বলতে পারেন,' সেলিম বলল।

'কি যেন গার্ডের নামটা?'

'হাতেম আলী।'

'হ্যাঁ, হাতেম আলী। তাকে ডাকুন একবার।'

হাতেম আলী এল। ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল। সমসের দারোগা ভ্রূকুটি করলেন তার দিকে।

'তোমার নাম হাতেম আলী?'

'জ্বি, দারোগা ছাব।'

'তা, খুনটা কে করল?'

হাতেম আলীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'জানি না, ছ্যার।'

'বল কি হে? বলতে গেলে তোমার নাকের ডগায় এমন একটা কাণ্ড ঘটল···?'

একটা ধমক দিলেন তিনি হাতেম আলীকে। কিন্তু হাতেম আলী কিছু বলতে পারল না। তার কাছ থেকে জানা গেল যে, সে রাত দশটায় এসেছিল ডিউটিতে। তারিক খাঁর সাথে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করেছিল। তারপর সে রাউণ্ডে যাওয়ার পর হাতেম আলী সিকিউরিটি রুমে যায়। টেলিভিশন সেটটা ডিস্টার্ব করছিল খুব। সেটা সে অ্যাডজাস্ট করে একটা বই নিয়ে ক্যাম্প-খাটের উপর শুয়ে পড়ে।

'দরজা খুলে, না বন্ধ রেখে?'

'দরজা বন্ধ করেই ছুয়ে ছিলাম, ছ্যার।'

'তারপর?'

'তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলতে পারুম না। ছকাল ছ'টায় ঘুম ভেঙে গেল দরজা ধাক্কাধাক্কিতে। দরজা খুলতেই মোছলেম আমাকে ঘটনাটা জানাল। আমি ডিরেক্টার ছাহেবের বাছায় তক্ষুণি খবর দিলাম। থানায় ফোন করলাম।'

'হুঁম' জাতীয় একটা শব্দ করে সমসের দারোগা হাতেম আলীকে বিদায় দিয়ে মোসলেম বিশ্বাসকে পাঠিয়ে দেবার হুকুম দিলেন।

হাতেম আলী বেরিয়ে গেল।

দারোগা বললেন, 'কি কি খোয়া গেছে তার কোন লিস্ট তৈরি করেছেন নাকি, ডক্টর সাহেব? না, আমিই তৈরি করে নেব?'

'খোয়া গেছে? তাই তো, এ-ব্যাপারটা আমি ভেবেও দেখিনি।'

'বলেন কি, স্যার। এটা যে ডাকাতি কেস, বুঝতে পারছেন না?'

'ডাকাতি কেস!' সেলিম চোখ দুটো কপালে তুলল।

সমঝদারের মত মাথা নেড়ে দারোগা বললেন, 'প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম, হাতেম আলীর সাথে তারিক খাঁর বোধহয় ঝগড়া-ঝাটি ছিল। হাতেম আলীই কাণ্ডটা করেছে। কিন্তু খুন করে কেউ অমন ভাবে ঘুমোতে পারে না, বুঝলেন তো? হেঃ হেঃ অনেক দিনের অভিজ্ঞতা কিনা পুলিস বিভাগে...।'

'তা তো বটেই,' সেলিম সায় দিল।

'তাহলে বাইরের লোক। তা অকারণে তারা তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকবে না। নিশ্চয়ই ডাকাতি করতে এসেছিল।

'তা তো নিশ্চয়ই,' সেলিম স্বীকার করতে বাধ্য হল।

'সাধারণ চোর ছ্যাঁচোড়ও নয়।'

'নিঃসন্দেহে।'

'তাই তো বলছি, কি কি খোয়া গেছে তা জানতে পারলেই ব্যাটাদের ঠিক ধরে দিতে পারতাম। এই যে, তোমার নাম বুঝি...কি যেন?'

মোসলেম বিশ্বাসকে ঢুকতে দেখেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

'মোসলেম বিশ্বাস।'

'এসেছ কখন? ক'টা থেকে ডিউটি?'

'সকাল ছ'টা।'

'তুমিই বুঝি গেট খোলা দেখেছ?'

'হ্যাঁ, একেবারে হাট করে খোলা ছিল। ঢুকে তারিক খাঁর খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, বাগানের মধ্যে তারিক খাঁর লাশ পড়ে আছে।'

'কিছু খোয়া গেছে বলে জান?'

'কিছুই খোয়া যায়নি, স্যার। সবক'টা রুমেই তালা দেওয়া ছিল। এখন খুলে দিয়ে এলাম।'

'আচ্ছা, যাও তুমি।'

বেরিয়ে গেল মোসলেম বিশ্বাস।

'আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন, ডক্টর সাহেব?'

ড. রাজী বললেন, 'কথা ছিল না, তবু আমি এসেছিলাম রাত একটায়। একটা ভক্সল গাড়ি দেখেছিলাম গেটের সামনে। একটু অবাক হয়েছিলাম অত রাতে ওখানে গাড়িটাকে দেখে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু হাতেম আলী বা

তারিক খাঁ সাড়া না দেওয়ায় আমি ফিরে যাই। তাতে মনে হয়, হাতেম আলীর ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারটা মিথ্যে না-ও হতে পারে। কিন্তু তারিক খাঁর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারিনি।' ড. রাজী তাঁর নিজস্ব অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা চেপে গেলেন একেবারে। সমসের দারোগা হয়ত তাকে টিটকারি দেবে।

সেলিম ও পারভেজ ড. রাজীর কথা শুনে অবাক হল। পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। ওরা দু'জনে জানত, ড. রাজীর গতরাতে রিসার্চ সেন্টারে আসার কথা ছিল না। তাদেরকেও আসতে নিষেধ করেছিলেন তিনি।

'গেট তখন বন্ধ ছিল কিনা তা ভাল করে দেখেছিলেন?'

ড. রাজী বললেন, 'সত্যি কথা বলতে গেলে আমি তা খেয়ালই করিনি। গেট রাতে সব সময়ই বন্ধ থাকার কথা। দারোয়ান গেটে না থাকলে তো কথাই নেই। তারিক খাঁকে না দেখেই আমি ধরে নিয়েছিলাম গেট বন্ধ আছে।'

'আপনি অনেকক্ষণ ঘন্টা বাজানোর পরও যখন তারিক খাঁ বা হাতেম আলীর দেখা পেলেন না তখন আপনার মনে খটকা লাগেনি?'

'তা অবশ্য লেগেছিল। কিন্তু তখন আমার করবার কি ছিল? ভেবেছিলাম, আজ জিজ্ঞেস করব।'

সমসের দারোগা সেলিম ও পারভেজকে জিজ্ঞেস করলেন তারা কোন আলোকপাত করতে পারে কিনা। কিন্তু তারা অক্ষমতা প্রকাশ করল।

সমসের দারোগা উঠে দাঁড়ালেন।

সেলিম জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা খুব জটিল বলে মনে হচ্ছে না?'

সমসের দারোগা বললেন, 'জটিল মানে···কি যে বলেন! ওষুধ চুরি করতে, মানে ডাকাতি করতে এসেছিল। খুনোখুনি করেই সরে পড়েছে। শীঘ্রই একটা কিনারা করে ফেলব অবশ্য।'

'আপনিই তো আমাদের আশা-ভরসা।'

'হেঃ হেঃ, কি যে বলেন। কি যে বলেন,' প্রশংসায় গলে গেলেন দারোগা।

ড. রাজী এতক্ষণ চাঞ্চল্য গোপন রেখেছিলেন। এক্ষুণি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিটা দেখা দরকার। সেখানে কোন গোলমাল হয়েছে কিনা তা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁর। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সেলিম ও পারভেজকে কয়েকটি কাজের দায়িত্ব দিয়ে তিনি তাঁর চেম্বারের দিকে এগোলেন।

ইতিমধ্যে গেট খুলে দেয়া হয়েছে। কর্মচারীরা সবাই ঢুকে পড়েছে। কর্মমুখর হয়ে উঠেছে রিসার্চ সেন্টার। তারিক খাঁর মৃত্যু সম্পর্কে হাজারোটা জল্পনা-কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে কাজ চলছে। ডা. রাজী আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির অবস্থা দেখতে চলেছেন। এই মুহূর্তে তিনি একাই যেতে চান সেখানে। কারণ গোপনতার মধ্যেও গোপনতা আছে। তাঁদের আবিষ্কার সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্র ল্যাবরেটরির মধ্যেই এমন এক স্থানে লুকিয়ে রেখেছেন যা তাঁর প্রিয় সহকারীরা পর্যন্ত জানে না। যদি কোনদিনই যথার্থই ল্যাবরেটরির কোন ক্ষতি হয় তাহলে আবার এইসব

কাগজপত্রের ভিত্তিতে তা নতুন করে গড়ে তোলা যাবে। তাছাড়া আবিষ্কারটা এতই জটিল ও সূক্ষ্ম যে, কারও পক্ষে এ দুরূহ প্রসেস স্মরণ রাখা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং তা হারিয়ে গেলে পুনর্গঠন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। নতুন করে পরিশ্রম করতে হবে বছরের পর বছর। তাছাড়া ড. হাকিম আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির জন্যে যে জটিল প্ল্যান তৈরি করেছিলেন তার ডিজাইনও আছে ল্যাবরেটরির মধ্যে লুকানো। রুহুল করিম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন লোক ঐসব যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারবে না।

ড. রাজীর সহকারীরা শুধু যোগ্যই নয় তারা পরম বিশ্বাসী। বস্তুত তাঁর সহকারীরা তাঁর গর্বের বস্তু। বিশেষ করে পারভেজ তো ড. হাকিমের এক অমূল্য আবিষ্কার। মৌলিক চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা সে ইতিমধ্যেই সকলের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। কতই বা বয়স। পঁচিশ কি ছাব্বিশ। টকটকে গৌরবর্ণ, আশ্চর্য সুদর্শন ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। ভদ্র ও বিনয়ী। দোষের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত মদ খায়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, পেগের পর পেগ মদ খেয়েও সে কখনও ভারসাম্য হারায় না। গবেষণার কাজেও তার কোন অসুবিধা হয় না।

সেলিমের ব্যাপারটা অন্যরকম। পারভেজ যেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সেলিম তেমনি সর্বজনস্নেহধন্য। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সেলিমের সঙ্গে সকলেরই ভাই সম্পর্ক। হাসিঠাট্টা, রসিকতা আর হৈ-চৈ করে সবাইকে মাতিয়ে রাখে সে। সে যেন গবেষণাগারের নীরস পরিবেশে প্রাণরসের একমাত্র উৎস। ড. রাজী পারভেজের জন্যে গর্ববোধ করলেও টানটা সেলিমের দিকেই বেশি। সেলিমের চেহারাটা তেমন কিছু নয়। কালো, লম্বা, শুকনো। চোয়াল ভাঙা, বিদ্যাও তেমন নয়। এম. এস. সি-তে কষ্টে-সৃষ্টে তৃতীয় শ্রেণী পেয়েছিল। না আছে তার পাণ্ডিত্য না আছে মৌলিকতা। কিন্তু একটা অদ্ভুত গুণের জন্যে ড. হাকিম তাকে এই গবেষণাগারে স্থান দিয়েছিলেন। সে হল, কোথাও কোন সামান্যতম ভুল হলেও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই। ড. রাজী তাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন এই গুণটার জন্যেই এবং সেলিম কাছে না থাকলে কোন কাজেই তিনি এগোতে পারেন না।

রুহুল করিম রিসার্চের কাজে সাহায্য করতে পারে না। সে হল ইঞ্জিনিয়ার। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির অসংখ্য যন্ত্রপাতি তাকে দেখাশোনা করতে হয়। সে নিজেও ড. হাকিমের উদ্ভাবিত অনেক মেশিনকে উন্নত করেছে। নতুন নতুন মেশিনের ডিজাইন তৈরি করেছে। বোকা বোকা চেহারা। মেয়েলী কণ্ঠস্বর। কথা বলে খুব কম।

সেলিম বলে, রুহুলের নাকি দিনে একশ' শব্দের বেশি কথা বলা নিষেধ আছে। তার মধ্যে পঁচাত্তরটা মিসেস করিমের জন্যে নির্দিষ্ট। আর বাকিটা অন্যদের জন্যে।

পারভেজের ধারণা আলাদা। রুহুল ওর মেয়েলী কণ্ঠস্বরের জন্যেই কারও সাথে কথা বলতে চায় না। কিন্তু এসব ঠাট্টাতেও নীরব থাকে রুহুল করিম।

বোকার মত হাসে শুধু।

ওরা কয়েকজনই লোকমান হাকিমের আবিষ্কার। ওদের মধ্যে পারভেজই এসেছে সকলের শেষে। বছর দেড়েক আগে। সেলিম ও রুহুল এসেছে প্রায় চার বছর।

ড. হাকিম ভাল করেই চিনতেন ওদের। ড. রাজীও চেনেন। ওরা হচ্ছে খাঁটি সোনা। কিন্তু সোনার মধ্যে খাদ থাকতে পারে। কে জানে?

লিফট বেয়ে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে নামলেন। দরজা খুললেন লিফটের। মেঝেতে পা দিয়েই তাঁর মাথায় বজ্রপাত হল যেন। সমস্ত পৃথিবীটা কি টলছে? ভূমিকম্প হচ্ছে? না, হয়ে গেছে এর আগেই, অন্তত এই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির মধ্যে। শ্বাস রোধ করে লিফটের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আত্মসংবরণ করলেন তিনি। ভূমিকম্প হয়ে গেছে ল্যাবরেটরির মধ্যে। সমস্ত যন্ত্রপাতি কে যেন একেবারে ভেঙেচুরে তছনছ করে রেখে গেছে। সমস্ত রুম ভর্তি, এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাঁচ, লোহার টুকরো, বিভিন্ন মেশিনের ভাঙা অংশ। এসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের জার ভেঙে গিয়ে মেঝেটা ভিজে গেছে। তার মধ্যে দুটো নীল গিনিপিগ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

পাঁচটা অতি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপের চারটেই হামাগুড়ি দিচ্ছে মেঝেতে। একটার দণ্ড বাঁকানো অবস্থায় টেবিলের উপর পড়ে আছে। টেস্ট-টিউব ও কাঁচের জার একটাও অক্ষত আছে বলে মনে হয় না, র‍্যাকগুলোতে অন্তত একটাও দেখা যাচ্ছে না। ড. হাকিমের তৈরি জেনোমিটার, ইউজেনোমিটার, আল্ট্রাজেনোস্কোপ, ক্রমোসম টেস্টার ইত্যাদি বিরাট বিরাট মেশিনগুলোর অবস্থাও তথৈবচ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ড. রাজী। তাঁর চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি তা বলতে পারবেন না। সংবিৎ ফিরে আসতেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলেন।

কাঁচের ভাঙা টুকরোর মধ্যে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন ইউজেনোমিটারের দিকে। মিটারের কাঁটাগুলো স্থির হয়ে আছে। লাল, নীল আলোগুলো জ্বলছে না। নিচের একদিকে কাভার খোলা।

উঁকি মেরে দেখলেন, তারগুলো সব ছেঁড়া। রোলারগুলো বাঁকানো। ইউজেনোমিটার মেশিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার অবস্থাও তাই। ধীরে ধীরে তিনি ল্যাবরেটরির ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারটা চিত হয়ে পড়ে আছে ভেজা মেঝেতে। মেমরিসেলের কার্ডগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। বসবার টেবিলের কাছে গেলেন। সবক'টা ড্রয়ার খোলা। সেফটার পাল্লাও খোলা।

সেফের একটা ড্রয়ারের মধ্যে তিনি হাত চালিয়ে দিলেন। ভিতরের একটা বোতাম টিপলেন তিনি। তারপর চলে গেলেন ডার্করুমে। ডার্করুমে বাতি

জ্বলছিল। সেখানেও সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। এককোণে আবর্জনা ভর্তি একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। সেটা সরালেন। দেখা গেল নিচে ছোট একটা চতুষ্কোণ গর্ত। তার ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে মরচে ধরা একটা ছোট বাক্স বের করলেন তিনি। ঝাঁকুনি দিলেন বাক্সটা। ভিতরে কিছু একটা নড়ে উঠল। ছোট একটা নোট বই। চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল নোট বইটা। বাক্সটা মাটিতে রেখে নোট বইটা খুললেন। কয়েকটা পাতা উল্টোলেন। চরম দুঃখের মধ্যেও তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। না, আসল জিনিস খোয়া যায়নি। ভাল করে নোট বইটা পরীক্ষা করে সুটের বুক পকেটে তুলে রাখলেন।

সেই বিকট দর্শন মূর্তিটা কে? ঠিক কি উদ্দেশ্যে সে একা বা অন্য কারও সাথে এই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছিল, তিনি জানেন না। তবে তাঁর বিশ্বাস, এই নোট বইটাই ছিল তাদের মূল আকর্ষণ। তারা যত বুদ্ধিমানই হোক, এই ল্যাবরেটরি সম্পর্কে তারা যতটাই জানুক, এটার হদিস তাদের জানা ছিল না। তাই আসল জিনিসটা এখনও খোয়া যায়নি। কিন্তু এটা আর এখানে রাখা উচিত নয়।

বিশ্বস্রষ্টাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন মনে মনে।

ডার্করুম থেকে বেরিয়ে লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। লিফটের দেয়ালে দুটো সুইচবোর্ড। ডানদিকের সুইচবোর্ডে তিন সারিতে ন'টা সুইচ। ঠিক মাঝখানেরটা টিপলেন তিনি। সুইচবোর্ডের উপরের কাঠটা আস্তে আস্তে টান দিলেন। খুলে এল কাঠটা। ভিতরে দেয়ালের ফোকরে চৌকোণা ছোট একটা ক্যামেরা। তিনটে তারে ক্যামেরার তিনটে পয়েন্ট যুক্ত ছিল। সেগুলো সাবধানে ছাড়িয়ে ক্যামেরাটা বের করে আনলেন। ক্যামেরার পেছনের ঢাকনাটা খুললেন। এবং অবাক হয়ে দেখলেন ভিতরে স্পুলটা নেই।

অথচ তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, কাল বিকেলে এই অটোমেটিক ক্যামেরাটাতে তিনি নতুন একটা ফিল্ম্ ভরে রেখেছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে কেউ এখানে ঢুকলে এই অটোমেটিক ক্যামেরায় তার ছবি উঠতে বাধ্য।

একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'স্যার।'

ইন্টারকমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ড. রাজী।

'ইয়েস।'

'পারভেজ স্পিকিং। শুড উই কাম ইন?'

'ইয়েস, মাই বয়। ডু কাম। দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ। আই শ্যাল শো ইউ।'

'কিন্তু স্যার, একটা অসুবিধায় পড়েছি।'

'কি অসুবিধা?'

'আমার চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি।' সলজ্জ কণ্ঠ শোনা গেল।

'স্ট্রেঞ্জ! এমন ভুল হওয়া তো সাইন্টিস্টের উচিত নয়। যাক, সেলিম আর রুহুল

করিম কোথায়?'

'ওরা কাজ করছে।'

'কাজ থাক, এখুনি ওদেরকে নিয়ে তুমি চলে এস।'

ঘন্টাখানেক পরের কথা। রিসেপশন রুমের দরজা বন্ধ করে ড. রাজী তাঁর তিন সহকারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওদের কারও বাক্স্ফূর্তি হচ্ছিল না। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে যে সর্বনাশ হয়েছে সে আঘাত ওরা কেউই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ড. রাজী ভেবেছিলেন, সবচেয়ে বেশি আঘাত পাবে রুহুল করিম। মেশিনগুলোকে সে সন্তানের অধিক স্নেহ করে। কি কার্যত দেখা গেল, আঘাত সবচেয়ে বেশি পেয়েছে পারভেজ, আর রুহুলই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

মেয়েলি কণ্ঠে রুহুল বলল, 'আই অ্যাশিওর ইউ, পারভেজ সাহেব, মেশিন সবগুলোই আমি ঠিক করে ফেলতে পারব। সবগুলোকে আর তৈরি করতে হবে না। রিপেয়ার করলেই চলবে। তবে কম করেও এক বছর সময় লাগবে।'

পারভেজ বলল, 'বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এক বছর যে অনেক সময়, করিম সাহেব?'

ল্যাবরেটরি অপেক্ষা উপস্থিত সমস্যা সমাধানেই সেলিমের উৎসাহ বেশি। সে বলল, 'এখন আমাদের প্রথম কাজ হল কালপ্রিটকে খুঁজে বের করা। তাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে না পারলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আপনি কি বলেন, স্যার?'

'আমিও সেই কথাটাই ভাবছি। অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক জরুরী কাগজপত্র বিশেষ করে কতকগুলো চার্ট খোয়া গেছে। সম্ভবত সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। স্মৃতি-শক্তি আমার অনেকটা ঝাপসা হয়ে গেছে। কাগজপত্র না দেখে অনেক কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ঠিক এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিন্তভাবে কিছুই বলতে পারছিনে। তবে পারভেজের বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় আর রুহুল করিমের ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতায় আমার বিশ্বাস আছে। আসলে ব্যাপারটা ওদের উপরই নির্ভর করছে। কিন্তু সে তো পরের কথা। এখন আমাদের সমস্যা অন্য। যারা আমাদের পিছনে লেগেছে তাদের সনাক্ত করতে না পারলে নতুন করে গবেষণা চালিয়ে কোন লাভ নেই।'

পারভেজ বলল, 'ঠিক, আমাদের আগে এই রহস্য সমাধান করতে হবে।'

ড. রাজী ওদের তিনজনের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কাউকে আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

সেলিম বলল, 'বলুন?'

'তোমরা কি কখনও কারও কাছে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির অস্তিত্ব এবং আমাদের গোপন গবেষণার কথা প্রকাশ করেছ?'

তিনজনই দৃঢ়স্বরে জানাল যে, তারা বাইরের কারও সাথে এ সম্পর্কে কখনও আলোচনা করেনি।

'অথচ আমাদের শত্রুরা অনেক কিছুই জানে। আশ্চর্য!' মন্তব্য করলেন ড. রাজী। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি, 'ড. হাকিমকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা রাখতে পারলাম না।'

সেলিম কি যেন ভাবছিল। সে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'ইউরেকা!'

সবাই সাগ্রহে সেলিমের দিকে তাকাল।

'শহীদকে লাগিয়ে দিই, স্যার। সে ঠিক এর রহস্যভেদ করতে পারবে।'

'শহীদ? কে তিনি?'

'শহীদ খান। আমার হাফপ্যান্টের আমলের দোস্ত। সৌখিন গোয়েন্দা। খুব নাম ডাক। পুলিস মহলেও প্রচুর প্রতিপত্তি।'

পারভেজ বলল, 'যাঃ, এসব কাজ কি সৌখিন লোকদের দিয়ে হয়? তাছাড়া দেখাই যাক না পুলিস কি করে?'

'ওরা তো রাজ্যের গ্যাং-কেসের আসামীদের পিছু ধাওয়া করবে। শুনলি না সমসের দারোগার কথা?'

'কিন্তু আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির অস্তিত্ব তো পুলিসের জানা নেই। তাহলে হয়ত অন্য ধরনের ধারণা পোষণ করত,' পারভেজ বলল।

সেলিম স্বীকার করল সে কথা।

কিন্তু ড. রাজী সম্মত হলেন সেলিমের প্রস্তাবে। তিনি বললেন, 'পুলিসের যোগ্যতা আমি চ্যালেঞ্জ করছি না, তবে ওরা ব্যাপারটাকে আর দশটা কেসের মতই দেখবে। অথচ আমরা সে ঝুঁকি নিতে পারি না। তাছাড়া আরও একটা ঘটনা ঘটেছে যা তোমাদের কল্পনার সমস্ত সীমারেখাকে ছাড়িয়ে যাবে। অথচ সেইটাই আমাদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহস্য,' অত্যন্ত দৃঢ় গলায় তিনি কথাগুলো বললেন।

ওরা তিনজন ড. রাজীর মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তিনি একটু ইতস্তত করলেন। তারপর তিনি তাঁর বিভীষিকাময় নৈশ অভিজ্ঞতার কথা খুলে বললেন।

ওরা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। ওদের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের রেখা প্রথম দিকে ফুটে উঠলেও ড. রাজীর বিবরণের পুঙ্খানুপুঙ্খতায় তাদের অবিশ্বাস ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু পারভেজ তবু খুঁত খুঁত করতে লাগল।

ড. রাজী শেষটায় যোগ দিলেন, 'জানি না তোমাদের বিশ্বাস হল কিনা। তবে যেসব অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো ঘটেছে তার সাথে এই ঘটনাকে মিলিয়ে দেখ। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে, আমাকে আমার বাসায় রেখে এল কে?'

ওরা তিনজন নীরব হয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে সেলিম বলল, 'এখন আর অবিশ্বাস করতে পারি না স্যার, অবশ্য অন্য কেউ হলে অবশ্যই অবিশ্বাস করতাম। তবে এই ধরনের গুজব আমি আজ সকালেও একবার শুনেছি। আলী

সাহেব বললেন, 'তিনি নাকি এক ভদ্রলোকের কাছে শুনেছেন, গতরাতে রিসার্চ সেন্টারের বাইরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দৈত্যাকার একটা মূর্তি দেখা গিয়েছিল। তখন অবশ্য বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসেনি।'

কিন্তু পারভেজের চেহারা থেকে অবিশ্বাসের ছায়া একেবারে মিলিয়ে গেল না। সে বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয়, ওটা একটা অপটিক্যাল হ্যালুসিনেশন ছাড়া আর কিছু নয়। এইসব গোলমেলে ব্যাপার মিলে বিভ্রান্তিটা আরও পাকাপোক্ত হয়েছে।'

ড. রাজী ক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন, 'এটা হ্যালুসিনেশন বলে প্রমাণিত হলেই আমি সবচেয়ে খুশি হব।'

রুহুল করিম বলল, 'আমার সব গুলিয়ে আসছে।'

'আরে, গুলিয়ে তো আসছে আমারও। সমস্ত ব্যাপারটাই তো গোলমেলে,' সেলিম গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল।

পারভেজ বলল, 'পুলিসকে এ ব্যাপারটা বললেন না যে?'

'ওরা বিশ্বাস করত না বলেই। যেমন তুমি করছ না।'

লজ্জিত হল পারভেজ। মুখ নিচু করল সে।

'তাহলে তো স্যার শহীদকেই অনুরোধ করতে হয়,' সুযোগ পেয়ে সেলিম আবেদন জানাল।

'তাই কর। দেখ ভদ্রলোক সম্মত হন কিনা।'

সেলিম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি এখুনি ফোন করে আসছি। সে দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই কে যেন দরজায় আঘাত করল। সেলিম দরজা খুলতেই দেখল সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী এক অপরিচিতা তরুণী। সে একপাশে সরে দাঁড়াল।

ড. রাজীও দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন। তরুণীকে দেখে তিনি বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। তরুণী তাঁরই একমাত্র সন্তান রোকেয়া। উত্তেজনায় তিনি সোফা ছেড়ে উঠে এলেন, 'তুই, তুই কখন এলি মা, আমাকে খবর দিসনি কেন?'

'তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম, আব্বা,' ভিতরে ঢুকে বলল। ড. রাজীকে কদমবুসি করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি অনেক বুড়িয়ে গেছ, আব্বা। তোমাকে এবার রিটায়ার করতে হবে।'

ড. রাজী হেসে বললেন, 'এই যাঃ, এসেই ডাক্তারি শুরু করলি! বোস।'

সেলিম তখনও নিষ্ক্রান্ত হয়নি। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বসুন, মিস রাজী।'

'তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।'

গর্বিত পিতা মেয়েকে আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সহকারীদের সাথে।

একটু পরেই সেলিম বেরিয়ে গেল। সে যখন ফিরে এল তখন তার পিছনে ট্রে হাতে বেয়ারা।

পারভেজ খুশি হয়ে বলল, 'এতক্ষণে একটা কাজের মত কাজ করেছিস,

গলাটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু বাছা, এতে কি তোমার গলা ভিজবে?' টিপ্পনী কাটল সেলিম, 'বেশ তো, না হয় দু'কাপ বেশিই খেয়ো।'

নবাগতার উপস্থিতিতে মন্তব্য করাটা উচিত নয়। নিজে বুঝতে পেরে কথাটা ঘোরাল সে। রোকেয়াকে বলল, 'মিস রাজী, প্রমাণ করুন তো—যে মেয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী নিতে পারে সে মেয়ে চা-ও তৈরি করতে পারে।'

হাসল রোকেয়া। পারভেজ দেখল, সুন্দরী মেয়েটার হাসিটাও ভারি মিষ্টি।

ড. রাজী সেলিমকে বললেন, 'তোমার বন্ধুকে ফোন করেছ?'

'মিনিট পনেরর মধ্যেই এসে পড়বে শহীদ,' জবাব দিল সেলিম। রোকেয়া চা বানাতে বানাতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের হয়েছে কি, আব্বা? সবাই তোমরা এখানে বসে আছ যে?'

'একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, মা!' তিনি তারিক খাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা সংক্ষেপে বললেন রোকেয়াকে।

রোকেয়া চোখ দুটো বড়বড় করে বলল, 'তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে খুন করে গেছে? ভয়ঙ্কর কাণ্ড তো!'

'হ্যাঁ, ভয়ানক তো বটেই। তাই তো শুধু পুলিসের উপর ভরসা না করে শহীদ খান নামে একজন দক্ষ গোয়েন্দাকে অনুরোধ করেছি ব্যাপারটা তদন্ত করতে। তিনি এখুনি এসে পৌছবেন।'

চা খাওয়া শেষ হতেই রোকেয়া উঠে পড়ল।

'আব্বা, আমি চলি। আমাকে একটু রেস্ট নিতে হবে।'

'হ্যাঁ মা, তুমি যাও।'

'তুমি সাঁঝের সময় বাসায় যেয়ো কিন্তু।' বেরিয়ে গেল রোকেয়া।

মিনিট পাঁচেক পরেই শহীদ এসে পৌছুল।

পরিচয়-পর্বের পর শহীদ বলল, 'আমি আপনার নাম শুনেছি, ড. রাজী। তবে সৌভাগ্য হয়নি আলাপের। ব্যাপারটা কি বলুন তো,' সেলিম, পারভেজ ও রুহুলকে দেখিয়ে সে বলল। 'আশা করি, এদের সামনে বলতে আপত্তি নেই।'

'বিন্দুমাত্র না।'

'তবে দয়া করে কিছু গোপন করবেন না।'

ড. রাজী বললেন, 'আমরা সমূহ বিপদের সম্মুখীন। আমাদের একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারের উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। অথচ এটা খারাপ লোকের হাতে পড়লে এবং তারা তার অপব্যবহার করলে সমগ্র মানবজাতি সঙ্কটের সম্মুখীন হতে পারে। এই অবস্থায় আপনার তদন্তের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন কথাই আমি গোপন রাখব না। রাখতে পারি না।'

শহীদ খুশি হয়ে বলল, 'অতি উত্তম কথা।'

ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন ড. রাজী। রাতে রিসার্চ সেন্টারের গেটের

সম্মুখে গাড়ি থেকে নামবার পর থেকে ল্যাবরেটরির বিপর্যয় পর্যন্ত সবকিছু খুলে বললেন তিনি। গেটের সামনে যে ভয়ালদর্শন মূর্তির কবলে পড়েছিলেন তারও বিবরণ দিলেন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

শহীদের অবিশ্বাস তবু দূর হল না।

'বে-আদবী মাফ করবেন। আপনার দেখায় কোন ভুল হয়নি তো?'

শুকনো হাসি হাসলেন ড. রাজী।

'কোন ভুল হয়নি, শহীদ সাহেব। কোন ভুল হয়নি।'

শহীদ একটু চিন্তা করে বলল, 'গেটের বাঁকানো শিকটা আমি দেখে এসেছি। ওটা সত্যি সাধারণ মানুষের কাজ বলে মনে হয় না। ঐ শিক বাঁকাতে অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন। ভাল কথা, পুলিস কি ফটো নিয়েছে বাঁকানো শিক থেকে আঙুলের ছাপ পাবার আশায়?'

'নিয়েছে,' জানালেন ডক্টর রাজী।

আবার চুপ করে রইল শহীদ। একটু পরে ড. রাজীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না, সন্দেহ করার মত কাউকেই পাচ্ছি না।'

'হাতেম আলী, না কি যেন নাম বললেন সিকিউরিটি গার্ডের? সে আছে এখনও?'

'না, চলে গেছে।'

'খবর দিন ওকে। ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনারা, মানে পারভেজ সাহেব, সেলিম ও রুহুল সাহেব কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?'

রুহুল মাথা নেড়ে বলল, 'আমি কিছুই জানি না। ন'টার সময় এখানে এসে দেখলাম এই হুলস্থুল ব্যাপার।'

'পারভেজ সাহেব, আপনি?'

পারভেজ ইতস্তত করে বলল, 'না, আমি কিছু জানি না।'

সেলিমও অক্ষমতা প্রকাশ করল।

শহীদ বলল, 'আমি একবার আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিটা দেখতে চাই, যদি আপনাদের কোন আপত্তি না থাকে।'

'না, কোন আপত্তি নেই। চলুন।'

উঠে দাঁড়ালেন ড. রাজী।

শহীদ দাঁড়িয়ে বলল, 'সেলিম, তোরা বরং এখানটাতেই অপেক্ষা কর।'

'অলরাইট।'

বেরিয়ে গেল দু'জন।

'বাই দ্য ওয়ে, ড. রাজী, লাশটা কোথায় পড়ে ছিল?'

'ঐ তো ওখানে, বাগানের মধ্যে!'

'চলুন, আগে জায়গাটা দেখে আসি।'

মাটির উপর রক্তের ছাপটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল শহীদ। এদিক-ওদিক দেখল। একটু দূরে এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে একটা বেড তৈরি করা হয়েছে। মৌসুমি ফুলের গাছ বোনা হবে নিশ্চয়ই। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। পায়ের ছাপ না ওগুলো? উবু হয়ে বসল সে। হ্যাঁ, পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল বেডটা। তার উপর কয়েকটা পদচিহ্ন। ছাপগুলো অস্বাভাবিক রকম বড়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দু'দিকেই। প্রায় এক ইঞ্চি গভীর।

ড. রাজী পাশে এসে দাঁড়ালেন। পায়ের ছাপগুলো তাঁরও চোখে পড়ল।

শহীদ মাথা না তুলেই বলল, 'পদচিহ্নগুলো দেখেছেন, ড. রাজী? কত বড় আর কত গভীর! আপনি যে দৈত্যাকার মূর্তির কথা বলেছিলেন সেটা সত্য হলে বলতে হবে, এটা তারই পায়ের ছাপ। মনে হচ্ছে, আপনার দেখাটা হ্যালুসিনেশন নয়।'

ড. রাজী বললেন, 'এখন তাহলে আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে?'

'বিশ্বাস না করে উপায় কি?' পকেট থেকে ফিতা বের করে সাবধানে মেপে শহীদ বলল, 'সাড়ে পনের ইঞ্চি লম্বা আর সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ, দেড় ইঞ্চি গভীর। বুড়ো আঙুলটার দৈর্ঘ্য সোয়া দুই ইঞ্চি। এ যে এক দৈত্যাকার মানবের পদচিহ্ন কোন সন্দেহ নেই তাতে,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল শহীদ।

পরের দৃশ্যে শহীদ ও ড. রাজীকে দেখা গেল আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। বিপর্যস্ত ল্যাবরেটরিটা দেখে শহীদও অবাক হল। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে এমন একটা আধুনিক ল্যাবরেটরির এহেন ক্ষতি সাধন করা সম্ভব কিনা, ভাবতে লাগল সে। অন্ততপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার অত্যন্ত দামি মেশিনারী নষ্ট হয়ে গেছে।

শহীদ বলল, 'মনের সমস্ত আক্রোশ ঝেড়েছে এর উপর।'

'কিন্তু আক্রোশের কি থাকতে পারে?'

'সেটা তো তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার।'

সমস্তটা ল্যাবরেটরি ঘুরে ঘুরে দেখল শহীদ। কোন সূত্র কোথাও আবিষ্কার করা যায় কিনা, এই ছিল তার লক্ষ্য। ড. রাজী তাঁর ল্যাবরেটরির কর্ম-পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন শহীদকে। কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের পারস্পরিক সংমিশ্রণে ল্যাবরেটরির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস জন্ম নিতে শুরু করেছে। দু'জনেরই শ্বাস-প্রশ্বাসে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। গ্যাস-মুখোশ না পরে ঢোকাটা ভুল হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে আর অপেক্ষা না করে দুজন দ্রুত উঠে এল।

ড. রাজীর চেম্বারে ঢুকে শহীদ বলল, 'এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, ড. রাজী।'

'অবশ্যই। আসুন, বসা যাক।'

দুজন সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসল।

সিগারেট ধরাল শহীদ। নীরবে কয়েকটা টান দিয়ে সে বলল, 'প্রথমে বলুন,

আপনাদের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে এমন কি গবেষণা চলছিল যার জন্যে এই ধরনের হামলা হতে পারে। কোন মারণাস্ত্র বা কোন মারাত্মক ধরনের বিষ?'

'না, বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার হলেও আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের বিষয়ের উপর গবেষণা করা হচ্ছিল। ইউজেনিকস সম্পর্কে কোন আইডিয়া আছে আপনার?'

'ইউজেনিকস?'

'হ্যাঁ।'

'শব্দটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। বংশানুক্রম সম্পর্কিত কোন কিছু।'

'একজ্যাক্টলি। শব্দটা বায়োলজির, তবে সোশলজিতেও এ সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করা হয়। এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ আছে বলে আমি জানি না। তবে বলা যেতে পারে, দোষত্রুটিহীন প্রজনন বা সর্বোত্তম প্রজনন। যুগে যুগে মানুষ ভাল হতে চেয়েছে। নিষ্কলুষ, চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান এবং প্রতিভাবান হতে চেয়েছে অর্থাৎ সৎগুণাবলীর অধিকারী হতে চেয়েছে এবং দোষগুলো বর্জন করতে চেয়েছে। মানুষ চেয়েছে পৃথিবীটাকেই স্বর্গে পরিণত করতে কিন্তু তা পারেনি। ইউজেনিকসে এই পরম গুণবান মানুষ গড়ার সম্ভাব্যতা নিয়েই আলোচনা করা হয়। আমরা ইউজেনিকসের সম্ভাব্যতা নিয়েই আমাদের গবেষণাগারে কাজ করছিলাম।'

ড. রাজী একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, 'এই ধরনের গবেষণা শুধু এটাই প্রথম নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমবেশি এ নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি হয়েছে জার্মানিতে হিটলারের আমলে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল সুপারম্যান বা অতিমানব গড়ে তোলা। সাফল্য লাভ তাঁরাও সম্ভবত করেছিলেন কিন্তু জার্মানির পতনের সময় সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মারা যান। যতদূর মনে হয়, তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিতে ইউজেনিকসের সম্ভাব্যতারও তখনকার মত অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ড. লোকমান হাকিম জার্মানিতে অধ্যাপনা করতেন। তিনি কিছু কিছু শুনেছিলেন এ-সম্পর্কে। দেশে ফিরে তিনিই এই রিসার্চ সেন্টার ও আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। আমিও এতে যোগ দিই।

'একনাগাড়ে বিশ বছর গবেষণার পর আমরা সাফল্য লাভ করি মাত্র চারমাস আগে। এটা আসলে এক অসাধ্য সাধন। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। আণবিক বোমা আবিষ্কারের চাইতেও এর গুরুত্ব অসীম। কারণ আমাদের আবিষ্কার যথার্থ-ভাবে ব্যবহার করলে মানবজাতির ইতিহাসই পাল্টে যাবে। পৃথিবীটাই হয়ে উঠবে স্বর্গ। ইচ্ছে করলেই আমরা দেব-সুলভ চরিত্রের মানুষের জন্ম দিতে পারি আমাদের আবিষ্কারের দ্বারা। অথবা জিনিয়াস গড়ে তুলতে পারি।'

'এবং,' শহীদ যোগ দিল। 'পাষণ্ডও তৈরি করতে পারেন।'

'হ্যাঁ. এবং সেটাই হল আমাদের সাফল্যের চরম ট্রাজেডী। বিজ্ঞান মানুষের

যেমন কল্যাণ সাধন করতে পারে তেমনি চরম সর্বনাশও করতে পারে। যে প্রসেস আমরা আবিষ্কার করেছি তা কোন অপরাধী প্রকৃতির বিজ্ঞানীর হাতে পড়লে সে এটাকে ব্যবহার করে, সুপার ইনহিউম্যান তৈরি করে পৃথিবীটাকে একটা নরক কুণ্ডে পরিণত করতে পারে। আর ঠিক এই কারণেই আমরা আমাদের গোপন আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিনি, যদিও জানি এটা প্রকাশ পেলে আমরা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকব। আমরা অবশ্য সুপারম্যান তৈরি করিনি। গিনিপিগের উপর এক্সপেরিমেন্ট করেছি।'

শহীদ অভিভূত হয়ে গেল। তার দেশেরই একদল বিজ্ঞানী লোকচক্ষুর আড়ালে বিজ্ঞানের সাধনায় এমন অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে আর তা সে জানতেও পারেনি! পরম শ্রদ্ধায় সে ড. রাজীকে মনে মনে অভিনন্দন জানাল।

ড. রাজীকে বলার নেশায় পেয়ে বসেছিল। তিনি বলেই চললেন, 'আমরা এগিয়েছিলাম সহজ থিওরী সামনে রেখে। জানেন তো, অনুবিভাজন সম্ভব হয়েছিল বলেই আণবিক বোমা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। আমাদেরও তাই লক্ষ্য "জিন" বিভাজন।'

'জিন?'

'হ্যাঁ। "জিন" শব্দ থেকেই জেনেটিকস ও ইউজেনিকস শব্দ দুটো এসেছে। জেনেটিকস হচ্ছে বংশানুক্রম বিজ্ঞান। এই জিনই হল মানুষের দেহ, মন, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আদি উপাদান। বলতে পারেন, এইগুলোই হচ্ছে বংশধারার ভিত্তি। প্রাণী ও গাছের বংশধারা বয়ে যায় ক্রমোসোমের মাধ্যমে। ক্রমোসোম হল যৌন-কোষের নিউক্লিয়াসের অঙ্গ। এটাই পূর্বপুরুষের গুণাবলী উত্তর পুরুষের মধ্যে বয়ে নিয়ে যায় এবং এর দ্বারাই তারা একজন অন্যজনের চেয়ে পৃথক হয়, অথচ পিতা-মাতা বা পূর্বপুরুষের সাথে তাদের সাদৃশ্যও থাকে। পুরুষের যৌনকোষের মধ্যে আছে ২৩টি ক্রমোসোম, স্ত্রীলোকের নিষিক্ত যৌন-কোষে থাকে ৪৬টি। এক একটি ক্রমোসোমে থাকে একাধিক জিন। অনেকটা পুতির মালার মত এবং প্রত্যেকটা জিন এক একটি গুণের আকর। যেমন ধরুন, একটি নিষিক্ত জিনের জন্যে একটা লোক কালো হতে পারে বা বোকা হতে পারে অথবা ধরুন তার চুল কটা হতে পারে। সে দেবতা হতে পারে পিশাচও হতে পারে। আমাদের লক্ষ্য ছিল ক্রমোসোম ভেঙে জিন বিভাজন করা অর্থাৎ একটা জিনকে অন্য জিন থেকে পৃথক করা এবং প্রত্যেকটি জিনের চরিত্র নির্ণয় করা। জার্মান বৈজ্ঞানিকরাও এই পথ ধরে এগিয়েছিলেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আমরা হয়েছি। আমরা জিনগুলোকে আলাদা করেছি, তাদের চরিত্র নির্ণয় করেছি। এখন যদি চেষ্টা করি এবং যদি নির্ণয়ে ভুল না করি, তাহলে আমরা দেবতাও গড়তে পারি শয়তানও গড়তে পারি। সে সাধনায় আমরা সফল হয়েছি। কিন্তু শয়তান গড়ার জন্যে তো আর আমরা এত কষ্ট করিনি? সুতরাং আমরা গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলাম।'

একটু থামলেন ড. রাজী।

'আমাদের বর্তমান সাধনা ছিল, যেসব জিন দেহ ও মনকে কলুষিত করে সেগুলোকে মডিফাই করা যায় কিনা।'

'অর্থাৎ শয়তানকে দেবতা করা যায় কিনা। সে তো বোধহয় আরও কঠিন কাজ।'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত দুরূহ। এবং দুরূহই নয়, বিজ্ঞান যেটুকু এগিয়ে গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত অসম্ভব। কিন্তু আমাদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে চেষ্টা না চালিয়ে উপায় নেই। শুধু আণবিক বোমা বানালে হবে না। তার বিরুদ্ধে প্রোটেকশন চাই। ব্যালিস্টিক মিসাইল যারা তৈরি করেছে তারা অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম ডেভলপ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। আমরাও তাই আমাদের আবিষ্কারের ক্ষতিকর দিকটার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে বাধ্য।'

'এব্যাপারে আপনারা কতটা এগিয়ে গেছেন?'

'আদৌ এগোইনি। কোন্ পথ ধরে এগুনো যায় তাই আমরা উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিলাম মাত্র।'

আর একটা সিগারেট ধরাল শহীদ। অনেকক্ষণ ধরে নীরবে সিগারেট টানল সে। তারপর বলল ল্যাবরেটরিতে হামলা করার কারণটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। যেভাবেই হোক আপনাদের গবেষণা আর গোপন নেই। সুতরাং ঐ অসৎ অভিসন্ধি নিয়েই কেউ হানা দিয়েছিল এখানে। কিন্তু ঐ দৈত্যাকার পায়ের ছাপটার রহস্য এখনও বুঝতে পারছি না। সে কথা যাক, আপনার ঘনিষ্ঠ যে তিনজন সহকারী আছে তারা যথেষ্ট বিশ্বাসী তো?'

'সেন্ট পারসেন্ট। ওদেরকে আমি কখনোই অবিশ্বাস করতে পারিনে।'

'সেলিম তো বোধ হয় অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গে আছে।'

'বছর তিনেক হল আছে সেলিম আর রুহুল করিম। পারভেজ অবশ্য নতুন। মাত্র এক বছর আগে এসেছে। অবশ্য সে অত্যন্ত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। একদিন না একদিন সে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করবে।'

'ওরা ছাড়া এই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরির অস্তিত্ব আর কেউ জানে?'

'আর জানে আমার মেয়ে রোকেয়া। সে তো এখানে ছিল না। আজকেই ফিরে এসেছে, তবে ওকে আমি আমাদের সাফল্যের খবর জানিয়েছিলাম।'

'কোথায় ছিলেন আপনার মেয়ে?'

'মিউনিকে ডক্টরেট নিতে গিয়েছিল। ওরও সাবজেক্ট ছিল জেনেটিকস্।'

শহীদ আর একটা সিগারেট ধরাল। নীরবে কিছুক্ষণ টানল। তারপর বলল, 'ল্যাবরেটরি থেকে কোন কিছু খোয়া গেছে কিনা বলতে পারেন?'

ড. রাজী বললেন, 'তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যেটা সেটা খোয়া যায়নি এবং আমি সেটা সরিয়ে ফেলেছি।'

'আগেই?'

'না, আজকে।'

'সেটা খোয়া যাবার আশঙ্কা আছে?'

'সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। ল্যাবরেটরি ধ্বংস হলে আবার তা হয়ত শিগগিরই গড়ে তোলা যাবে ওটার সাহায্যে। কিন্তু আমাদের আবিষ্কার সম্পর্কিত নথি-পত্র হারালে তা পুনর্গঠন করতে কত বছর লাগবে তার ঠিক নেই।'

'তার মানে, ঐ সব নথি-পত্রের জন্যে আপনার উপর হামলা হওয়া বিচিত্র নয়।'

তিনি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আপনি তো বলছেন, কাউকে আপনার সন্দেহ হয় না। তবু আমি ব্যাপারটা আবার আপনাকে ভেবে দেখতে বলি। কারণ দৈত্যাকার প্রাণীর অস্তিত্ব সত্য হলে আমার বিশ্বাস, এর পিছনে কোন প্রতিভাধর অপরাধী আছে এবং সে আপনার খুব কাছে পিঠেই আছে। আপনার ল্যাবরেটরির সবকিছু সে জানে, গোপন ক্যামেরা কোথায় রাখা হয় তা-ও জানে। সেই লোকটাকে খুঁজে বের করাটাই আসল সমস্যা,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল শহীদ। 'আপনি আরও গভীরভাবে চিন্তা করুন।'

পাঁচ

রিসেপশন রুমে ফিরে গেল শহীদ। সেখানে ঢুকতেই সেলিম বলল, 'হাতেম আলী এসেছে, ডাকব ওকে?'

'ডাক তো। সে কোন নতুন খবর দিতে পারে কিনা দেখি।'

হাতেম আলী সত্যিই একটা নতুন খবর দিল। সে জানাল যে, রাতে যখন সে সিকিউরিটি রুমে ঢোকে তার একটু পরেই মিষ্টি একটা গন্ধ তার নাকে আসছিল। সেটা ফুলের গন্ধ নয়। কিন্তু সে গন্ধটাতে এমন একটা মাদকতা ছিল যে তার দুটো চোখ ঘুমে ভেঙে আসছিল। বিছানায় শুতেই ঘুমে তার চোখ দুটো জড়িয়ে এসেছিল।

হাতেম আলী বিদায় নিতেই সেলিম বলল, 'কিরে, কোন হদিস পেলি।'

হাসল শহীদ।

'এ তো কেবল তদন্তের শুরু। তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে, যবনিকাপাত হতে বিলম্ব হবে না বেশি। কিন্তু তোরা খুব সাবধানে থাকিস।'

'কেন?'

'যে-কোন সময় তোদের উপর আঘাত নেমে আসতে পারে। অবশ্য তোদের আমি ভয় পাইয়ে দিতে চাইনে। সতর্ক করে দিতে চাই।'

পারভেজ বলল, 'ড. রাজী যে বিকটদর্শন দৈত্যাকার মূর্তির কথা বললেন আপনি তা বিশ্বাস করেন, শহীদ সাহেব?'

শহীদ ইতস্তত করে বলল, 'এ প্রশ্নের জবাব আমি এই মুহূর্তে দিতে পারছিনে।'

সেলিম বলল, 'ড. রাজী ছিলেন বলে তোকে একটা ঘটনার কথা বলতে পারিনি।'

'এখন বল তাহলে?'

'ঠিক এক সপ্তাহ আগে এখানে এক কাণ্ড ঘটে গেছে। আলী সাহেব বলে এক ভদ্রলোকের দেওয়া একটা নৈশ-ভোজ থেকে আমি ও পারভেজ ফিরছিলাম। রাত তখন বারোটার মত হবে। ড. রাজীও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু উনি হঠাৎ সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেননি। নৈশ-ভোজ শেষে তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে রাস্তা থেকেই দেখলাম দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে নীল আলো জ্বলছে। তার মানে, উনি ঘুমুচ্ছিলেন। পারভেজ নিচে ড. রাজীর গাড়িও দেখতে পেয়েছিল।

'ফেরার পথে একটা গাড়ি ও তার নম্বর দেখে মনে হল, ওটা ড. রাজীর গাড়ি। আমার দেখায় কোন ভুল হয়নি। আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি শিওর। পারভেজ অবশ্য ব্যাপারটাকে হ্যাল্যুসিনেশন বলে মনে করেছিল। কিন্তু রিসার্চ সেন্টারে তক্ষুণি এলাম এবং শুনলাম, ড. রাজী সত্যি সত্যি এসেছিলেন। ব্যাপারটাতে খটকা লেগেছিল আমার মনে। ভেবেছিলাম খোঁজ-খবর নেব এ সম্পর্কে। কিন্তু এগোতে পারিনি।'

'তা ড. রাজীকে জিজ্ঞেস করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়,' শহীদ বলল। 'ঠিক আছে, আমিই জিজ্ঞেস করব। এখনকার মত উঠি। সন্ধ্যার দিকে আর একবার আসব এদিকে।'

বিকেলের দিকে মেঘ করে এল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। সাঁই সাঁই করে বাতাস বইতে শুরু করল। তার মধ্যেই বেরোবে বলে স্থির করল শহীদ।

কামালও এসে হাজির হল সেই সময়। 'কিরে কোথাও বেরোচ্ছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ, তুইও যাবি, চল।'

'কোথায়?'

'ঠাকুরমার ঝুলির দেশে। 'বেশ একটা ইন্টারেস্টিং কেস পেয়েছি হাতে। একেবারে দৈত্য-দানো নিয়ে কারবার।'

'ক'টা মারলি?'

'একটাও না। ওদের প্রাণ কোন এক পাতালপুরীর গোপন সোনার কৌটায় আছে তা জানার জন্যে ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর খোঁজে যাচ্ছি। ওঠ, দেরি করিয়ে দিসনে।'

রাস্তায় কামালকে সংক্ষেপে ঘটনাগুলো জানাল শহীদ। কামাল প্রথমে বিশ্বাস করতেই চাইল না। আর তাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে শহীদও আগ্রহ দেখাল না।

থানায় যখন পৌছুল তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সমসের দারোগা

থানাতেই ছিল। সে শুকনো হাসি হেসে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলল, 'রিসার্চ সেন্টারের রাক্ষস-খোক্কসের কেসে বোধ হয়?'

শহীদ বসতে বসতে বলল, 'রিসার্চ সেন্টারের কেসে বটে, কিন্তু রাক্ষস-খোক্কসের ব্যাপারটা কি?'

'আর বলবেন না, শহীদ সাহেব। তালায় যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তা সাধারণ মানুষের নয়।'

অবাক হওয়ার ভান করল শহীদ, 'কোন অসাধারণ মানুষের বুঝি?'

'আপনি তো সাহেব ঠাট্টাই করবেন। কিন্তু এই যে আমি পুলিসের সিযও চাকুরে, কত চোর-ডাকাত নিত্য ঠেঙ্গাচ্ছি; কিন্তু ব্যাপার দেখে-শুনে ভড়কে গেছি আমিও।'

'তা সে আঙুলের ছাপটা কোথায়?'

'চৌধুরী গোলাম হাক্কানী সাহেবের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

'মানে, সিম্পসন সাহেবের জায়গায় যিনি আপাতত কাজ করছেন?'

'হ্যাঁ, আমাদের মাথায় আর ঢুকছে না। তাই ওখানে পাঠিয়েছি।'

'পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সেটাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'কি আছে তাতে?'

'তারিক খাঁর বন্দুক দিয়েই তাকে খুন করা হয়েছে, পিঠের একদম সাথে বন্দুক লাগিয়ে। জানেন তো তাতে আওয়াজটা কম হয়। খুনটা হয়েছে রাত এগারটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'হাতের ছাপ?'

'আশ্চর্য ওতে তারিক খাঁ ছাড়া আর কারও হাতের ছাপ নেই। মনে হয়, খুনীর হাতে দস্তানা পরা ছিল।'

'এখন আপনারা কি করতে চান?'

'কর্তারা যা করেন। আমরা তো নিরুপায়। ওদিকে আর এক কাণ্ড ঘটেছে। রিসার্চ সেন্টারের পিছনে খালের মধ্যে একটা নীল রং-এর ভক্সল পাওয়া গেছে। সেটাকে উদ্ধার করে পেছনের গদী থেকে কয়েকটা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে এবং সে ছাপগুলো তালার ছাপের সাথে একদম মিলে গেছে। অবশ্য সামনের সিটে পাওয়া গেছে অন্য হাতের ছাপ।'

'গাড়িটা কার?'

'তা জানা যাচ্ছে না। তবে গাড়ির নম্বরটা হাক্কানী সাহেবের গাড়ির নম্বরের সাথে মিলে গেছে। তাঁরও একটা নীল রং-এর ভক্সল আছে। সেটা অবশ্য খোয়া যায়নি।'

'তাহলে বেশ জমে উঠেছে দেখছি ব্যাপারটা।'

'ভয়ে তো মশাই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শেষটায় কি রাক্ষসের

হাতে প্রাণ দেব?'

'তাই তো, বড় বিপদের কথা,' সমবেদনার সুরে বলল শহীদ।

'বিপদ বলে বিপদ! মশাই, আপনি আবার কেন এর মধ্যে নাক গলিয়েছেন? ভয়-ডর প্রাণে থাকলে এখুনি কেটে পড়ুন।'

'তা এসব ব্যাপার রিসার্চ সেন্টারের লোকেরা জানে?'

'না। হাক্কানী সাহেব বলেছেন গোপন রাখতে। পাবলিক ভয় পেয়ে যাবে।'

'তদন্ত কি হাক্কানী সাহেব নিজেই করবেন?'

'তাই তো করা উচিত। ইতিমধ্যেই এই এলাকায় পুলিস ফোর্স বাড়িয়ে দেওয়ার অর্ডার হয়েছে। রিসার্চ সেন্টারের চারদিকে পুলিস ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। ড. রাজীর সাথে চৌধুরী সাহেবের কি আলাপ হয়েছে, জানি না। তারপরই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

চুপচাপ অনেকক্ষণ কাটল। বাইরে বৃষ্টি আর ঝড়ের মাতামাতি চলছে।

একটা সিগারেট ধরাল শহীদ।

সমসের দারোগা চিবুকে হাত বুলাতে লাগল। তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

টেলিফোন বেজে উঠল।

সমসের দারোগা রিসিভার তুলল, 'হ্যালো…হ্যাঁ, হ্যাঁ…ধরুন। শহীদ সাহেব, আপনার ফোন।'

রিসিভারটা হাত বাড়িয়ে নিল শহীদ। একটু অবাক হল সে। থানায় যে সে এসেছে এ খবর তো কারও জানার কথা নয়।

'হ্যালো…। হ্যাঁ, শহীদ বলছি।'

চুপচাপ শুনল শহীদ কিছুক্ষণ। শেষে একটি মাত্র কথা সে বলল, 'আই অ্যাকসেপ্ট ইওর চ্যালেঞ্জ।…ইয়েস আই ডু।…ইউ, রোগ…আই ডু অ্যাকসেপ্ট ইওর চ্যালেঞ্জ। …আচ্ছা দেখা যাবে।'

শহীদের কণ্ঠে উত্তেজনার ছাপ থাকলেও চোখে-মুখে উত্তেজনার এতটুকু আভাস নেই, লক্ষ্য করল কামাল।

রিসিভার রেখে দিল শহীদ।

'কি ব্যাপার?' সাগ্রহে প্রশ্ন করল সমসের দারোগা।

'আমাদের অজ্ঞাত পরিচয় এক বন্ধু। রাক্ষস-খোক্কস নিজেই সে অথবা সম্ভবত তার মালিক। আমাকে হুমকি দিচ্ছিল।'

'একটু খোলাসা করুন।'

'রিসার্চ সেন্টারের ব্যাপারে আমি নাক গলালে আমার পরিণামও নাকি তারিক খাঁর মত হবে। তবে আমার মৃত্যু তারিক খাঁর মত সনাতন কায়দায় হবে না। চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছিল চিন্তা করার জন্যে, কিন্তু আমি এখুনি তার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করলাম, তা তো শুনতেই পেলেন।'

'তার মানে তোর উপর এখন থেকেই আঘাত হানবার আশঙ্কা আছে,' কামাল বলল।

'কাজটা কি খুব ভাল করলেন, শহীদ সাহেব?' চিন্তান্বিত কণ্ঠে সমসের দারোগা বলল।

শহীদ হাসল। অন্ধকার জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল একবার। বুকের ভিতরটা একটু কেঁপেও উঠল তার। কে জানে, কাজটা সে ভাল করল কিনা। উঠে দাঁড়াল সে, 'চল কামাল। ড. রাজীর বাসায় যেতে হবে।'

কামালের মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'হাওয়াটা একটু পড়ুক না।'

'তোর ভয় করছে বুঝি?'

'ভয়? এই শর্মা ভয় কাকে বলে জানে না,' হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে কামাল বলল, 'কাম অন, মাই ল্যাড।'

'চলি, দারোগা সাহেব।'

কিন্তু গাড়িতে উঠতেই আবার কামালকে অজ্ঞাত ভীতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলল। নির্জন পথ। এদিকটায় জনবসতি তুলনামূলকভাবে কম। বাড়িগুলো একটা থেকে আরেকটা বেশ দূরে দূরে। এখানে-সেখানে ঝোপ-ঝাড়। ইটের পাঁজা। ধানক্ষেতও আছে। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা কামালের কণ্ঠ চেপে ধরল।

শহীদ পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে কামালের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ, দরকার হলে ব্যবহার করবি।'

থানা থেকে বেরোবার পরে শহীদ লক্ষ্য করেছিল, একটা গাড়ি আসছে ওদের পিছন পিছন। কিছুদূর যাওয়ার পর শহীদ পিছন ফিরে দেখল, গাড়িটা আসছেই। খেলা শুরু হয়ে গেছে তাহলে? সে কামালকে বলল, 'দোস্ত সাবধান, লেজ লেগেছে পিছনে।'

কামালও দেখল।

'আমি রাস্তা বদলাব। বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা আছে সেই দিকে যাব। মোড় ছাড়িয়ে গাড়ি থামাব। ওখানে একটা ঝোপ আছে। দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকবি তারপর দেখব, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়। রিভলভার রেডি রাখবি; কিন্তু অকারণে গুলি নষ্ট করবি না।'

মোড়টার কাছে এসে গিয়েছিল ওরা। স্টেশনে যাবার পথ এটা। তাই বোধহয় বৈদ্যুতিক বাতি আছে পথের ধারে। শহীদ মোড় ঘুরে কয়েক গজ গিয়েই গাড়ি থামাল। কামাল রেডি ছিল। দরজা খুলেই দৌড় দিল সে ঝোপের দিকে। শহীদও দৌড়ে এল তার পিছন পিছন।

একটু পরেই দুটো আলো এসে ঠিকরে পড়ল শহীদের গাড়ির উপর; লতাপাতার ফাঁক দিয়ে শহীদ ও কামাল আলোটা দেখতে পেল। একটা গাড়ি এসে থামল শহীদের গাড়ির পিছনে।

শহীদ ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান, আগে দেখে নে আমাদের বন্ধুকে। অন্ধকারে গুলি ছুড়বি না।'

গাড়ি থেকে নামল এক আরোহী। রেইনকোট গায়ে লম্বা-চওড়া একটা লোক। মাথায় হ্যাট। সে শহীদের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু হাঁটার ভঙ্গি দেখে শহীদ ও কামাল দু'জনই বুঝল, লোকটা কুয়াশা ছাড়া আর কেউ নয়।

গাড়িটা ফাঁকা দেখে লোকটা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

কামাল ফিসফিস করে বলল, 'আরে, এ-যে কুয়াশা!'

'তাই তো! যাঃ, একটা মিস-ফায়ার হয়ে গেল।'

বেরিয়ে এল দু'জন।

বাতাসের ঝাপটায় কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। তবু কামালের যেন মনে হল, কুয়াশা তাকে ডাক দিয়ে বলল, 'এস, কামাল সাহেব।'

রাস্তার উপর উঠল দু'জন।

'কি খবর, তুমি?' শহীদ বলল।

'তোমাদের থানায় ঢোকবার খবর পেয়েই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। জরুরী দরকার আছে।'

'কি, বল?'

'এখানে এই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কি করে কথা হবে?'

'গাড়িতে ওঠ তাহলে,' শহীদ প্রস্তাব করল।

শহীদের গাড়িতে উঠল তিনজন।

'খুবই ভয়ঙ্কর লোকের পিছনে লেগেছ তোমরা। সে একা নয়, তার সাথে আছে প্রচণ্ড শক্তিশালী দৈত্যাকার চেহারার দুটো মানুষ।'

'তুমি তো দেখছি অনেক কিছুই জান।'

'বলতে গেলে আমি সবটাই জানি শুধু আসল রহস্য ছাড়া। সেটা জনতে পারলেই লোকটাকে আমি দেখে নেব।'

'কি সেটা?' শহীদ শুনতে চাইল।

হাসল কুয়াশা।

'সে প্রশ্নের জবাব আমি এই মুহূর্তে দেব না। তোমাকে আমি এগোতে বাধাও দেব না। শুধু বলছি, খুব সাবধান। একেবারে আসল শয়তানের সাথে খেলা। দেবতারূপী এক শয়তান।'

'দেবতারূপী শয়তান?'

'তাহলে লোকটাকে তুমি চেন?'

'চিনি বলেই মনে হয়। আমি তার এক গোপন ইচ্ছায় বাদ সাধতে গিয়েছিলাম। বলতে গেলে আমার প্ল্যান বানচাল হয়ে গেছে। সেটা কেমন করে জানি ফাঁস হয়ে গেছে এবং আমাকে বোকা বানিয়ে সেই প্ল্যান ধরেই সে এগিয়ে

গেছে।'

'তার মানে, তোমাকেও সে চেনে?'

'চেনে না। তবে যে নামে আমি এই এলাকায় পরিচিত সেটা সে জানতে পেরেছে। সুতরাং আজ থেকে সে নামের মৃত্যু হল।'

'কি নামে এখানে তোমার পরিচয় ছিল?'

'আলী সাহেব নামে। ইনডেন্টিং ব্যবসায়ের সূত্র ধরে আমি হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়েছে। কিন্তু আসল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারিনি।'

'তোমার পরিচয় সে জানল কি করে?'

'আমার ঘাড়ে শ্যানন ডি. কস্টা বলে একটা ভূত চেপেছিল, মনে আছে? সে-ই ডুবিয়েছে আমাকে। মার খেয়ে নাম বলে দিয়েছে। মার খেয়েছে মান্নানও। প্রচণ্ড মার। মড়া মনে করেই বোধহয় ওদের ফেলে রেখে গিয়েছিল। আর ওদেরকে মেরে আমার গাড়ি নিয়েই লোকটা গতরাতে রিসার্চ সেন্টারে ঢুকেছিল।'

'কিন্তু ওদের পেল কোথায়?'

'ওরা সেন্টারের পিছনে এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিল।'

'উদ্দেশ্য?'

'সবটা জানতে চেয়ো না। কিন্তু উদ্দেশ্যটা অসৎ ছিল না। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় আমার উপর একটা কর্তব্য চাপিয়ে গেছেন। সেই কর্তব্য পালন করতেই আমাকে হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। সর্বনাশ অবশ্য তার আগেই হয়ে গেছে সকলের অলক্ষ্যে। ফলে আমার কাজটা অনেক বেড়ে গেছে।'

'সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কি ড. লোকমান হাকিম?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'না। তাকে আমি দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর দু'মাস পরে অর্থাৎ এখন থেকে একমাস আগে আমি রিসার্চ সেন্টারে যাই। বাই দ্য ওয়ে, ড. লোকমান হাকিমের মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছ?'

'না তো। শুনেছি, মোটর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে উনি মারা গেছেন।'

'ব্যাপারটা আংশিক সত্য।'

'কি রকম?'

'ঘটনাটা ঘটেছিল রাতে। উনি গাড়ি চালাতে জানতেন না। ড্রাইভারই চালাত। নতুন এক ড্রাইভার তাঁকে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। গাড়িটা হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা খালের মধ্যে পড়ে যায়। পরদিন তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার হয়। কিন্তু ড্রাইভারের খোঁজ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।'

শহীদ অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু সে ঘটনা তো আমায় কেউ বলেনি!'

'শুধু এই নয়। পাঁচদিন পর সেই ড্রাইভারের লাশও পাওয়া গেল এক ইটের পাঁজার নিচে। পুলিস অবশ্য লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আমি অন্য সূত্রে

জেনেছি। আসলে রিসার্চ সেন্টারে তখন থেকেই এই খেলা শুরু হয়েছে। তবে নায়ক ধীরে-সুস্থে, সাবধানে এবং কারও সন্দেহের উদ্রেক না করে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ আমার আবির্ভাব ঘটায় এইসব নাটকীয় ঘটনা শুরু হয়ে গেছে। সে হয়ত ভাবতেও পারেনি যে, কেউ তার এলাকায় নাক গলাবে।'

'কিন্তু এই আসুরিক চেহারার মানুষের ব্যাপারটা কি?'

'দুপুরে তো ড. রাজীর সাথে তোমার অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছে। এখন একটু গভীর ভাবে চিন্তা কর। পরিষ্কার হয়ে যাবে,' সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল কুয়াশা।

শহীদ ভাবতে লাগল এবং একটু পরেই তার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিজের উপর তার রাগও হল সঙ্গে সঙ্গে। আগেই তার চিন্তা করা উচিত ছিল। তাহলে অন্ধকারে হাতড়াতে হত না।

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমি তাঁর সাথে কি আলাপ করেছি তা তো তোমার জানার কথা নয়?'

'উচ্চারিত অনেক কথাই জানবার নানা সহজ ব্যবস্থা আছে এ যুগে। ব্যবস্থা নেই শুধু অনুচ্চারিত চিন্তাটা জানবার।'

আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল শহীদের।

কুয়াশা ঘড়ি দেখে বলল, 'আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমাকে এখুনি একটা জরুরী কাজে যেতে হবে। সাবধান থেকো তোমরা। তোমাদের সাফল্য কামনা করি।' দরজা খুলে রাস্তায় নামল সে।

'এই ভেজা কাপড়-চোপড় পরে আর কোথায় যাবি, এখন বরং বাসায় ফিরে চল।'

'ড. রাজীর সাথে একবার দেখা করতে হবে। ওঁকে কতকগুলো জরুরী প্রশ্ন করতে হবে,' শহীদ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল।

ড. রাজী বাড়িতেই ছিলেন। একটু আগেই তিনি ফিরে এসেছেন।

শহীদকে ড্রইংরুমে বসালেন তিনি। চায়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে তিনি কাপড়-চোপড় বদলে এসে বসলেন।

ড. রাজীর মেয়েও এসে বসল।

'কোন হদিস পাওয়া গেল, শহীদ সাহেব?' ড. রাজী শুধোলেন।

'এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। তবে এগোচ্ছি দ্রুত। কালপ্রিট আমাকে ইতিমধ্যেই শাসিয়েছে,' নির্বিকার গলায় বলল শহীদ।

'কি রকম?'

টেলিফোনের ঘটনা বিবৃত করল শহীদ।

'ভয়ঙ্কর লোকের পাল্লাতেই পড়া গেছে,' শুকনো গলায় বলল রোকেয়া।

ড. রাজী বললেন, 'ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের চীফ চৌধুরী গোলাম হাক্কানী সাহেব

এসেছিলেন। উনি নিজেই তদন্ত করবেন।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব।'

'আপনাদের সম্মিলিত প্রয়াস ফলপ্রসূ হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র মানবতার উপর ভবিষ্যতে কবে কোন বিপর্যয় নেমে আসবে কে তা বলতে পারে।'

'আপনাকে একটা প্রশ্ন আমার করার ছিল। আশা করি, আপনাদের গবেষণা সম্পর্কে মিস রাজীর সামনে আলোচনায় আপত্তি নেই।'

'বিন্দুমাত্র না। মা আমাদের সব কিছুই জানে।'

'আপনাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি প্রয়োগে সুপারম্যানের জন্ম দেওয়া সম্ভব?'

'অবশ্যই সম্ভব।'

'তেমনি ঐ পদ্ধতিতেই কি মানুষের চেহারার বিশালকায় কোন প্রাণীর জন্মদান সম্ভব নয়?'

ড. রাজী চমকে উঠলেন। পলকহীন দৃষ্টিতে শহীদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'এ সম্ভাবনার কথা আমার অনেক আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। আশ্চর্য, এটা আপনার মাথায় এল অথচ আমি আকাশ-পাতাল ভেবে মরছি। আমার একবারও একথাটা মনে হয়নি।'

'তাহলে সম্ভব বলতে চান?'

'অবশ্যই সম্ভব। বস্তুত মানুষকে নিয়ে হাজারোটা এক্সপেরিমেন্ট করার অবকাশ আছে আমাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি প্রয়োগে। মানুষকে যেমন দেবতা বানানো চলে, তেমনি শয়তান বানানো চলে। নির্বোধ দাস মনোবৃত্তির মানুষ জন্ম দেওয়া যায় এবং শুধু মানুষ নয় যে-কোন প্রাণী এবং অনেক গাছের ক্ষেত্রেও নানা রূপান্তর সাধন সম্ভব।'

'তাহলে আপনি কি এমন কোন প্রাণী কল্পনা করতে পারেন, যার আকার হবে মেঘনাদের মত অথচ যে বাধ্য হবে আলাদীনের দৈত্যের মত?'

'অবশ্যই।'

রোকেয়া এতক্ষণ অবাক হয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। সে বলল, 'আপনার কি ধারণা, এক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছে?'

'আমি নিশ্চিত নই, তবে ঐ রকম একটা সন্দেহ আমার মনে জেগেছে।'

'কিন্তু তার মানেটা কি দাঁড়াল ভেবে দেখেছেন নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। মানেটা দাঁড়াল এই যে, আপনাদের এই আবিষ্কার কোন নতুন ঘটনা নয়। কেউ এর আগেই এই ব্যাপারে সফল হয়েছে এবং দীর্ঘদিন কালচার করে ঐ দৈত্যাকার প্রাণী উদ্ভাবন করেছে। এবং শুধু তাই নয়, আপনারা যে আশঙ্কা করছিলেন সেই আশঙ্কাটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।'

ড. রাজী এতক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। তিনি বললেন, 'শহীদ সাহেব, আপনার ধারণা যতদূর মনে হয় সত্য। এছাড়া ঐ অতিকায় মানবের কোন

যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে না।'

'যে ঐ প্রাণীকে ডেভলপ করেছে সে এক অসামান্য প্রতিভা। সে নিজে ঐ বিদ্যা আয়ত্তে এনেছে এবং আপনাদের গবেষণা সম্পর্কেও জানতে পেরেছে কিন্তু সে চায় না যে, অন্য কেউ এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করুক। তাই সে আপনাদের পিছনে লেগেছে। বুঝতেই পারছেন আপনাদের শত্রুপক্ষ কি অসীম শক্তির অধিকারী। তার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হবে,' শহীদ বলল।

ড. রাজী বললেন, 'আপনাকে একটা ঘটনা জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি।'

'বলুন।'

জাকের চা নিয়ে এল এই সময়। টেবিলের ওপর সরঞ্জাম রেখে চলে গেল সে। রোকেয়া চা তৈরি করে এগিয়ে দিল।

ড. রাজী বললেন, 'মাস খানেক আগে এক আমেরিকান রিসার্চ সেন্টারে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে জানাল যে, সে-ও জেনেটিকস সম্পর্কে গবেষণা করছে। আমরা তাকে আমাদের গবেষণা সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে তাকে সাহায্য করতে পারি কিনা জানতে চাইল। আমি পরিষ্কার জানালাম যে, এটা একটা মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার। দেশি উদ্ভিদ থেকে ওষুধ তৈরি সম্পর্কে এখানে গবেষণা করা হয়। জেনেটিকস সম্পর্কে কোন রিসার্চ এখানে হয় না।

'ভদ্রলোক বিশ্বাস করল না বোঝা গেল তার চাহনিতে। সে জানতে চাইল, আমি লুকম্যান এইচ কিম নামে কাউকে চিনি কিনা। তিনি নাকি এক প্রতিভাধর বিজ্ঞানী এবং তিনি বিখ্যাত জার্মান জেনেটিকস সায়েন্টিস্ট ম্যানফ্রেড শেলবুর্গের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মি. কিম দেশে ফিরে সম্ভবত একটা জেনেটিকস গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। তার যতদূর বিশ্বাস ড. লোকমান হাকিমই হচ্ছে লুকম্যান এইচ কিম এবং তিনি এখানেই কোথাও একটা জেনেটিকস গবেষণাগার স্থাপন করেছেন এবং সেই লুকম্যান এইচ কিম নাকি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হবার কিছুদিন পরে একটি জার্মান শিশুকে পালকপুত্র করে এনেছিলেন।

'আমি এসব ব্যাপার আদৌ জানি কিনা সে জানতে চাইল। আমি স্রেফ অস্বীকার করলুম, তবে একথা ঠিক যে, ড. লোকমান হাকিম কখনও লুকম্যান এইচ কিম নামে পরিচিত ছিলেন কিনা এবং তিনি কোন পালকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা আমি সত্যি জানতাম না।

'যতদূর জানি, তিনি এক জার্মান মহিলার পাণি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠায় দেশে ফেরার সময় একাকীই ফিরেছিলেন। স্ত্রীকে আনতে পারেননি। যুদ্ধ শেষ হবার পরে তিনি স্ত্রীকে খুঁজতে জার্মানি গিয়েছিলেন বটে কিন্তু ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। তারপর তিনি আর বিয়ে করেননি। জার্মানি থেকে তিনি কোন শিশুও সঙ্গে নিয়ে আসেননি, অন্তত আমি এ সম্পর্কে কিছু শুনিনি।'

'সেই আমেরিকান ভদ্রলোকের নাম কি?'

'ডিউ ম্যানসেন। সে আমার সাথে মাত্র একবার দেখা করলেও তাকে আমি রিসার্চ সেন্টারের কাছে-পিঠে বেশ কয়েকবার দেখেছি। আমাদের অনেক স্টাফের সঙ্গেও কথা বলতে দেখেছি তাকে। অবশ্য এখন আর তাকে দেখি না।'

'ক'দিন আগে এ ঘটনা ঘটেছে?'

'মাত্র একমাস আগে।'

'মানে, ড. হাকিম মারা যাবার দু'মাস পরে?'

'হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে। আমার এখন মনে হচ্ছে, ঐ আমেরিকান ভদ্রলোকই আসল অপরাধী।'

'ভদ্রলোক আর কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনাকে?'

'পালক পুত্রের কথাটাই বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

চা শেষ করে সিগারেট ধরাল শহীদ। কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টেনে বলল, 'শুনেছি ড. হাকিমের মৃত্যুটাও নাকি রহস্যজনক?'

চমকে উঠলেন ড. রাজী।

'ড. হাকিমের মৃত্যু রহস্যজনক!' আবৃত্তি করলেন তিনি। 'না তো, ওটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস, মোটর দুর্ঘটনা। রাস্তার পাশে খালের মধ্যে গাড়ি পড়ে গিয়েছিল। তবে ড্রাইভারটা প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল এবং পালিয়েও গিয়েছিল সে।'

হাসল শহীদ।

'সে ড্রাইভারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল পরে?'

'না, পাওয়া যায়নি। তবে পুলিস চেষ্টার ত্রুটি করেনি।'

'আপনি হয়ত জানেন না যে, পাঁচদিন পরে সেই ড্রাইভারের লাশ পাওয়া গিয়েছিল এক ইটের পাঁজার তলা থেকে।'

ড. রাজী ভীষণভাবে চমকালেন। দু'চোখে গভীর বিস্ময় নিয়ে তিনি শহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাকস্ফূর্তি হল না। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

রোকেয়া বিস্ময়ে অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন বলে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে ড. রাজী বললেন, 'কিন্তু পুলিস তো কিছু জানায়নি?'

'কারণ, পুলিস লাশটা সনাক্ত করতে পরেনি, আমি জানতে পেরেছি এক গোপন সূত্রে।'

ড. রাজী বললেন, 'তাহলে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়?

'ওটা পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আপনাদের রিসার্চ সেন্টারে নাটক শুরু হয়েছে অনেক আগেই। এখন সেটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।'

'কিন্তু কি ট্র্যাজিক পরিণতি!' রোকেয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল।

রাতে সাবধানে থাকতে বলে শহীদ ও কামাল বিদায় নিল। বাইরে তখনও হাওয়ার মাতামাতি চলছে। কিন্তু বৃষ্টি ছিল না। ওরা পথে নামতেই আবার

মুষলধারে বর্ষণ শুরু হল।

বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত পথে গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলল। পথটা একেবারে নির্জন। লোক চলাচল নেই। যানবাহন নেই। যেন নির্জন এক প্রান্তরে ওরা দু'জন মাত্র প্রাণী অনন্তের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

নীরবে অনেকটা পথ পার হয়ে এল। উঁচু পথের দু'ধারে ফাঁকা মাঠ। দূরে একটা বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। কোন কারখানা হবে ওটা। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়।

কেউ কথা বলছিল না। শহীদ সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে স্টিয়ারিং ধরে। গাড়ি ছুটে চলেছে সবেগে। দূরে পথের পাশেই একটা বিরাট বটগাছ দেখা যাচ্ছে।

কামাল সিগারেট বের করল। মাথা নিচু করে সিগারেট ধরাতে যেতেই হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা থেমে গেল, লাফিয়ে উঠল অনেকটা। আকস্মিক ঝাঁকুনিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না কামাল। আসন থেকে তার দেহটা উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাথায় আঘাত লাগল। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে সামনের দিকে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেল। বটগাছের বিরাট একটা ডাল রাস্তার উপর পড়েছে। একেবারে পড়ে যায়নি। তখনও ডালটার নিম্নমুখী গতি অব্যাহত আছে।

অথচ আশ্চর্য এই একটু আগেও সে রাস্তাটা ফাঁকা দেখেছিল। আসন্ন বিপর্য-য়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে কামাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'উহ্, বাবা বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে গাড়িটা থামিয়েছিলি। না হলে নির্ঘাৎ মরতে হত।'

শহীদ জবাব দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কিরে, হাঁ করে দেখছিস কি?'

'বিপদ যায়নি। কেবল শুরু হল। খুব সাবধান। আমরা ফাঁদে পড়েছি। এই নে রিভলভারটা রাখ। গুলি বেশি নেই।' কামাল তখন পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুমান করতে পারেনি। কিন্তু শহীদের কথায় তার ইন্দ্রিয়গুলো তখনি সজাগ হয়ে গেছে।

তবু সময় পাওয়া গেল না, কানের কাছে জানালার কাঁচের উপর যেন বাজ পড়ল। গুলি ছুঁড়েছে কে যেন পিছনের জানালায়, ঝনঝন করে গাড়ির পিছনের দু'দিকের জানালা ভেঙে গেল।

ওরা থমকে পিছনে তাকাল। সারামুখ মুখোশে ঢাকা একটা লোক, ডান হাতে উদ্যত রিভলভার।

'হাত তোল দু'জনেই। এই মুহূর্তে।'

রিভলভারটা স্পর্শ করারও সুযোগ পেল না কামাল।

শহীদ হাত তুলল। চাপা স্বরে কামালকে বলল, 'হাত তোল, কামাল। না হলে গুলি করবে।'

কামালও হাত তুলল।

'বেরিয়ে এস। উঁহুঁ, এই দরজা দিয়ে। খুলে দিয়েছি আমি দরজা।'

নিরীহ শিশুর মত দু'জন হাত শূন্যে তুলে রাস্তার উপর দাঁড়াল।

বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে দুটো রুমাল বের করল লোকটা। বৃষ্টি-সিক্ত পথের উপর রুমাল দুটো ফেলে দিয়ে বলল, 'রুমাল দুটো দিয়ে চোখ বাঁধ দু'জন। ভয়ে হার্টফেল করে মারা যাও, এটা আমি চাই না। তোল রুমাল।'

উবু হয়ে রুমাল তুলে নিল শহীদ ও কামাল।

'বাঁধ চোখ। হ্যাঁ, খুব ভাল করে বাঁধ। কুইক।'

শহীদ নিরীহ শিশুর মত আজ্ঞা পালন করলেও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মুখোশধারীর উপর। মুখটা দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু তার হাত নাড়া ও হাঁটার ভঙ্গিটা সে লুকোতে পারছে না। হ্যাঁ, শহীদ ঐ ভঙ্গিটা চেনে, ভাল করেই চেনে। যদিও বেশিক্ষণের জন্যে সে দেখেনি তবু লোকটা তার অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ওর মুখোশধারণ বৃথাই হয়েছে। ঠোঁট কামড়াল শহীদ। মনে মনে বলল, 'বাছাধন, তোমাকে আমি চিনেছি। হয়ত এত শীঘ্রি তুমি ধরা পড়তে না। কিন্তু তোমার দুঃসাহস আর অপরিসীম আত্মবিশ্বাসই তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি চিনে ফেলেছি তোমাকে। আমার ভুল হয়নি।'

রুমাল দিয়ে চোখ বাঁধল শহীদ। লোকটার কবল থেকে এখন মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। সন্দেহজনক কিছু একটা করে বসলে গুলি ছুঁড়বে লোকটা। কিন্তু সুযোগ কি একবারও আসবে না? দেখা যাক।

রুমাল বাঁধা শেষ হতেই লোকটা বোধহয় তা পরীক্ষা করে দেখল। তার কণ্ঠ শোনা গেল, 'চমৎকার।'

পরমুহূর্তেই লোকটা চীৎকার করে উঠল, 'পেদ্রো!'

ওরা কিছু দেখতে পেল না। বৃষ্টির শব্দে অন্য কোন শব্দও শুনতে পেল না। কিন্তু উপলব্ধি করল, কে যেন কাছে এসে দাঁড়াল।

'রিভলভারটা এমনিভাবে তাক করে ধর।'

পরের মুহূর্তে মুখোশধারীর কণ্ঠ শোনা গেল।

'হাত দুটো নামাও, পিছনে রাখ।' শহীদ বুঝল, নির্দেশটা দেওয়া হচ্ছে কামালকে।

পিছমোড়া করে শহীদ ও কামালের হাত বাঁধল মুখোশধারী।

'গাড়িতে তুলে দে।'

টান লাগল শহীদের চুলে। কয়েকটা চুল বোধ হয় উপড়েও গেল। গাড়ির দরজায় নাকের আঘাত লাগল। ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারল কে যেন। শক্ত লোহার মত বিরাট থাবা লোকটার। এ নিশ্চয়ই সেই অতিকায় মানুষটা। একটু পরে কামাল হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর গায়ের ওপর।

ছয়

সেই রাতেই।

আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে। বৃষ্টি আর হাওয়ায় চলছে মাতামাতি। ওয়াপদার বাতিগুলো বোধহয় অন্ধকারের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যে কুয়াশা ও কলিম ভিজতে ভিজতে গিয়ে দাঁড়াল ড. রাজীর বাড়ির পিছনে। কলিমকে সেখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে কুয়াশা বাড়ির ভিতরে ঢুকল। এদিকটা ছোটখাটো একটা বাগানের মত। পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। দোতলার জানালাগুলো সব বন্ধ। শুধু একটা মাত্র জানালা খোলা। ম্লান নীল আলো দেখা যাচ্ছে খোলা জানালা দিয়ে। খুশিই হল কুয়াশা। ঐ রুমটাতেই আছে ড. রাজীর সদ্য প্রত্যাগত মেয়ে রোকেয়া এবং সে জানে, রোকেয়ার হাতেই ড. রাজী সঁপে দিয়েছেন তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

জানালাটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। পকেট থেকে রিভলভার বের করে দুই পাটি দাঁতের ফাঁকে বসিয়ে পাইপ বেয়ে দ্রুত উঠে গেল সে। পাইপ থেকে জানালার দূরত্ব দেড় হাতের মত। এক হাতে পাইপে ভর দিয়ে সে ঝুঁকে খোলা জানালার মধ্য দিয়ে ভিতরে তাকাল। অনুজ্জ্বল নীল আলোয় মশারীটা দেখা গেল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। কেউ জেগে আছে বলে মনে হল না।

জানালার কার্নিসের উপর উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। কোমর থেকে আল্ট্রাসোনিক্স বক্স বের করে জানালার শিকের নিচে স্থাপন করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শিকটা গলে গেল। আরও একটা শিক কাটল সে। তারপর শিক দুটো উপরের দিকে বাঁকিয়ে বাক্সটা কোমরের সাথে অ্যাডজাস্ট করে মেঝের উপর গিয়ে দাঁড়াল।

চারদিকে তাকাল কুয়াশা একবার। তারপর মশারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে ধীরে ধীরে। ম্লান নীল আলোয় নাইলনের মশারীর ভিতর দিয়ে দেখা গেল সায়া ও ব্লাউজ পরে এক যুবতী ঘুমোচ্ছে। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে বুকটা ওঠা-নামা করছে। বড় বড় চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আছে। কয়েক গুচ্ছ কোঁকড়া চুল প্রশান্ত কপাল ছুঁয়ে গালের উপর এসে পড়েছে। সে এগিয়ে গেল কোণের ক্লজিটটার দিকে। ঘড়ি দেখল একবার। আল্ট্রাসোনিক্স বাক্সটা কোমর থেকে খুলে অন করে ক্লজিটটার চাবির গর্তে চারদিকে ঘোরাতে লাগল। ধীরে ধীরে ক্লজিটের গায়ে একটা ফোকর সৃষ্টি হল। বাক্সটা কোমরে আটকে ক্লজিটের গায়ে সৃষ্ট ফোকরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল।

দশ মিনিট ধরে ক্লোজেটের মধ্যে আতিপাতি করে উদ্দিষ্ট বস্তু খুঁজল কুশায়া। না, কোথাও নেই সেই নোট-বইটা যেটা ড. রাজী দুপুরে রিসার্চ সেন্টার থেকে ফিরে এসেই তাঁর মেয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ক্লজিটের মধ্যে নেই।

টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখা বইগুলো দ্রুত উল্টিয়ে গেল। সেখানেও নেই। বইয়ের র‍্যাকের দিকে এগোল সে। র‍্যাকে অসংখ্য বই। অত বই এক পৃষ্ঠা করে উল্টে দেখতে সারারাত লাগবে। আর বেশিক্ষণ দেরি করলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ড. রাজী বা তাঁর মেয়ের হাতে নয়। পুলিসের হাতেও নয়। সেই লোকটার হাতে। সে-ও তো একই বস্তুর খোঁজ করছে।

চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কুয়াশা। খাটের নিচেও দেখল। একেবারে শূন্য। বাথরুমটা ঘুরে এল। নেই, কোথাও নেই তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাহলে তার অভিযান কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? সেই লোকটা কি আগেই নিয়ে গেছে?

রুমের এক কোণে পুরানো খবরের কাগজ জড় করা ছিল। সেদিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা। কাগজগুলো দেখল উল্টেপাল্টে। না, সেখানেও নেই। কয়েকটা পুরানো মলাটহীন ইংরেজি সাময়িকী চোখে পড়ল। একটার পাতা উল্টিয়ে সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেখল। আরেকটা সাময়িকী খুলতেই ছোট কয়েক টুকরো টাইপ করা কাগজ মেঝেতে পড়ে গেল। কাগজগুলো চোখের সামনে তুলে ধরতেই কুয়াশার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাদবাকি সাময়িকীগুলোর ভিতরেও কয়েক টুকরো করে টাইপকরা কাগজ পাওয়া গেল।

নম্বর দেখে পাতা মিলিয়ে কাগজের টুকরোগুলো সে পকেটে ফেলল। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠিক দুই মিনিট পরে সে পাঁচিলের কাছে পৌঁছুল। বৃষ্টি এখন কমেছে। পথে বাতি জ্বলছে। অন্ধকারটা এখন ফিকে। কিন্তু হাওয়ার গতি কমেনি।

চাপা স্বরে কুয়াশা ডাকল 'কলিম।'

কোন জবাব এল না। কুয়াশার ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই। আঘাতও নেমে এল সেই মুহূর্তেই। প্রচণ্ড একটা ঘুসি এসে লাগল তার চোয়ালে। আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতার জন্যে কুয়াশা সে ধাক্কা সইতে পারল না। কাত হয়ে পড়ে গেল দেয়ালের উপর। ইটের উপর গিয়ে পড়ল মাথাটা। দ্বিতীয় দফা আঘাত নেমে আসছে। কোনদিক থেকে আসবে তা ঠাহর করার আগেই আঘাতকারী তার চিবুক লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল। কিন্তু কুয়াশা যে-কোন দিক থেকে আঘাত আশা করছিল এবং তা মোকাবেলা করার জন্যে তখন সে প্রস্তুত ছিল। পা'টা উঠে আসতেই সে হামলাকারীর পা'টা সামনের দিকে সামান্য টান দিয়ে গড়িয়ে সরে গেল। চিতপটাং হয়ে পড়ে গেল আক্রমণকারী। কুয়াশা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে লোকটার মুখ দেখা গেল না। কেবল একটা ছায়ার মত দেখা গেল লোকটাকে। লোকটার উঠবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল কুয়াশা। কিন্তু সে উঠল না দেখে

সে আরও সতর্ক হয়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই কোন আগ্নেয়াস্ত্র বের করছে। সে সুযোগ তাকে দেওয়া চলবে না।

লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কিন্তু সে প্রস্তুত ছিল। শূন্যে পা তুলে দিয়ে কুয়াশাকে লক্ষ্য করে একটা লাথি হাঁকাল। কাত হয়ে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা এবং লোকটার জুতো ধরে পা'টা গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে মুচড়ে দিল। আশ্চর্য, লোকটা একটু শব্দও করল না। যেন সমস্তটা ব্যাপারই সে সহজভাবে নিচ্ছে। যেন সে কুয়াশাকে নিয়ে খেলাচ্ছে।

লোকটা উঠবার চেষ্টা করছে না কেন? অথচ কুয়াশা জানে, ওর উপর এভাবে হামলা করতে গেলে লাভ হবে না। বরং সে উঠে দাঁড়ালেই কাবু করা সহজ হত। কিভাবে লোকটাকে কায়দায় ফেলবে চিন্তা করতে লাগল সে। হঠাৎ সে শব্দ শুনে টের পেল, লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এই তো সুযোগ। একটু পাশ কাটিয়ে কুয়াশা ডান পা'টা লোকটার চোয়ালের দিকে চালান করে দিল। লোকটা বোধহয় এই আঘাত আশা করেনি। সে একটু কাত হতেই দ্বিতীয় দফা লাথি চালাল কুয়াশা। আবার চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। কুয়াশা ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার পেটের উপর দু'হাঁটু একত্র করে।

'কোঁক' করে একটা শব্দ হল। দু'হাতে লোকটার টুঁটি চেপে ধরতে যেতেই লোকটা চাপা কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, 'পেদ্রো।'

চমকে উঠল কুয়াশা। সর্বনাশ, দৈত্যটাকে ডাকছে নিশ্চয়ই লোকটা।

পাঁচিলের উপর থেকে কে যেন লাফ দিয়ে নামল। কুয়াশা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, যেন একটা পাহাড় নেমে আসছে তার দিকে নিষ্ঠুর নিয়তির মত। এখুনি এসে চেপে ধরবে। তাকে ধ্বংস করে দেবে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে দ্রুত…অতি দ্রুত।

তবু টুঁটি চেপে ধরল কুয়াশা লোকটার। মৃত্যুর আগে সে-ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। পড়ে পড়ে মার খেতে সে রাজী নয়।

ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবটা কুয়াশার উপর। হিংস্র বাঘ যেন নিরীহ ভেড়ার উপর আক্রমণ চালাল। এক লাথিতেই কুয়াশা চিত হয়ে পড়ে গেল ঘাসের উপর। মুখোশধারী উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

'টুঁটি চেপে ধর। শেষ করে দে।'

সাঁড়াশির মত দুটো হাত কুয়াশার কণ্ঠ চেপে ধরল। কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে কুয়াশার। আহ্, মৃত্যু আসছে। কুয়াশা মরতে চলেছে। ধীরে ধীরে কুয়াশার দেহ অবশ হয়ে আসছে। চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছে।

কিন্তু ও কি? ফট করে যেন পটকা ছুঁড়ল না? হ্যাঁ…পটকার আওয়াজ আসছে।

…কে যেন তাকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। কে? আহ্, স্বপ্ন দেখছিলাম নাকি? চোখ খুলল কুয়াশা, চারদিকে অন্ধকার। কে যেন তাকে ডাকছে। ভাইয়া

ভাইয়া…।

'কে? মহুয়া?'

'ভাইয়া, উঠুন। এখনি লোকজন এসে পড়বে। তখন পালানো যাবে না, উঠুন।'

'কে?' কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'আমি কলিম। উঠুন, ওরা পালিয়ে গেছে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল কুয়াশা। তার পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছে। মুহূর্তেই তার সমস্ত ঘটনা মনে পড়ল। আর একদণ্ডও এখানে নয়। উঠে দাঁড়াল সে। সমস্ত শরীরে তীব্র বেদনা, কিন্তু উপায় কি? এখান থেকে পালাতে হবে।

কুয়াশা ডাক দিল, 'কলিম।'

'জ্বি।'

'ওরা কোথায়?'

'পালিয়েছে, আমি গুলি করেছিলাম। গুলি বোধহয় অন্ধকারে ওদের গায়ে লাগেনি।'

পকেটে হাত দিল কুয়াশা। আছে, সেই মূল্যবান কাগজগুলো আছে, নিতে পারেনি শয়তানটা। তার অভিযানকে ব্যর্থ করতে পারেনি সে। কিন্তু আল্ট্রাসোনিক্সের বাক্সটা নিয়ে গেছে।

তা যাক।

'চল, পালাতে হবে এখুনি। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, ওরা হয়ত ধারে কাছেই আছে। আবার আঘাত হানতে পারে।'

'হাঁটতে পারবেন?'

'পারতেই হবে। আমার যে অনেক কাজ।'

কুয়াশা ২৭

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট ১৯৭০

এক

তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে কুয়াশার গাড়ি।

অন্ধকার শালবনের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা মসৃণ পথে আর তার দু'পাশের ঘন জঙ্গলের উপর আলোর ঢেউ তুলে ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চলেছে কুয়াশার জোডিয়াক। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে যেন দুটো আলোর সমান্তরাল বৃত্ত নেচে চলেছে। পাশের আসনে বসে আছে কলিম। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। হাতে গুলি-ভরা পিস্তল। সবগুলো ইন্দ্রিয় হুঁশিয়ার। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে হামলা আসতে পারে। তার জন্যে সে প্রস্তুত।

মাইল বিশেক যাবার পর গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এল। চারদিকে সতর্কদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে গাড়ি থামাল কুয়াশা। পকেট থেকে সরু পেন্সিল-টর্চটা বের করে দরজা খুলে নেমে পড়ল সে।

কলিম চাপা স্বরে বলল, 'আমরা ঠিক জায়গাতেইএসেছি, ভাইয়া। আপনি দাঁড়ান, আমি গাড়িটা রেখে আসছি।'

'কিট আনতে ভুলিসনে যেন।'

'আচ্ছা।'

ড্রাইভারের আসনে সরে এসে বসল কলিম। গাড়িটায় স্টার্ট দিল সে। একটু এগিয়ে গিয়ে সাবধানে পথের পাশে নামিয়ে দিল গাড়িটা।

কুয়াশা সরু পেন্সিল-টর্চ জ্বেলে কাছেই ঝোপ-ঝাড়গুলো দেখছিল। কালো চকচকে একটা বস্তুর উপর আলো পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল কুয়াশার চোখ দুটো। কালো রং-এর বস্তুটা একটা ফোক্সওয়াগেন। রংটা অবশ্য আসলে কালো নয়। ঘন নীল। রাতে কালোই দেখাচ্ছে।

আবার পথের উপর উঠে এল কুয়াশা। কিট হাতে ততক্ষণে কলিমও এসে গেল।

'চল।'

'এসেছে তো?'

'হ্যাঁ। তুই আমার পিছনে থাকবি। পিস্তল হাতে রাখবি।'

'চলুন।'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নীরবে দু'জন এগোতে লাগল সরু পেন্সিল-টর্চের আলোয়।

মিনিট পনের পরে দু'জন গিয়ে দাঁড়াল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। আরও একটু সামনে এগোল দু'জন। অন্ধকার এখানে একটু ফিকে। জঙ্গলের মধ্যে শালবনের পাতার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। জ্যোৎস্নার ম্লান রেখা ডালপালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে ওদের চোখে-মুখে।

যেখানে গিয়ে কুয়াশা ও কলিম দাঁড়াল সেখান থেকে তিরিশ গজ দূরে একটা দালান দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় এই গভীর অরণ্যে দালানটাকে একটা ভূতুড়ে বাড়ির মত লাগছিল। অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা গেল, পুরানো অতি জীর্ণ দালানটা। কে জানে কে, কবে, কি কারণে এই জঙ্গলের মধ্যে দালানটা তুলেছিল।

পোড়োবাড়িটা ঘিরে চারদিকে দশগজ দূরে কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার খুব কাছে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা ও কলিম।

অন্ধকার দালানটায় কোন আলোর রেশ দেখা গেল না। চারদিকে গভীর নৈঃশব্দ। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যায়।

কুয়াশা চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে চাপা স্বরে বলল, 'কলিম, এসে পড়েছি। কিন্তু এদিকে চাঁদের আলোয় কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। আমাদের ঢুকতে হবে পূর্বদিক দিয়ে। আয়।'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দু'জন পূর্বদিকে এগিয়ে এল।

পোড়োবাড়িটার ছায়া এসে পড়ায় পুবদিকে অন্ধকারটা একটু গভীর। দু'জন কাঁটাতারের বেড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কুয়াশা বলল, 'কাঁটাতারের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে ৪৪০ ভোল্টের বিদ্যুৎ। স্পর্শ মাত্রই সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যাবে। আর ওর সাথে আছে বৈদ্যুতিক ঘন্টার ব্যবস্থা। স্পর্শের সাথে সাথেই দালানটার ভিতরে কোথাও বৈদ্যুতিক ঘন্টা বেজে উঠবে। সুতরাং প্লায়ার্স দিয়ে কাঁটাতার কাটতে গেলে বিপদ ডেকে আনা হবে। আমাদের উপস্থিতি জানাজানি হয়ে যাবে।'

'তাহলে উপায়?'

'মাটিতে গর্ত কেটে, সোজা কথায় সিঁদ কেটে ভিতরে ঢুকতে হবে। শাবলটা বের কর। আমি ব্যবস্থা করছি। তুই চারদিকে চোখ রাখিস।'

নরম ভেজা মাটি। কিন্তু গাছপালার শিকড় থাকায় গর্ত খুঁড়তে অসুবিধে হচ্ছিল। তবু যতটা সম্ভব দ্রুত হাত চালাল কুয়াশা। সবচেয়ে নিচের কাঁটাতারটা মাটি থেকে আঙুল ছয়েক উঁচুতে। সুতরাং গর্তটা গভীর হওয়া দরকার। প্রায় পনের মিনিট ধরে গর্ত খুঁড়ল কুয়াশা। দু'জন মিলে মাটি সরিয়ে ফেলল।

শাবলটা কিটের মধ্যে রাখল কলিম।

এক মিনিটের মধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে দালানটার প্রাঙ্গণের মধ্যে

পৌঁছে গেল দু'জন। প্রাঙ্গণটা দ্রুত পায়ে অতিক্রম করে দালানটার অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কোণে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন।

কান পেতে রইল দু'জন। কোন শব্দ আসছে কি? জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল কুয়াশা। দালানের ছায়াটা জঙ্গলের মধ্যে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার ঠিক উপরেই গাছের পাতার উপর যেন একটা ছায়া নড়ে উঠল। ছায়াটা যেন উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

কুয়াশা কলিমের কানে কানে বলল, 'ছাদে মানুষ আছে। দালানের সাথে গা মিশিয়ে দে। আর কোন শব্দ যেন না হয়, সাবধান।'

কুয়াশা দেখল, ছায়াটা আবার দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে চলে গেল। তারপর আর ছায়াটাকে দেখা গেল না। প্রায় পনের মিনিট দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। তারপর কুয়াশা বলল, 'চল এবার। আমাদের ছাদের উপরেই উঠতে হবে। অন্য পথগুলো এখন নিরাপদ নয়। এই যে পাইপটা। আমি আগে উঠি। তুই পরে আয়। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নে।'

কুয়াশা দ্রুত পাইপ বেয়ে উঠে গেল। মাথাটা একটু বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কেউ নেই ছাদে। রেলিং টপকে ছাদে লাফ দিয়ে নামল সে। একটু পরেই কলিমও গিয়ে নামল ছাদের উপর।

চারদিকে পর্যবেক্ষণ করল কুয়াশা। কেউ কোথাও নেই। চিলেকোঠার দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজাটা বন্ধ। পুরানো আমলের জীর্ণ দরজা। কলিম কিট থেকে একটা পাতলা ইস্পাতের পাত বের করে পাল্লার উপর দিকে ঢুকিয়ে আস্তে মোচড় দিতেই কট করে একটা শব্দ হল। খুলে গেল দরজাটা। এক ঝলক চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির উপর।

সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা কয়েক মিনিট। কলিম ইস্পাতের পাতটা কিটে পুরে পিস্তলটা ডান হাতে তুলে নিল। কলিমকে অনুসরণের জন্যে ইশারা করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল কুয়াশা।

নিচে দালানের মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সরু টর্চের আলো জ্বেলে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল দু'জন। দু'দিকে দেয়াল। মাঝখান দিয়ে সরু প্যাসেজ। দু'বার মোড় নিতে হল ওদের। তারপর ওরা গিয়ে দাঁড়াল অন্ধকার প্যাসেজের শেষপ্রান্তে। সামনে বিশালকায় এক দরজা। টর্চের আলোয় বোঝা গেল দরজাটা ইস্পাতের। কুয়াশা কলিমের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'আল্ট্রাসোনিক্সের বাক্সটা বের কর।'

কিন্তু বের করতে হল না। তার আগেই কে যেন ওদের খুব কাছে থেকে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। দীর্ঘ একটানা হাসি। চমকে উঠল কুয়াশা। কেঁপে উঠল কলিম। সে কম্পিতকণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, 'ভাইয়া, বোধহয় ধরা পড়ে গেছি।'

মাথার ঠিক উপরেই জ্বলে উঠল অত্যন্ত জোরালো বৈদ্যুতিক আলো।

কুয়াশার দিকে তাকাল কলিম অসহায়ের মত। কুয়াশার মুখটা ভাবলেশহীন।

নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল দু'জন।

তখনও হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ধাতব রেশ আছে হাসিতে। লাউড-স্পীকারে আসছে শব্দটা। অনেক, অনেকক্ষণ পরে থামল হাসিটা।

লাউড-স্পীকারে শোনা গেল, 'পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। পেছনের দরজা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। ...আর সেখানে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক প্রহরী।'

আবার কলিম তাকাল কুয়াশার দিকে। সে দেখল, কুয়াশার ভাবলেশহীন ভাবটা আর নেই। তার বদলে তার চিবুকের রেখায় ফুটে উঠেছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আর কঠিন এক প্রতিজ্ঞার ছাপ। কলিমের ভীতিটুকু দূর হয়ে গেল। সে-ও ফিরে পেল তার আত্মবিশ্বাস।

'তাহলে এসে গিয়েছ তোমরা এখানে, আলী সাহেব ওরফে কুয়াশা? একা নয় সাগরেদসহ। ভালই করেছ। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানি, তুমি আসবে এবং এটাও জানি আজ রাতেই তুমি আসবে। ভগ্নীপতির জীবনরক্ষার জন্যে তোমায় যে আসতেই হবে। বিধবা বোনের কান্নায় তোমার বুক ভেঙে যাবে যে। আর আমার কথা যদি বল তাহলে আমি বলব, প্রধান অতিথি ছাড়া আমার আজকের উৎসব চলবে কি করে? শুধু টিকটিকি মেরে যদি হাত গন্ধ করতে হয় তাহলে আমার এই অতিমানবীয় জীবনটাই বৃথা।

হাঃ হাঃ অট্টহাসি ভেসে এল।

এদিকে সামনের লোহার দরজাটার দুটো পাল্লা ধীরে ধীরে দু'পাশে দেয়ালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। সামনেই একটা বিরাট কক্ষ ওদের চোখে পড়ল। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না।

'ঢুকে পড়,' হাসি থামিয়ে নির্দেশ দিল কণ্ঠটা।

কুয়াশা ও কলিম নীরবে ঢুকে পড়ল। কক্ষটা শূন্য। কেউ নেই। শুধু ডানদিকে একটা বন্ধ দেয়াল-আলমারি দেখা যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাল কুয়াশা। পিছন ফিরে দেখল, লোহার দরজার পাল্লা দুটো আবার ধীরে ধীরে দেয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ডানদিকের দেয়াল-আলমারিটার দিকে তাকাল সে। তার দুটো পাল্লাও ততক্ষণে খুলে গেছে।

কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ ভেসে এল মাইক্রোফোনে, 'সাথে যা কিছু আছে সব ওখানেই রেখে দাও। হাতের ঐ কিটটা। পেন্সিল-টর্চটা, পিস্তলটা। অন্য কোন অস্ত্র থাকলে তা-ও রেখে দাও।'

কুয়াশার ইঙ্গিতে কলিম কিট আর পিস্তল মেঝেয় রেখে দিল। কুয়াশা টর্চটা রেখে দিল। কোমর থেকে থ্রোয়িং নাইফটাও বের করে মেঝের উপর রাখল।

'সিগারেট লাইটারও রেখে দাও, তবে সিগারেট সাথে রাখতে পার। জীবনের শেষবারের মত তোমাকে ধূমপান করতে দেব না এমন নিষ্ঠুর লোক আমি নই।'

মাথা নিচু করে হাসল কুয়াশা। একটা সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা মেঝের উপর রাখল সে।

'আশা করি, তোমাদের সাথে আর কোন অস্ত্র নেই। মাথা নাড়ালেই আমি বুঝতে পারব।'

মাথা নাড়ল কুয়াশা।

'বেশ, এবারে ঐ আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়। তবে মনে রেখ, অন্য কোন অস্ত্র যদি তোমাদের কাছে খুঁজে পাই তাহলে পরিণাম হবে মারাত্মক। এস এবার।'

কয়েক পা এগিয়ে ওরা দু'জন আলমারিটার কাছে পৌঁছুল। বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল একটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। সিঁড়ির ঠিক নিচেই আর একটা দরজা। পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ে কুয়াশা দেখতে পেল আলমারির দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছুতেই সামনের বন্ধ দরজাটা খুলে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল দু'হাতে দুটো রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক মুখোশধারী। রিভলভার দুটোর লক্ষ্য ওরা দু'জন।

'এস ভিতরে এস, মরণবিজয়ী আলী সাহেব।' বক্তার কণ্ঠে বিদ্রূপ।

ভিতরে ঢুকল কয়াশা আর কলিম।

'ড.রাজীর বাসায় আমাকে জ্বালাতন করেছ, কিন্তু তারপরে আমায় নতুন করে কষ্ট না দিয়ে নিজে যেচে চলে এসেছ বলে ভারি খুশি হয়েছি,' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল মুখোশধারী।

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল কুয়াশা। বিদ্রূপে তারও ঠোঁট ঈষৎ বেঁকে গেল। কোন জবাব না দিয়ে সে রুমটার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটু দূরেই দুটো চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে শহীদ ও কামাল। তাদের দু'জনের দৃষ্টিই তার দিকে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে যেন আশার আলো। কুয়াশার দৃষ্টিটা ঘুরে ফিরে আবার মুখোশধারীর উপর নিবদ্ধ হল।

মুখোশধারী দাঁড়িয়ে ছিল একটা টেবিলের পাশে। বাঁ হাতের রিভলভারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বলল, 'এখুনি শুরু হবে অতিমানবীয় মহাযজ্ঞ। আমার রুমের আজকের এই চার অতিথিকে অভিনব পন্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই রুমের পিছনে আছে একটা কাঁচের তৈরি রুম। তার ভিতর থেকে সমস্ত অক্সিজেন বের করে নেয়া হয়েছে। তোমাদের একজন করে সেই কাঁচের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কি করে অক্সিজেনের অভাবে মানুষ মারা যায় বাকি কয়েকজন মিলে তাই দেখব। সবশেষে কাঁচের ঘরে ঢুকবে শ্রীমান কুয়াশা। কিন্তু তার আগে কুয়াশা সাহেব, ড. রাজীর বাসা থেকে যে ফর্মূলা চুরি করেছ সেটা বের করে দাও দেখি ভাল মানুষের মত। আশা করি, ওটা তোমার সাথেই আছে। অন্তত থাকতে পারে সাথে।'

কুয়াশা জবাব দিল না। সিগারেটটা ফুরিয়ে এসেছিল। সে বলল, 'যদি অনুমতি দাও আর একটা সিগারেট ধরাই।'

'বিলক্ষণ। কিন্তু দেরি করলে চলবে না। আমার সময় কম।'

কুয়াশা আর একটা সিগারেট বের করল। নিঃশেষিত-প্রায় সিগারেটের আগুনে সেটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একগাল।

মুখোশধারী বিরক্ত হয়ে বলল, 'বের কর, কুয়াশা, সেই কাগজগুলো। বলেছি তো, আমার সময় কম।'

'ঠিক। তোমার সময় হয়ে এসেছে,' মুখোশধারীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল কুয়াশা।

'বটে,' দাঁতে দাঁত ঘষল মুখোশধারী। 'বেয়াদবীর অর্থ জান? কার সাথে কথা বলছ আশা করি তা বুঝতে পারনি। মনে রেখ, আমি সুপারম্যান। তোমাদের এই পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সবচেয়ে প্রতিভাধর প্রাণী। আমার সাথে কোনরকম চালাকি করে পার পাবে না। আমি সাধারণ নই। অসাধারণ।'

জবাবে কুয়াশার ঠোঁটটা ঈষৎ বেঁকে গেল।

'এখনও বের করে দাও। না হয় বল, কোথায় রেখেছ,' ধমক দিল মুখোশধারী।

হাসল কুয়াশা। শহীদ ও কামালের দিকে একবার তাকাল সে।

'দিতে পারি এক শর্তে,' একটু পরে বলল সে।

'কোন শর্ত আমি মানি না। ওটা দিতে হবে,' কঠোর কণ্ঠে বলল মুখোশধারী। 'ওটা আমার চাই-ই।'

'তুমি না সুপারম্যান! দুনিয়ার একমাত্র প্রতিভা! তাহলে ওগুলো দিয়ে তুমি কি করবে? তাছাড়া এ ফর্মূলা তোমার কি-ই বা কাজে আসবে! ইউজেনিকসের ফর্মূলা তো তোমার জানাই আছে। বলতে গেলে যারা ওটা উদ্ভাবন করেছে তারা তোমার...।'

মুখোশধারী চিৎকার করে উঠল। কুয়াশার কণ্ঠ ছাপিয়ে সে বলল, 'সে কৈফিয়ৎ তোমাকে আমি দিতে রাজি নই। তবু বলছি, আমি ছাড়া ও বিদ্যা অন্য কেউ জানুক আমি তা চাই না। ওটা আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।'

'কিন্তু,' কুয়াশা মৃদু গলায় বলল, 'অনেকেই তো এখন তা জেনে ফেলেছে। লুকম্যান এইচ কিমের সহকারীরা প্রত্যেকেই জানে ইউজেনিকসের গোপন রহস্য।'

আবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল মুখোশধারী। তারপর সে বলল, 'জানে বৈ কি, নিশ্চয়ই জানে। অন্তত জানে বলে মনে করে। ফর্মূলা অবশ্যই জানে কিন্তু প্রয়োগ করার সামর্থ্য ওদের কারও নেই। ওরা বড়জোর সুপারগিনিপিগ জন্ম দিতে পারে। কিন্তু সুপারম্যান অসম্ভব। তবু আমি সে সম্ভাবনাটুকুরও অবসান ঘটাব। শত্রুর শেষ রাখব না আমি। আগামীকালের মধ্যে আমার কোন শত্রু এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে না।'

মুখোশধারী থামল। তারপর বলল, 'কিন্তু এসব আলাপনের দরকার নেই।

বের করে দাও কাগজগুলো।'

'তুমি একটা আস্ত মূর্খ। তুমি কি মনে কর, ওগুলো আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি?'

'একেবারে নিশ্চিতভাবে তা মনে করি না। কারণ আমি বেওকুফ নই। বেশ তো, কোথায় আছে বল।'

'বলেছি তো, এক শর্তে ওগুলো পাবে। ছেড়ে দিতে হবে আমাকে এবং এই তিনজনকে।

'অসম্ভব। কাউকে আমি ছাড়ব না। সবাইকে মরতে হবে। যেভাবেই হোক আমি ফর্মূলা উদ্ধার করব,' চিৎকার করে উঠল মুখোশধারী। 'কেমন করে ওটা আদায় করতে হয়, আমি জানি। তোমার সামনে যখন তোমার ভগ্নীপতি, ঐ টিকটিকিটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে বসবে তখন বের করে না দিয়ে পথ পাবে না তুমি।' দুটো খালি চেয়ার দেখিয়ে মুখোশধারী বলল, 'যাও, ওখানে গিয়ে বস। তোমাদের এইভাবে বাঁধন-মুক্ত রাখা উচিত নয়। যাও,' বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিল মুখোশধারী।

কুয়াশার হাতের সিগারেটটা অর্ধেক হয়ে এসেছিল। সে আর একটা টান দিয়ে খালি চেয়ারের দিকে এগোল এবং মুহূর্তের মধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল মুখোশধারীর দিকে। সিগারেটটা গিয়ে পড়ল মুখোশধারীর ডানহাতের কব্জিতে। প্রচণ্ড শব্দে একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল কিছুটা জায়গা। কেঁপে উঠল কামাল ও কলিম। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শহীদ।

ধোঁয়া যখন কেটে গেল তখন দেখা গেল টেবিলটা উল্টে গেছে। তার পাশেই কুয়াশা ও মুখোশধারী মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ। মুখোশধারীর রিভলভারসুদ্ধ হাতটা উপরের দিকে। সে হাতটা নামাতে চেষ্টা করছে, অন্যদিকে কুয়াশা হাতটা নামাতে দিচ্ছে না। দ্বিতীয় রিভলভারটা গিয়ে পড়েছে কামালের চেয়ারের কাছে।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল কলিমের। সে রিভলভারটা ধরবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে গেল। রিভলভারটা তুলতেই কে যেন চিৎকার করে উঠল। আর পরমুহূর্তেই পাঁজরে প্রচণ্ড একটা লাথি পড়ল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে কামালের চেয়ারের উপরে। চেয়ারসুদ্ধ কামালকে নিয়ে সে পড়ল মেঝেতে। মাথাটা ঠুকে গেল দেয়ালে। রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে কখন তা টের পায়নি কলিম। তার তখন মাথা ঘুরছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় সে চোখ দুটো খুলল। আক্রমণকারী তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভয়ঙ্কর পাহাড়টা ভাটার মত রক্তবর্ণ চোখ দুটো দিয়ে তাকে যেন গিলে খাচ্ছে। তার হাত দুটো সাঁড়াশির মত এগিয়ে আসছে। ভয়ে দু'চোখ বুজল কলিম। কামালও ভয়ে চোখ বন্ধ করল। শহীদ চিৎকার করে উঠল।

ওদিকে মুখোশধারী ও কুয়াশার মধ্যে তখন প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ চলছে। দু'জনের

কেউ কাউকে বাগে আনতে পারছে না। অস্ফুট একটা আর্তনাদ কানে যেতেই শহীদ সেদিকে ফিরে তাকাল। সেখানেও একই দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। মুখোশধারীর হাত থেকে পড়ে যাওয়া রিভলভারটা কুয়াশার হাতে চলে গেছে কিন্তু সে হাতটা ঘোরাতে পারছে না কোন মতেই। মুখোশধারী কুয়াশার হাতটা শূন্যে তুলে ধরে আছে। দাবার দান পাল্টে গেছে।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে কুয়াশা এবং প্রচণ্ড শক্তিতে সে মুখোশধারীর তলপেটে একটা লাথি মেরেছে।

লাথি খেয়ে পড়ে গিয়ে কোঁক করে উঠল মুখোশধারী। চিৎকার করে উঠল, 'পেদ্রো!'

পেদ্রো ঘুরে তাকাল এবং মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি অনুধাবন করে কলিমকে ছেড়ে কুয়াশার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই কুয়াশার হাতের রিভলভারটা গর্জে উঠল। পরপর দু'বার গুড়ুম করে শব্দ হল। বুকে গুলি লেগেছে। দু'হাতে বুক চেপে ধরেছে পেদ্রো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে তার রক্তবর্ণ দেহ থেকে। পাহাড়টা কাঁপছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় তার বীভৎস মুখটা বীভৎসতর হয়ে উঠেছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পেদ্রোর বিশাল দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। কুয়াশা মুখ ফিরিয়ে দেখল মুখোশধারী অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে মিলিয়ে গেছে। দরজাটা খোলা। উদ্যত রিভলভার হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

কলিম ধীরে ধীরে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। ডান পা'টা তুলে মোজার ভিতর থেকে বের করল একটা ব্লেড। আবার সে বসল উবু হয়ে। ব্লেডটা দিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে কামালের হাতের বাঁধন কেটে ফেলল। তারপর শহীদের হাতের বাঁধন কাটল। তারপর আর সে পারল না, পড়ে গেল মেঝের উপর।

কামাল ততক্ষণে তার পায়ের বাঁধন খুলে ফেলেছে। সে ব্লেড নিয়ে শহীদের পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

কুয়াশা ফিরে এল। ধীরে ধীরে সে গিয়ে দাঁড়াল দৈত্যাকার প্রাণীটার মৃতদেহের পাশে। পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে মৃতদেহটার দিকে। রক্তে মেঝেটা ভিজে একাকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে পড়ে আছে বিশাল মৃতদেহটা নিস্পন্দ হয়ে। অবিশ্বাস্য ওর দেহের আয়তন। আর কি বীভৎস চেহারা! বিরাট মাথায় এতটুকু চুল নেই। ভুরু নেই। দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন নেই। কপালটা সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। চোখ দুটো কুতকুতে, গভীর দুটো গর্তের মধ্যে। মুখভর্তি ছোট বড় অসংখ্য আব। নাকটা থ্যাবড়া। রক্তের মত দেহবর্ণ।

কলিমের চেতনা ফিরে এসেছিল। সে ধীরে ধীরে উঠে কুয়াশার পাশে দাঁড়াল। 'আশ্চর্য, মানুষ সত্যি এমন দৈত্যের মত হতে পারে!'

কামাল বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, কলিম? দৈত্যটা একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি কখনও।'

'নিশ্চয়ই ও ছিল বোবা।'

'সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটা কি জান, কামাল? এই দানবটার বয়স মাত্র দু'বছর।'

'দু'বছর মাত্র, বল কি!' বিস্ময় প্রকাশ করল শহীদ।

'হ্যাঁ, মাত্র দু'বছর। এর মধ্যেই ওর দেহে পূর্ণতা এসেছে। ও হচ্ছে আলাদিনের সেই দৈত্যের মত, যাকে সুপারম্যান জন্ম দিয়েছে আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। অথচ দৈত্যটাকে একটা স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেও জন্ম দেওয়া যেত। সে ক্ষেত্রে হয়ত সে দু'বছরে পূর্ণতা লাভ করত না। আসলে জন্মও ওর কৃত্রিম। জন্ম ওর স্বাভাবিক নয়, আর কোন মানবীর গর্ভেও নয়। জন্ম ল্যাবরেটরির টেস্ট-টিউবে। সুপারম্যান নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে এই অস্বাভাবিক জন্ম দিয়েছে ওদের।'

'ওদের বলছ কেন?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'কারণ এমন দৈত্য আরও একটা আছে। জানি না সেটাকে কোথায় রাখা হয়েছে। যতদূর মনে হয় এখানেই, অন্তত আমার হিসেবে তো তাই বলে।'

'সর্বনাশ!' কামাল বলল, 'আরও একটা আছে!'

'আর এখানেই আছে,' স্মরণ করিয়ে দিল শহীদ। 'সাবধান।'

কুয়াশা হঠাৎ সচকিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমাদের এখুনি এই জায়গাটা ত্যাগ করা দরকার। শয়তানটা পালিয়েছে বটে তবে যে-কোন মুহূর্তে আবার হামলা হতে পারে। আমি ডায়নামোটা নষ্ট করে দিয়ে এসেছি। এখন আর দরজা বন্ধ করতে পারবে না বোতাম টিপে। কিন্তু সাবধানের মার নেই। তাছাড়া আরও একটা ডায়নামো আছে। সেখান থেকে বাইরে কাঁটাতারের বেড়ায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে।'

মৃতদেহটার দিকে শেষবারের মত নজর বুলিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা। কিন্তু আর কোন বিপত্তি ঘটল না। অলি-গলি পেরিয়ে যখন ওরা দালানের বাইরে পা দিল তখন ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ওদেরকে অভিনন্দন জানাল। জুড়িয়ে গেল ওদের দেহ-মন।

রাতের আঁধার কেটে গেছে। কুয়াশাসিক্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ওরা ভোরের অস্পষ্ট আলোয় কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে চলে এল।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

কামাল হঠাৎ বলল, 'কিন্তু লোকটাকে চিনতে পারলাম না।'

'তুই চিনবি কি করে? এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে তুই তো শুধু ড. রাজী, রোকেয়া আর কুয়াশাকে চিনিস। আর তো কাউকে তুই দেখিসনি। অন্যদের সাথে আলাপ-পরিচয় হলে ঠিকই চিনতে পারবি, অবশ্য তুই যদি তোর মাথার গ্রে-সেলগুলোকে কষ্ট দিস একটু।'

'ঠাট্টা করছিস?'

'ছিঃ ছিঃ, কি যে বলিস। খালিপেটে এই সাত-সকালে ঠাট্টা? তারপর আবার এই হেনস্তার পর?'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বড় সড়কে গিয়ে উঠল। কুয়াশা একটা ঝোপের মধ্যে উঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পালিয়েছে। গাড়িটাও নেই।'

'এহ্-হে। একেবারে কেটে পড়েছে?' ক্ষুব্ধ শোনাল কামালের কণ্ঠ, 'তুমি কেন দ্বিতীয় গুলিটা ঐ বদমাশটার দিকে ছুঁড়লে না?'

'সময় পেলাম না, ভাই,' অপরাধীর মত বলল কুয়াশা।

কলিম গাড়ি আনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, ভাইয়া। চারটে চাকাই ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা কিছুক্ষণ।

'তাহলে?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'হাঁটতে হবে। আদি ও অকৃত্রিম শ্রীচরণ ভরসা,' কামাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

হাঁটতে হাঁটতে এগোতে লাগল ওরা।

শহীদ একসময় প্রশ্ন করল, 'এবার তুমি কি করবে?'

'তোমরা তোমাদের পথ ধরে চল, আমি আমার পথ ধরে এগোব। আই মাস্ট স্ম্যাশ হিম। আই অ্যাম প্রমিজ-বাউণ্ড টু এ ডেড ম্যান।'

কামাল বলল, 'কিন্তু সে যদি ভেগে যায়?'

শহীদ এ কথার জবাব দিল। সে বলল, 'ঐ ফর্মূলাটা না নিয়ে সে ভাগতে পারে না। দ্বিতীয় কোন সুপারম্যান জন্ম নিক, তা সে চায় না। সুতরাং সে ভাগবে না। আমার সবচেয়ে ভয় হচ্ছে, ইতিমধ্যেই সে ড. রাজী আর তার সহকারীদের কোন ক্ষতি না করে বসে।'

কুয়াশা বলল, 'সেই আশঙ্কাটা আমার মনেও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে টায়ার ফাঁসিয়ে দেওয়াতে। কে জানে, ইতিমধ্যেই কোন সর্বনাশ হয়ে গেল কিনা,' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

মাইল খানেক যেতেই একটা মোড়ে গিয়ে পৌছুল ওরা। কুয়াশা বলল, 'এখানেই দাঁড়াও তোমরা। বাস পাবে। আমি আর কলিম এখান থেকেই বিদায় নেব। চলি, শহীদ। চলি, কামাল।'

প্রাতঃরাশ সেরে শহীদ একটা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা টেনে নিয়ে বসল ড্রইংরুমে। পত্রিকাটিতে একদা জেনেটিকস সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ চোখে পড়েছিল শহীদের। কিন্তু তখন উৎসাহ বোধ করেনি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সে আরাম করে একটা সোফার উপর বসল।

কামালের ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু সুপারম্যান সম্পর্কে আর রিসার্চ সেন্টারের জটিল ঘটনা সম্পর্কে উৎসাহ ছিল বলে সে-ও গুটিগুটি ড্রইংরুমে গিয়ে বসল। শহীদ বই নিয়ে বসায় সে বলল, 'কিরে, তুই যে এখন পড়তে বসলি বড়?'

মহুয়া ফোঁস করে উঠল, 'বললাম একটু ঘুমিয়ে নাও। তা আমার কথা শুনলে তো?'

কিন্তু মহুয়ার কথা যে শহীদের কানে যায়নি তা বুঝতে বিলম্ব হল না। শহীদ ততক্ষণে প্রবন্ধটার মধ্যে ডুব দিয়েছে। অগত্যা কামাল বিদায় নিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার তুমি তোমার পণ্ডিত-পতির কানের কাছে ঘন্টা বাজাও, আমি চললাম।'

'বোস না। যাবেই বা কোথায়?'

'আমার ঘুম পাচ্ছে বড়। আমি তো আর তোমার পতি-দেবতার মত আহার-নিদ্রা রোগ-শোক, জ্বরা বিজয়ী সুপারম্যান নই, আমি অতি সাধারণ নগণ্য অধম মানুষ কামাল উদ্দিন। আমার খিদে পায়, ঘুম পায়, অসুখ-বিসুখ করে,' হাত-পা নেড়ে বলল কামাল।

তার অঙ্গভঙ্গিতে হেসে ফেলল মহুয়া। সে বলল, 'বেশ তো, যাবেই না হয়। এত হৈ-চৈ করছ কেন? দু'দণ্ড জিরোও। খিদে তো শুধু দেহেরই নয়, মনেরও খিদে আছে। বেশ কঠিন একটা বই নিয়ে আত্মিক পিপাসা মিটাও না হয় বন্ধুর পাশে বসে।'

'উঁহুঁ, ওটি হচ্ছে না,' মাথা নেড়ে বলল সে। 'ওসব দিগগজ পণ্ডিতদের ব্যাপার। ওর মধ্যে আমি নেই। আমার হল খাই-দাই-বেড়াই, সিনেমা দেখি, জনৈক ডিটেকটিভের সাগরেদী করি। কিন্তু বই-পত্র দেখলেই আমার ভয় হয়। জ্ঞান-পিপাসাটা তো তুমি জানই আমার তত প্রবল নয়।'

'তাহলে কোন পিপাসাটা প্রবল অন্তত এই মুহূর্তে?'

কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রিসিভারটা তুলল মহুয়া, 'হ্যালো?...হ্যাঁ, উনি আছেন। ধরুন আপনি দয়া করে।...ওগো, তোমার ফোন,' শেষের কথাটা বলল স্বামীর উদ্দেশ্যে। রিসিভারটা বাড়িয়েও দিল তার দিকে।

'হ্যালো?...হ্যাঁ, শহীদ বলছি।...হ্যাঁ...আচ্ছা। আধ ঘন্টার মধ্যে,' রিসিভারটা মহুয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ। কামালের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমাদের আশঙ্কাটাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে রে।'

'আবার কি হল?' কামাল প্রশ্ন করল।

'সকাল থেকে ড. রাজীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন বাজে দশটা। তাছাড়া ড. রাজীর বাড়িতে চুরিও হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়ই ইউজেনিকসের ফর্মূলা?'

মাথা নাড়ল শহীদ।

'তার মানে, তুমি এখনি আবার বেরোচ্ছ?' মহুয়া প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তুমি ঝটপট এককাপ চায়ের ব্যবস্থা কর তো, লক্ষ্মীটি। গা'টা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে। ঘুমের ভাবটা দূর হচ্ছে না কিছুতেই।'

'যথা আজ্ঞা, প্রভু।'

মহুয়া নিষ্ক্রমণ করল।

'তুই বোস হতভাগা চুপ করে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমার হয়ে যাবে। বেশ ইন্টারেস্টিং আর্টিকল। অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য আছে এটার মধ্যে।'

'তা বসছি, বাওয়া। কিন্তু তোমার সাথে আমি এখন বেরোচ্ছি না।'

'কেন? সুপারম্যানের ভয়ে, না পেদ্রোর কাউন্টার-পার্টের ভয়ে?'

'যাঃ, এই শর্মাকে ভয় পেতে দেখেছিস কখনও? আসলে আমার সত্যি ঘুমে ধরেছে।'

'তবে থাক। কিন্তু মনে হচ্ছে যবনিকাপাতের সময় হয়ে এসেছে প্রায়। হয়ত আজকে, এই এক্ষুণি সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

'বলিস কিরে! তাহলে তো যেতেই হচ্ছে তোর সাথে। এমন একটা কাণ্ড ঘটবে, আর আমি যাব না, এটা হতেই পারে না,' সোৎসাহে বলল কামাল।

'কিন্তু তোর যে ঘুম পাচ্ছে?'

'দু'কাপ কড়া চা,-না চা নয়। কফি খেয়ে নেব। দেখ না, ঘুম পালায় কোথায়। যাই আমি, এখুনি কফির ফরমাশটা দিয়ে আসি। তুই চালিয়ে যা ততক্ষণ, মানে, বিদ্যেটা হজম করে নে।'

দুই লাফে বেরিয়ে গেল কামাল।

শহীদ হাসল। মনে মনে বলল, আচ্ছা ছেলেমানুষ। কৌতূহলে একেবারে টগবগ।

পত্রিকাটির দিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে এবং পরমুহূর্তেই বাহ্যিক দুনিয়ার সম্পর্কে তার আর কোন অনুভূতি রইল না। যেন দুনিয়ায় সে আর ঐ পত্রিকাটি ছাড়া আর কিছুই নেই।

দুই

লীনা ঢুকল অন্য দরজা দিয়ে। তার হাতে একটা খাম। সেটা সে শহীদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দাদা, তোমার চিঠি। এক ছোকরা দিয়ে গেল।'

খামটা ছিঁড়ে ছোট এক টুকরো কাগজ বের করল ও। ছোট সাদা এক টুকরো কাগজে দু'লাইন মাত্র লেখাঃ

'কপালের জোরে বেঁচে গেছ। কিন্তু ক্ষমা আমি কাউকেই করব না।

শত্রুর শেষ রাখব না। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।'

কোন স্বাক্ষর নেই। কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখল শহীদ। সাধারণ সাদা কাগজ থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো কাগজ। খামটাও উল্টে-পাল্টে দেখল সে। নাম ঠিকানাহীন খাম।

লীনা শহীদের দিকে তাকিয়েছিল। তার চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা না দিলেও চিঠি ও খামটা উল্টে-পাল্টে দেখায় সে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার দাদা, কে লিখেছে চিঠি?'

কামাল ফিরে এল। শহীদের হাতে খাম আর কাগজটা দেখে বলল, 'কি ব্যাপার,কোন গোলমাল?'

'না, কিচ্ছু না। হ্যাঁরে লীনু, সেই ছোকরাটা আছে না ভেগেছে?'

'চলে গেছে! বল না দাদা, কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু না। ওটা একটা রুটিন মাফিক ব্যাপার। দেখে নেব ব্যাটার জান্তব চোখ রাঙানী। ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে। সেই লোকটা লিখেছে, সারারাত যার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম।'

'কিন্তু তুমি সাবধানে থেক, দাদা।'

'হয়েছে রে হয়েছে। শেষটায় তুইও ভয় পেলি? তুই না সাহসী মেয়ে? মনে নেই বুঝি, গভীর রাতে তুই জলার ভিতর ডুব দিয়েছিলি সায়লা বেগমের শিশু সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে?'

'ভয় আমি পাইনি, দাদা। কিন্তু বৌদির কাছে যা শুনলাম তাতে স্বস্তিবোধ করারও কোন কারণ দেখছিনে। এ তো আর সাধারণ মানুষের ব্যাপার নয়, কি সব ভয়ঙ্কর অতিকায় মানুষের কাণ্ড। তাছাড়া সাবধানের মার নেই।'

'ঠিক ঠিক, তুমি ঠিক বলেছ লীনা,' কামাল সায় দিল। 'সাবধানের মার নেই।'

লীনা ফোঁস করে উঠল, 'কিন্তু কথাটা তুমিও স্মরণ রাখলে বাধিত হব।'

মহুয়া একটু আগেই ঢুকেছিল। সে বলল, 'তাই তো বলি, সেই কিনা বলে, কাকে যেন মেরে কাকে শেখায়?'

'বৌদী!' চেঁচিয়ে উঠল লীনা। তীব্র একটা কটাক্ষ হেনে সে বেরিয়ে গেল।

কামালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মহুয়া। শহীদ তখন ঘূর্ণায়মান পাখাটার দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কামাল ব্যস্ততার সঙ্গে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ফিরে এল লীনা।

সে বলল, 'দ্যাখ দাদা, কাকে নিয়ে এসেছি।'

শহীদ মুখ তুলতেই দেখল মি. সিম্পসন অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে ড্রইংরুমে ঢুকছেন।

'আরে, মি. সিম্পসন যে! কবে এলেন?' সোল্লাসে প্রশ্ন করল কামাল।

'আসুন, মি. সিম্পসন। বসুন। কেমন আছেন?'
'কাল এসেছি। ভালই আছি,' একসঙ্গে দু'জনের প্রশ্নেরই জবাব দিলেন তিনি।
'আপনি না বছর খানেকের ছুটি নিয়েছেন? তা এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন যে? শরীর ভাল তো?' এবারের প্রশ্নকর্তা শহীদ।
'শরীরটা ভাল বলেই চলে এলাম। জয়েন করিনি অবশ্য। তবে শিগগিরই করতে হবে। সম্ভবত কালকেই করব,' বসতে বসতে বললেন মি. সিম্পসন।
'ভালই করেছেন। আমরা বেশ একটা ইন্টারেস্টিং কেস পেয়েছি। এবারে দৈত্য-দানো নিয়ে কারবার,' কামাল বলল।
'শুনেছি, আর সেই জন্যেই তোমাদের কাছে আসতে হল। হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের ঘটনা তো? আমিও সেই কানেকশনে এসেছি। সেন্টারের ডিরেক্টর ড. রাজী আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ওর মেয়ে রোকেয়া আধঘন্টা আগে আমায় ফোন করে জানিয়েছে, ওর বাবাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাই দ্য ওয়ে, রোকেয়া আর আমি গতকাল একসাথেই ফিরেছি। এদিকে চৌধুরী গোলাম হাক্কানী আজ সকালেই রিসার্চ সেন্টারের ঘটনাগুলো বলেছিলেন আমায়। আঙুলের ছাপগুলোও আমাকে দেখিয়েছেন। মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন চৌধুরী সাহেব। আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিলেন। তোমাদের কথাও তিনিই বললেন আমাকে। তাই ড. রাজীর বাসায় যাবার আগে তোমাদের এখানটাতেই এলাম।'
'বেশ করেছেন। আমিও এইমাত্র ফোনে খবর পেলাম যে, ড. রাজীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চা খেয়েই বেরোচ্ছিলাম।'
মহুয়া মি. সিম্পসনের সামনে খাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চা নিন, মি. সিম্পসন।'
'ধন্যবাদ। তা আপনি ভাল তো, মিসেস খান?'
'খু-উ-ব ভাল।'
চা খাওয়া শেষ হতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। কামাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেহায়েত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সঙ্গী হল ওদের। গাড়িতে উঠবার আগেই তাকে নিচুস্বরে কয়েকটা নির্দেশ দিল শহীদ। সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।
শহীদ আর নিজের গাড়ি নিল না। কামালকে নিয়ে মি. সিম্পসনের গাড়িতেই উঠল। মি. সিম্পসনকে সংক্ষেপে ঘটনাগুলো জানাল সে।
মি. সিম্পসন সবটা শুনে বললেন, 'তাহলে শুধু তোমরাই নও, কুয়াশাও লেগেছে সেই সো-কল্ড সুপারম্যানের পিছনে?'
'হ্যাঁ,' শহীদ বলল।
'তার ইন্টারেস্টটা কি?'
'সে নাকি কার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে শপথ নিয়েছে, যেমন করে হোক ইউজেনিকসের সম্ভাবনা সে বিনষ্ট করবে এবং সুপারম্যানকে ধ্বংস করবে।

অন্যথায় তার নিজের এবং যার কাছে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার ধারণা, সুপারম্যান অথবা ইউজেনিকস স্পেশালিস্ট ইচ্ছে করলেই সমগ্র মানবজগতের চরম ক্ষতি সাধন করতে পারে।'

'হুঁ। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'আর এ ধারণা যে যথার্থ তার প্রমাণ তো কুয়াশা নিজেও পেয়েছে। আমরাও পেয়েছি।'

'তাহলে ড. রাজী সেই সুপারম্যানেরই পাল্লায় পড়েছে?'

'নিঃসন্দেহে। অবশ্য যদি সে সত্যি নিখোঁজ হয়ে গিয়ে থাকে।'

'যদি বলছ কেন?'

'এখন তো বাজে মাত্র এগারটা। এমনও তো হতে পারে যে, সে সকালে কাউকে কিছু না বলে কোন কাজে বেরিয়ে গেছে?'

'তা মনে হয় না। সম্ভাব্য সব জায়গাতেই তার খোঁজ করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এভাবে সে কখনও বেরোয় না।'

'তার সহকারীদের খবর কি? তারাও কি কিছু জানে না?' কামাল জানতে চাইল।

মি. সিম্পসন বললেন, 'সেটা অবশ্য কিছু বলেনি রোকেয়া।'

হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের কাছে পৌঁছুতেই শহীদ গাড়ি থামাতে বলল। মি. সিম্পসন গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রিসার্চ সেন্টারে যাবে নাকি এখন?'

'আমি না। কামালের কি একটা দরকার আছে।'

গাড়ি থামালেন মি. সিম্পসন। কামাল নামল।

মিনিট পাঁচেক পরে গাড়ি ড. রাজীর বাড়ির সামনে পৌঁছুল।

সামনের লনে উদ্বিগ্ন রোকেয়া অপেক্ষা করছিল। গাড়ির শব্দ শুনেই সে ছুটে এল। গাড়িতে শহীদ ও মি. সিম্পসনকে দেখে যেন সে নিরাশ হল। মেয়েটাকে দেখে মায়া হল শহীদের। বোধহয় ইতিমধ্যেই খুব কেঁদেছে রোকেয়া। চোখ-মুখ ফুলে গেছে। চোখে শঙ্কার ছাপ। বেশভুষা মলিন। চুল অবিন্যস্ত।

মি. সিম্পসন গাড়ি থেকে নামতেই ঝরঝর করে রোকেয়ার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নামল।

মি. সিম্পসন কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সস্নেহে বললেন, 'ছিঃ মা, কাঁদে না। যেমন করে হোক, তোমার বাবাকে খুঁজে বের করব। এখন তো মা তোমাকে সংযম হারালে চলবে না। স্থির থাকতে হবে। চল ভিতরে চল। এস, শহীদ।'

আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল রোকেয়া। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ো চাকর জাকের। সে মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে বলল, 'মা আমার সেই সকাল থেকেই কান্নাকাটি করছে। এতটা বেলা হল এখন পর্যন্ত মুখে কিচ্ছু দেয়নি। হুজুর, আপনি একটু বলে

দেন। অন্তত একটু কিছু মুখে দিক।'

'আচ্ছা সে হবে'খন। এস তো, মা। আগে সবটা শুনে নিই তোমার কাছ থেকে। না হলে তো মা, আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না।'

রোকেয়া আত্মসংবরণ করে ড্রইংরূমের দিকে এগোল। শহীদ ও মি. সিম্পসন তাকে অনুসরণ করলেন।

রোকেয়ার কাছ থেকে যা জানা গেল তা হল সংক্ষেপে এইঃ সকালে একটা গাড়ির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ধীরে সুস্থে বিছানা থেকে উঠে মশারীর বাইরে বেরিয়েই তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ইস্পাতের ক্লজিটটার চাবির ফোকরের চারদিকে একটা বৃত্ত। টেবিলের, র‍্যাকের বই-পত্র লণ্ডভণ্ড। রূমটার এককোণে পুরানো খবরের কাগজের যে গাদা ছিল তার কাগজগুলোও ছড়ানো। ঐ কাগজগুলোর মধ্যেই কয়েকটা পুরানো সাময়িকীর ভাঁজের মধ্যে ছিল ইউজেনিকসের ফর্মূলা। রোকেয়াই ফর্মুলা লেখা কাগজগুলো আলাদা আলাদা করে সাময়িকীর মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছিল। আর সাময়িকীগুলোও সে রেখেছিল সংবাদ-পত্রের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে। প্রথমেই সে কাগজগুলোর মধ্যে ফর্মূলার সন্ধান করতে যায়। কিন্তু সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফর্মূলার একটি কাগজও নেই সাময়িকীগুলোর মধ্যে। এদিকে সেদিকে তাকাতে গিয়ে তার দৃষ্টি পড়ে জানালার দিকে। জানালার দুটো শিক নিচের দিকে কাটা এবং উপরের দিকে বাঁকানো। সে ড. রাজীকে খবর দিতে যায়। গিয়ে দেখে ড. রাজী তাঁর রূমে নেই। জাকের ও মইনুলকে জিজ্ঞাসা করেছে। তারা কিছুই বলতে পারেনি, বরং দু'জনই অবাক হয়েছে। কারণ ড. রাজী সাধারণত সাড়ে আটটার আগে শয্যাত্যাগ করেন না। রোকেয়ার রূমে চুরির ব্যাপারটা তাদের কানে যাওয়ায় আরও হকচকিয়ে গেছে দু'জন। আশপাশে কোথাও খোঁজ করে ড. রাজীকে পাওয়া যায়নি এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সেলিম আতহার ও পারভেজেরও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। রুহুল করিমকে পাওয়া গেছে টেলিফোনে। সে ড. রাজীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছিল। তারা এসে চুরির ব্যাপারটা তদন্ত করে গেছে। আবার আসবে, বলেছে। নিখোঁজের ব্যাপারেও একটা এজাহার লিখে নিয়েছে। তবে পুলিসের ধারণা, জলজ্যান্ত একটা মানুষ তো আর চুরি যেতে পারে না। নিশ্চই ড. রাজী সকালে কোন জরুরী কাজে কোথাও গেছেন। হয়ত কোন কারণে ফিরে আসতে পারেননি, যে-কোন মুহূর্তে তিনি এসে যেতে পারেন। এ নিয়ে যেন মিস রোকেয়া অকারণে উদ্বিগ্ন না হয়। তবে তারা তাঁকে খোঁজ করতেই গেছে।

'ইউজেনিকসের ফর্মূলা ছাড়া আর কোন কিছু চুরি গেছে কি?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'আর কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হয় না,' রোকেয়া জানাল।

'আপনার ঘুম ভেঙেছে ক'টায়?'

'ছ'টায় হবে। কিছু আগেও হতে পারে। তখন রোদ সবে উঠেছে। আমি ঘড়ি দেখবার অবকাশ পাইনি।'

'চলুন, আপনার রুমটা একবার দেখে আসি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল শহীদ। 'চলুন, মি. সিম্পসন। আমাদের এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু তার আগে রুমটা একবার দেখে যাওয়া উচিত। নতুন কোন সূত্র যদি পাওয়া যায়।'

'চল। ওঠ মা,' মি. সিম্পসন দাঁড়িয়ে বললেন।

দোতলায় সিঁড়ির ঠিক সামনেরই একটা দরজা। রোকেয়া বলল, 'আসুন, এটাই আমার রুম।'

পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল শহীদ। মি. সিম্পসন তাকে অনুসরণ করলেন। শহীদ রুমটা একনজরে জরিপ করল। সে চমকাল না। কিন্তু মি. সিম্পসন চমকে উঠলেন। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তাঁর কণ্ঠ থেকে। শহীদ মি. সিম্পসনের দিকে তাকাল। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি তখন ক্লজিটের পাল্লার উপর একটা বৃত্তাকার কর্তিত স্থানের দিকে নিবদ্ধ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি স্থানটা লক্ষ্য করছিলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন ক্লজিটটার দিকে। নিচে মেঝের উপর পড়ে আছে ইস্পাতের পাল্লার একটা টুকরো আর খানিকটা গলিত ইস্পাত।

'শহীদ, এগুলো দেখেছ?'

'দেখেছি। জানালাটাও দেখুন। শিক দুটো বাঁকানো রয়েছে। নিচের দিকটা কেমন করে নিপুণভাবে কাটা।'

'হুঁ। বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে ...এ হচ্ছে কুয়াশার কীর্তি।'

'নিঃসন্দেহে,' শহীদ বলল। 'অবশ্য আল্ট্রাসোনিক্স বিদ্যা এখন আর কুয়াশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তবু আমি জানি, এখানে গতরাতে কুয়াশাই এসেছিল।'

'কুয়াশা? সে কে?' রোকেয়া জানতে চাইল।

'কুয়াশা হচ্ছে এক বিপথগামী প্রতিভা। এ মিসগাইডেড জিনিয়াস। তবে পুলিসের চোখে সে দুর্দান্ত অপরাধী। সে এক দুর্ধর্ষ দস্যু। ডাকাতি করে সে কোটি কোটি টাকা করেছে কিন্তু তা সে ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে অপব্যয় করেনি। ব্যয় করেছে বিজ্ঞানের গবেষণায় আর দান-ধ্যানে।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

'অদ্ভুত তো বটেই। আর এ-দেশের তো বটেই, বিদেশেরও অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তার কাছ থেকে বেনামীতে অর্থ পেয়েছে। হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারও সম্ভবত তার কাছে ঋণী।'

রোকেয়া চমকে উঠল। অনেক দিনের পুরানো একটা ঘটনা মনে পড়ল তার। অনেক দিন আগে একদিন সে তার বাবা আর হাকিম কাকামণির মধ্যে এই ধরনের ভাসা ভাসা একটা আলাপ শুনেছিল। কোন এক অজ্ঞাতনামা লোক নাকি এই সেন্টারের জন্যে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা এক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাঠিয়েছে।

কাকামণির টাকাটা নেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাবাই ওঁকে ট্যাকাটা নিতে বলেছিলেন। হয়ত কুয়াশাই সেই অজ্ঞাত-পরিচয় দাতা। তাহলে কি গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান অপহরণের জন্যেই সে এভাবে গোপনে টাকা দিয়েছিল? আর লোকটা নিজে যখন বিজ্ঞানী এবং মি. সিম্পসনের ভাষায় প্রতিভাধর বিজ্ঞানী, তখন হয়ত সে নিজেই ইউজেনিকসের ফর্মূলা আবিষ্কার করেছে। দৈত্যকায় মানব দুটোও হয়ত তারই সৃষ্টি এবং এই মূল্যবান গবেষণা-জাত ফর্মূলা যাতে অন্য কারও হাতে পড়ে তার সুপিরিয়রিটি নষ্ট না হয় হয়ত সেই কারণেই সে হাকিম রিসার্চ সেন্টারে উদ্ভাবিত ফর্মূলা চুরি করতে এসেছিল। বিজ্ঞানের সেবায় তার অর্থ সাহায্যের লক্ষ্য তাহলে মহৎ নয়।

সে বলল, 'আমারও মনে হয় কাক্কু, যে লোকটা চুরি করতে এসেছিল সে নিজেও অত্যন্ত প্রতিভাধর লোক এবং ইউজেনিকস সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান আছে। অন্য কারও পক্ষে ঐ কাগজগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব হলেও সে হয়ত ওগুলোর মানেই বুঝতে পারবে না। সুতরাং ওগুলোকে পুরানো ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা মনে করে ফেলে যাবে। এ চুরির পিছনেও কোন জিনিয়াসের হাত আছে।'

'নিশ্চয়ই। এবং তার আরও একটা প্রমাণ আছে ঐ ইস্পাতের পাল্লা কাটার মধ্যে। আল্ট্রাসোনিক্স নামে তার একটা যন্ত্র আছে। সেটা ওর নিজস্ব আবিষ্কার। অত্যন্ত মোটা ইস্পাতও অনায়াসে ঐ যন্ত্র দিয়ে অতিদ্রুত নিঃশব্দে কেটে ফেলা যায়।'

'কিন্তু ···কিন্তু। কাকু, লোকটা মানে কুয়াশা বাবাকে কেন নিয়ে গেল?' ব্যাকুল শোনাল রোকেয়ার কণ্ঠস্বর, 'যদি, যদি ···?'

শহীদ এ প্রশ্নের জবাব দিল। সে বলল, 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, ড. রোকেয়া। আমি নিঃসন্দেহে জানি, আপনার বাবার অন্তর্ধানের সঙ্গে কুয়াশার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আর যদি সে আপনার বাবাকে চুরি করেও থাকে তাহলেও বুঝবেন, তাঁর জীবনসংশয় দেখা দিয়েছিল বলেই কুয়াশা তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছে। তবে কুয়াশা যদি যথার্থই আপনার বাবাকে সরিয়ে ফেলত তাহলে এতক্ষণে আপনার কাছে খবর এসে যেত।'

'তাহলে আপনারও কি মনে হয়, বাবা কোন জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছেন অথবা অন্য কেউ তাঁকে চুরি করেছে?'

'আপনার শেষের আশঙ্কাটাই সত্য বলে মনে হয়।'

'কিন্তু অন্য লোকই বা বাবাকে চুরি করতে যাবে কেন?' যে লোকটা আমার রুমে চুরি করতে এসেছিল, যে লোকটা তারিক খাঁকে খুন করেছে, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরি ধ্বংস করেছে এবং অতিকায় মানব জন্ম দিয়েছে বাবাকে সেই-ই চুরি করেছে। আর সে নিশ্চয়ই কুয়াশা।'

মৃদু হাসল শহীদ। সে বলল. 'ঘটনাগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। জেনে

রাখুন, কুয়াশা আপনার রুম থেকে ইউজেনিকসের ফর্মূলা চুরি করেছে বটে, কিন্তু তারিক খাঁর হত্যাকাণ্ড, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে অতিকায় মানুষ দ্বারা তাণ্ডবনৃত্য সংঘটন এসব ঘটনার পশ্চাতে আছে অন্য এক কীর্তিমান নায়ক এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, কুয়াশাও সেই কীর্তিমান মহাপুরুষের পিছনে লেগেছে আর সেই মহামানব লেগেছে কুয়াশার পিছনে।'

রোকেয়া কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শহীদ ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করল। সে বলল, 'যে লোকটা এই কাণ্ডগুলো করেছে সে আপনার পরিচিত, আমারও পরিচিত। সে-ও এক অসামান্য প্রতিভাধর লোক। ইউজেনিকস বিদ্যা বহুদিন আগে থেকেই তার আয়ত্তে এসেছে এবং সে তার সফল প্রয়োগও করেছে। তারই ফল হল ঐ দৈত্যকায় মানব। হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারও ইউজেনিকসের ফর্মূলা উদ্ভাবনের ব্যাপারে তার কাছে বহুলাংশে ঋণী। হয়ত নেহায়েত দয়া পরবশ হয়েই সে ড. লোকমান হাকিমকে সাহায্য করেছিল, যদিও সে চায়নি যে ফর্মূলাটা অন্য কারও হাতে পড়ুক। তবে পড়বে না, সে সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দরকার হলে এই গবেষণার সাথে জড়িত সবাইকে খুন করতেও তার বাধবে না। আর, একদিন দরকার হয়ে পড়লও। ড. লোকমান হাকিম সম্ভবত কিছুটা আঁচ করেছিলেন, তাই তাঁকে সরে পড়তে হল।'

'তার মানে, হাকিম কাকু...?'

'হ্যাঁ। হি ওয়াজ মার্ডার্ড। কিন্তু বর্তমানে নাটক জমে উঠেছে তাঁর মৃত্যুর পরে। নায়ক ভেবেছিল, তার শত্রু নিপাত হয়েছে। রিসার্চ সেন্টারের অন্য কেউ তার পথে আপাতত বিঘ্ন সৃষ্টি করতে আসছে না। কিন্তু তবু সব গোলমাল হয়ে গেল আকস্মিকভাবে রঙ্গমঞ্চে কুয়াশার আবির্ভাবে। সুতরাং তারিক খাঁ মরল, ইউজেনিকসের যন্ত্রপাতি ধ্বংস হল এবং ফর্মূলা নিয়ে নায়ক ও কুয়াশার মধ্যে সংঘাত বাধল। তারই এক দৃশ্যে ঘটেছে আপনার বাবার অন্তর্ধান,' থামল শহীদ। ঘড়ি দেখে সে বলল, 'সর্বনাশ! আর দেরি করা যায় না, মি. সিম্পসন। চলুন, এক্ষুণি আমাদের বেরোতে হবে।'

রোকেয়া বোকার মত শহীদের দিকে চেয়ে রইল।

মি. সিম্পসন বললেন, 'কি হল? কোথায় যাবে, বল তো?'

'ড. রাজীকে কোথায় পাওয়া যাবে আমি তা আন্দাজ করতে পারছি। কে জানে দেরি হয়ে গেছে কিনা। চলুন এক্ষুণি। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়,' মি. সিম্পসনের হাত ধরে টান দিয়ে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল সে রোকেয়ার রুম থেকে।

মি. সিম্পসন কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু শহীদ যে অকারণে ব্যস্ততা প্রকাশ করছে না তা তিনি ভাল করেই জানেন। সুতরাং তিনিও ছুটলেন শহীদের

সঙ্গে সঙ্গে।

রোকেয়ার হতভম্ব ভাবটা কেটে গিয়েছিল। সে-ও চিৎকার করে বলল, 'যাব, আমিও যাব, সিম্পসন কাকু। দাঁড়ান আসছি আমি।'

সে যখন নিচে গিয়ে পৌঁছুল তখন শহীদ গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। রোকেয়া হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ির পাশে।

'আমিও যেতে চাই, শহীদ সাহেব, যদি অসুবিধা না হয়,' করুণ কণ্ঠে বলল রোকেয়া।

'বিন্দুমাত্র না। তবে সাবধান থাকবেন। উঠুন গাড়িতে!'

গাড়িটায় গতি সঞ্চারিত হবার আগেই ঠিক সামনে এসে থামল একটা বেবিট্যাক্সি। আর সেটা থেকে নামল কামাল। তাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। শহীদকে গাড়ি থামাতে ইশারা করে বেবিট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল সে।

শহীদ কৌতূহলী দৃষ্টিতে কামালের দিকে তাকিয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কামাল।

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। তুই আবার চলে যা।'

'কিন্তু তুই চললি কোথায় সদলবলে?'

'অভিযানে।'

'আমি গেলে হয় না?'

'উঁহু। তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছ তুমি।'

হতাশার ভঙ্গিতে কামাল বলল, 'তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

গাড়ি ছেড়ে দিল শহীদ।

একটু দূরে গিয়েই সে মি. সিম্পসনকে প্রশ্ন করল, 'মি. সিম্পসন, আশা করতে পারি কি আপনার সাথে আগ্নেয়াস্ত্র আছে একটা?'

'ক্ষুদ্র একটা অস্ত্র অবশ্যই আছে আমার কাছে।'

'আমরা যাচ্ছি কাজীপুরের জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়োবাড়িতে। সেখানে পৌঁছুলে অস্ত্রটা হাতেই রাখবেন, পকেটে বা হোলস্টারে নয়।'

'বেশ বেশ।'

তিন

কামালের তেষ্টা পেয়েছিল। খিদে লেগেছিল, দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্টও হচ্ছিল। ছায়ার সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাল সে। একটা বেবিট্যাক্সি পেলেও হয়।

একটা জীপ এসে থামল তার কাছে। গাড়ি থেকে নামল সমসের শিকদার স্বয়ং। সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল।

'আরে, শিকদার সাহেব যে!' কামাল উল্লসিত হয়ে বলল।

'তাই তো, কামাল সাহেব, একা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কি করছেন? নিশ্চয়ই কারও দিকে নজর রাখছেন?'

কামাল বলল, 'তাছাড়া আর কি। প্রকাশ্য দিবালোকে সদর রাস্তায় আমি লুকিয়ে আছি কিনা।'

'হেঃ হেঃ কি যে বলেন। আপনি তো বেশ রসিক লোক সাহেব। তা আপনার বন্ধুটি কোথায়?'

'শহীদের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাছাড়া আর কে হবে?'

'সে তো শিকারে বেরিয়েছে।'

'শিকারে গেছেন, কোথায়?'

'কাজীপুরের জঙ্গলে। সেখানে নাকি বাঘ বেরিয়েছে।'

'সে কি, সাহেব! ও তো আমার এলাকা। বাঘ বেরোলে থানাতেই খবর আসবে সকলের আগে। আর আমার মত শিকারী থাকতে···জানেন, সেবার সুন্দরবনে কি হয়েছিল?'

'এখনও জানতে পারিনি।'

কিন্তু বাঘ শিকারের গল্পটা শুরু করল না শিকদার।

'উহ্, কি অসহ্য গরম! আসুন সাহেব, আমার আবার অনেক কাজ। শুনেছেন তো, ড. কাসেম আল-রাজীকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না? এই আমি নিজে, মশায়, সারা তল্লাটি খুঁজেছি সকাল থেকে। প্রথমটায় ভেবেছিলাম, কোন জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছেন ভদ্রলোক অথবা বেখেয়ালে বেরিয়ে গেছেন।'

'বেখেয়ালে, মানে?'

'বোঝেন তো, এই সব সায়েন্টিস্ট মানুষের আবার খেয়াল-টেয়াল কম থাকে। মানে, দুনিয়া-দারীর ধান্দা থাকে না তো। হয়ত আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে কোথাও চলে গেলেন, নিজেই জানতে পারলেন না। উহ্, কি গরম! চলুন, ভিতরে যাই,' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল শিকদার। 'তোমরা একজন বাইরে থাক। আর দু'জন এস আমার সাথে,' কনস্টেবলদের উদ্দেশ্যে বলল সে শেষের কথাগুলো।

গেট খুলে ভিতরে ঢুকল শিকদার। একটু ইতস্তত করে কামালও পিছু নিল। গরমটা সত্যি অসহ্য।

সামনের রুমে কাউকে দেখা গেল না। রুমের দরজাগুলোও বন্ধ।

'কি হল, এরা সব গেল কোথায়?' বারান্দায় উঠে বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে বলল শিকদার।

'মিস রোকেয়া তো গেছে শহীদের সাথে।'

'বাঘ মারতে?' আকাশ থেকে পড়ল শিকদার।

'হ্যাঁ।'

'কি আশ্চর্য! বাবা নিখোঁজ, আর মেয়ে গেছে বাঘ মারতে। অথচ তখন কি কান্না। এই মেয়ে জাতটাকে বোঝাই মুশকিল, বুঝলেন, কামাল সাহেব? এই ধরুন না কেন, আমার গিন্নীই...।'

গিন্নীর গল্প শুরু করার সৌভাগ্য হল না শিকদার সাহেবের। ড্রইংরুমের দুয়ার খুলে বুড়ো জাকের এসে দাঁড়াল।

একটা হুঙ্কার ছাড়ল শিকদার সাহেব।

'কি হে, থাক কোথায়? অ্যাঁ, সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি আর পাত্তাই নেই তোমার! বাসার আর সব লোকজন কোথায়?'

ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গেল জাকের মিঞা।

মিনমিন করে সে বলল, 'হুজুরের কোন খবরই তো পাইনি, দারোগা সাহেব। আপা গেছেন শহীদ সাহেব আর সিম্পসন সাহেবের সাথে। এখন বাসায় শুধু আমি আর মইনুল বাবুর্চি আছি।'

'আর লোক নেই বাসায়?'

'জ্বি, না। আমরা তো এই কয়জন লোকই বাসায়।'

'হুঁ, সর দেখি, একটু বসতে দাও। যে জ্বালায় ফেলেছ, সব রাক্ষস-খোক্কস নিয়ে কারবার।'

জাকের ভয়ে ভয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল। শিকদার সাহেব ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকে একটা সোফায় বসে পড়ল। সোফাটা আর্তনাদ করে উঠল আর সে আর্তনাদে কেঁপে উঠল জাকের মিঞা। সে দারোগার ঘর্মাক্ত বিশাল কলেবরের দিকে একনজর তাকিয়ে ফ্যানের সুইচটা অন করে দিল।

কামাল একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল। শিকদারের পাল্লায় পড়াটা ঠিক হয়নি। এখন হয় তাকে শিকার না হয় গিন্নীর গল্প শুনতে হবে। অথচ ওদিকে শহীদ তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করেছে, আর পেটটাও তার খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে।

শিকদার বলল, 'দেখুন তো কি কাণ্ড। তখন তড়িঘড়ি করে চলে গেলুম। একটু ভাল করে চুরির তদন্তটা করতে পারলাম না, তাই ফিরে আসতে হল। অথচ এখন বাসায় লোক নেই। চাকর-বাকর আর বাসার মালিক তো আর এক কথা নয়।'

'কিন্তু ওরাও হয়ত কিছু আলোকপাত করতে পারে।'

'তা নিশ্চয়ই পারে। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। কিন্তু মিস রোকেয়া আর ড. রাজীর রুম আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। বুঝতেই তো পারছেন, আমরা হচ্ছি পুলিস অফিসার। আমাদের দায়িত্ব অসীম। হেলাফেলা করা উচিত নয়। আর আমার ব্যাপার তো জানেনই, কর্তব্যকে আমি জীবনের চাইতেও বড় মনে করি। প্রমোশনটাই তো বড় কথা নয়।'

সমসের শিকদারের পরম কর্তব্যনিষ্ঠার কথা জানা ছিল না কামালের। কিন্তু

সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ, সে তো সকলেরই জানা আছে।' কিন্তু শিকদারের এত কর্তব্যপরায়ণতার কারণটা আবিষ্কার করতে তার অসুবিধা হল না। টোপটা প্রমোশনের।

সমসের দারোগা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'জাকের মিঞা, তোমাদের সাহেবের আর তোমার আপার রুম-দুটো যদি আমি সার্চ করি তোমার আপত্তি নেই তো? যদি কোন সূত্র পাই চুরির ব্যাপারে···?'

মাথা নাড়ল জাকের মিঞা।

'না, কোন আপত্তি নেই।

'তাহলে আপনিও চলুন, কামাল সাহেব। তুমিও চল হে, বারান্দায় তো কনস্টেবল পাহারায় রইলই।'

মোগলের হাতে পড়লে খানা খেতেই হবে। অগত্যা আপত্তি করল না কামাল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

সিঁড়িতে শব্দ তুলে তিনজনের ছোট মিছিলটা দোতলায় উঠল। রোকেয়ার রুমে ঢোকবার আগেই কামাল প্রশ্ন করল, 'আপনি কি এর আগে মিস রোকেয়ার রুম তল্লাশি করেননি?'

'করেছি বলেই তো আবার আসতে হল। আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সেটা অমূলক কিনা জানবার জন্যেই তো আবার আসতে হল। আপনাকে পেয়ে অবশ্য ভাল হয়েছে।'

রুমে ঢুকল দু'জন। ক্লজিটটার দিকে দৃষ্টি পড়ল কামালের। ডান দিকের পাল্লার গা থেকে বৃত্তাকার একটা অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। চমকাল না কামাল। সে জানে, এটা কার কীর্তি।

সমসের শিকদার সোজা গিয়ে ক্লজিটটার সামনে দাড়াল। ভ্রূ কুঁচকে চোখ দুটো ছোট ছোট করে কিছুক্ষণ ক্লজিটটার কাটা জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'হুঁ, ঠিকই ধরেছিলাম।'

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'কি ধরেছেন, শিকদার সাহেব?'

'হুঁ হুঁ, আমার চোখে ফাঁকি দেবে এতটা মামদোবাজ কে আছে? তখুনি আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'ব্যাপার কি শিকদার সাহেব, আপনি আপন মনে কি বকছেন এসব?'

'এই যে, দেখতে পাচ্ছেন না?' ক্লজিটের কাটা জায়গাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল সমসের শিকদার, 'দেখেছেন, কি চমৎকারভাবে কেটে ফেলা হয়েছে জায়গাটা। অত্যন্ত ভাল ইস্পাতের তৈরি এই ক্লজিটটা। অথচ অবস্থাটা কি হয়েছে, দেখেছেন? আর নিচে দেখুন, ঐ যে হ্যাণ্ডেলটা পড়ে আছে কিছুটা ইস্পাতের পাতসুদ্ধ। দেখুন না? এই যে।'

অতিকষ্টে উবু হয়ে ইস্পাত-খণ্ডটা তুলে নিয়ে সে কামালকে দেখাল। বলল, 'এটা হচ্ছে তালা। আর দেখুন, এই হ্যাণ্ডেলের সাথেও এক্সট্রা লকিং সিস্টেম আছে।

চোর তালা খুলবার হাঙ্গামা পোয়াতে যায়নি। সোজা পাল্লাটাই কেটে ফেলেছে। এটা কি করে সম্ভব হয়েছে জানেন?'

'কি করে?'

'আল্ট্রাসোনিক্স-এর সাহায্যে।'

'সে আবার কি?' বোকামির ভান করল কামাল।

'হুঁ হুঁ,' কামালের মূর্খতার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে বলল, 'এটা হচ্ছে একটা রশ্মি। যাকে বলে শব্দ রশ্মি। এ এক অভূতপূর্ব শক্তিধর রশ্মি, সাহেব। এর আবিষ্কর্তাকে অবশ্য আপনার চেনা উচিত।'

'কে তিনি?' আবার আহাম্মকীর ভান করল কামাল।

সমসের শিকদার কামালের কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কাউকে এখুনি বলবেন না কিন্তু। এটার আবিষ্কর্তা হচ্ছেন দি গ্রেট কুয়াশা। আর গতরাতে তিনিই এখানে তশরীফ্ এনেছিলেন। এগুলো তাঁরই কীর্তি। ঐ যে জানালার শিক দেখুন, কি চমৎকারভাবে কেটে উপরের দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, খবরদার, এখন কাউকে বলবেন না কিন্তু।'

সমসের শিকদার কামালের কানের কাছে মুখ এনে অতি গোপনে যে কথাগুলো বলল তা শুধু অদূরে দাঁড়ানো জাকের মিয়াই শুনতে পেল না, কামালের ধারণা বাড়িসুদ্ধ সবাই তা শুনতে পেয়েছে। রাস্তার লোকের পক্ষেও শুনতে পাওয়াটা বিচিত্র নয়। সুতরাং এত গোপন কথাটা প্রকাশের আর অপেক্ষা রাখে না।

সে মাথা নেড়ে বলল, 'মাথা খারাপ, এত গোপন কথাটা কাউকে বলা যায়! কিন্তু আপনার ধারণা অভ্রান্ত তো?'

'নিশ্চয়ই। কুয়াশাই এসব কীর্তি করে বেড়াচ্ছে, বুঝলেন? রিসার্চ সেন্টারের খুনোখুনিই বলুন আর এই চুরিই বলুন। কিন্তু সাবধান, এখনও এসব কথা প্রকাশের সময় আসেনি। প্রমাণ চাই। আর সেই প্রমাণের জন্যেই আমি ফিরে এলাম। জানেন তো, অপরাধ-বিজ্ঞানের মতে, অপরাধী কিছু একটা প্রমাণ রেখে যাবে।"

'আর আপনি সেটা লুফে নেবেন। আইডিয়া আপনার রিয়েলী অপূর্ব। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন শিকদার সাহেব, এই চুরির ব্যাপারে কুয়াশা জড়িত হয়ত আছে কিন্তু ঐ খুনোখুনি বোধহয় সে করেনি। কারণ আমি যতদূর শুনেছি, কুয়াশা হত্যা করে না।'

'ওটা মিথ, বুঝলেন কামাল সাহেব? নিতান্তই অবিশ্বাস্য কথা। হেন অপরাধ নেই যা সে করেনি। খুন তো তার বলতে গেলে নেশা।'

'যদি সত্যও হয় তাহলেও তো কুয়াশাকে বোধহয় সব ঘটনার জন্যে দায়ী করা যায়।'

'নিশ্চয়ই, একশ' বার যায়।'

'রিসার্চ সেন্টারের গেটের ঐ মজবুত শিক কি কুয়াশার পক্ষে বাঁকানো সম্ভব? তাছাড়া ঐ তালাটা কি কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে মুচড়ে ভাঙা সম্ভব? তা-ও গেটের বাইরে থেকে, মানে উল্টোদিক থেকে। আর তালাটাতে যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে ওটাও কি কোন সাধারণ মানুষের হাতের ছাপ?'

সমসের শিকদার কামালের প্রশ্নের তোড়ে হকচকিয়ে গেল। নাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা লোম টানতে টানতে কিছুক্ষণ ভাবল সে। তারপর বলল, 'আপনি কুয়াশা সম্পর্কে কতটা জানেন আমি বলতে পারব না। তবে কুয়াশাকে দৈহিক শক্তি এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে যদি সাধারণের স্তরে ফেলেন তাহলে ভুল করবেন। আসলে সে একটা অসাধারণ শক্তিধর লোক। ঐ তালা ভাঙা বা গেটের শিক বাঁকানো আপনার-আমার পক্ষে অসাধ্য হতে পারে কিন্তু কুয়াশার কাছে সেটা একটা ছেলেখেলা মাত্র। আর হাতের ছাপের কথা বলছেন? আমার মনে হয়, ওর মধ্যেও কোন কারচুপি আছে যা আমরা ধরতে পারছিনে।'

কামাল স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, সমসের শিকদারের মাথায় কুয়াশা-ভূতটা বেশ ভাল করেই চেপে বসেছে। ওটা আর নামানো যাবে না, সুতরাং সে চেষ্টা করে লাভ নেই। সে রণে ভঙ্গ দিয়ে বলল, 'এখানে কি আরও কিছু দেখবেন, না ড: রাজীর রুমে যাবেন?'

'এ রুমে আমার কাজ শেষ হয়েছে। চলুন, ড. রাজীর রুমেই যাই।'

পাশের রুমটাই ড. রাজীর। মাঝখানের দরজাটা খোলা ছিল। রুমটাতে ঢুকে সমসের দারোগা আবার ভ্রূ কুঁচকে চোখ দুটো ছোট করে চার দিক তাকাল। কামালও তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কামরটার মধ্যে।

কোথাও অস্বাভাবিকতার কোন চিহ্ন নেই। সবকিছু সাজানো-গোছানো বিছানায় শয়নের চিহ্ন। মশারীটা তোলা রয়েছে। জানালাগুলো খোলা। এই রুমটাতেও আছে একটা ক্লজিট। তার দরজা বন্ধ। কামাল হ্যাণ্ডেল ঘোরাবার চেষ্ট করে ব্যর্থ হল। মুখে প্রকাশ না করলেও কোথাও কোন প্রমাণ বা অপরাধের কো সূত্র পাওয়া যায় কিনা তার জন্যে কামালও চেষ্টার ত্রুটি করল না। খাটের তল, ক্লজিটের তলায় কোথাও কোন বোতাম বা রুমাল বা সিগারেটের টুকরো পিল না।

সমসের শিকদার শেষটায় ক্লান্ত হয়ে বলল, 'তাহলে চলুন, যাওয়া যাক, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

নিচে নেমে আসতেই সমসের শিকদার বলল, 'চলুন না বাড়ির পিছনটা একবার দেখে আসি।'

'আবার পিছনটায় যাবেন?'

'আহা, চলুন না একবার। আপনারা যাকে বলে ইয়ংমেন অ্যাকটিভ হ্যাবিট। এত তাড়াতাড়ি কি ক্লান্ত হলে চলে? অথচ এই আমার ব্যাপারটাই ধরুন না, চুল তো সাহেব কবেই পড়ে গেছে, দাড়ি-গোঁফ পেকেছে অর্ধেক কিন্তু হ্যাঁ,

কাজে ফাঁক নেই,' নিজের বুকটা থাবড়ে বলল সে।

'আপনার ব্যাপারই আলাদা। ভাগ্যিস আপনার মত কিছু লোক পুলিস ডিপার্টমেন্টে আছে। তাই তো দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে যেতে যেতেও টিকে আছে। তা বেশ চলুন, একবার পিছনটা ঘুরে আসি।'

পিছনের দিকটা বলতে গেলে জঙ্গলে ভরা। ভেজা স্যাঁতসেঁতে, রাজ্যের লতাপাতা আর আগাছায় ছেয়ে আছে। মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দু'একটা লেবু গাছ। একটা ঝাঁকড়া গোলাপ গাছ।

প্রায় হাঁটু সমান চোরাকাঁটার মধ্যে দিয়ে দু'জন এগোতে লাগল। নিচে প্যাচপেচে ভেজা নরম মাটি।

যে জানালাটা শিক কাটা হয়েছে তার নিচে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কামালের তখন গোয়েন্দাগিরিতে ধৈর্য ছিল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সমসের শিকদারের কার্যকলাপ দেখতে লাগল।

সমসের শিকদার তার স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে ভ্রূকুঁচকে চোখ দুটো ছোট করে উপর-নিচে, ডাইনে-বাঁয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগল।

জানালার পাশে একটা পাইপ দেখতে পেয়ে সমসের শিকদার বলল, 'এই পাইপ বেয়েই কুয়াশা উপরে উঠেছিল। এই যে, পাইপের গায়ে কাদার ছাপ। এখন অবশ্য রোদে শুকিয়ে গেছে।'

কামাল সকৌতুকে বলল, 'একটু কাদা নিয়ে গেলে হয় না ওখান থেকে? কেমিক্যাল একজামিনেশনে হয়ত আশ্চর্য কোন তথ্য উদঘাটিত হতে পারে।'

প্রস্তাবটা মনঃপূত হল সমসের শিকদারের। সে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। অপরাধ বিজ্ঞানে বলা হয়েছে, অপরাধী কিছু একটা প্রমাণ রেখে যাবেই। তা এমনও হতে পারে যে, ঐ তুচ্ছ কাদার মধ্যেই অপরাধের অকাট্য প্রমাণ নিহিত আছে।'

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সমসের শিকদার পাইপের গা থেকে শুকনো মাটি তুলতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই তার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল।

'কি হল, শিকদার সাহেব?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল কামাল।

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব দিল না সমসের শিকদার। দ্রুত স্থানত্যাগ করে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে সরে গেল সে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এবং উঃ আঃ করতে করতে দু'হাত দিয়ে পা চুলকাতে লাগল। কামাল এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল শিকদারের প্যান্টের সর্বত্র লাল বড় বড় বিষপিঁপড়ে মনের আনন্দে বিচরণ করছে।

শিকদার তখন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। তার চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ। দু'হাত দিয়ে সে একবার চুলকোচ্ছে আর একবার পিঁপড়ে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। মুখ দিয়ে অবিরাম 'উহ্ আহ্' জাতীয় শব্দ বেরোচ্ছে।

কামাল দ্রুত সমসের শিকদারের সাহায্যে এগিয়ে গেল।

চার

শহীদ ও কামাল চলে যেতেই কলিমকে নিয়ে আবার জঙ্গলে ফিরে এল কুয়াশা।

কলিম জিজ্ঞেস করল, 'আবার ফিরছ যে, ভাইয়া?'

'লোকটা পালিয়ে গেল কোন পথে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আর একটা ডিটোনেটর সেট বসাতে হবে। ও কাজটা তুই-ই করতে পারবি। দরকার হলে পুরো বাড়িটা উড়িয়ে দেব।'

'পারব আমি। গাড়ির বুটেই আছে একটা ডিটোনেটর সেট। কিন্তু তুমি কি মনে কর লোকটা আবার ফিরবে এখানটায়?'

'ফেরাটাই স্বাভাবিক।'

'আমরা জায়গাটা চিনে ফেলেছি তা জানবার পরেও?'

'হ্যাঁ। সে ফিরবে না বলে আমরা ধরে নেব এবং এখানটায় আমরা আর আসব না, এই ধারণা করেই সে ফিরে আসবে। তাছাড়া যতদূর মনে হয়, এটাই হচ্ছে ওর প্রধান ডেরা। লোকটার কাছে আরও একটা দৈত্যাকার মানুষ আছে। আমার বিশ্বাস, সে আছে এখানেই। আর আছে এখানে একটা ল্যাবরেটরি। ঐ ল্যাবরেটরিতেই সে ঐ দুই গরিলাসদৃশ মানুষের জন্ম দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং ফিরতে তাকে হবেই। এবং শিগগিরই ফিরবে সে। হয়ত দু-এক ঘন্টার মধ্যেই।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'তার পরিচয় যে প্রকাশ পেয়েছে একথা এখন আর তার অজানা নেই। সুতরাং তাকে এখন আত্মগোপন করতে হবে। আর তারজন্যে এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম স্থান। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এখানকার কাজ গুছিয়ে নিয়েই পালাবে।'

কথায় কথায় দু'জন কুয়াশার অচল জোডিয়াকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা কাঠের বাক্স আর অনেকটা তার বের করল কলিম বুট থেকে।

কুয়াশা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'চল।'

আবার সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। নিঃশব্দে দু'জন হেঁটে চলল পোড়োবাড়ির দিকে। কাছাকাছি পৌঁছুতেই কুয়াশা কলিমকে ডিটোনেটর সেটটা ফিট করার নির্দেশ দিয়ে পোড়োবাড়ির প্রবেশ-পথ খুঁজতে চলল।

বাড়িটার খুব কাছেই যে কোথাও একটা সুড়ঙ্গ-পথ আছে সে ব্যাপারে কুয়াশা নিশ্চিত। সেই সুড়ঙ্গ-মুখটা খুঁজে বের করতে চলল সে। একটা মাঝারি আকারের ডাল ভেঙে নিল সে হাতে। মাটির দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলল। প্রায় আধঘন্টার মধ্যে পোড়োবাড়িটার চারদিকে বার তিনেক ঘুরে এল।

একমাত্র ইঁদুরের গর্ত ছাড়া আর বড় কোন গর্ত তার চোখে পড়ল না।

তৃতীয় বার পরিক্রমা শেষ করে কলিমের কাছে ফিরে এল কুয়াশা। কলিম জানাল যে, সে ডিটোনেটর সেট ফিট করে ফেলেছে। ল্যাণ্ড-লাইন ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছে পোড়োবাড়ির মধ্যে। এক্সপ্লোসিভটা বেশ ভাল জায়গাতেই রেখে এসেছে।

কুয়াশা খুশি হয়ে বলল, 'বেশ, তাহলে আয় আমার সাথে। আমি তো এখনও আমার কাজ শেষ করতে পারলুম না।'

'তাহলে চল না, বেড়ার তলা দিয়েই ঢুকে পড়ি।'

'তাতে লাভ নেই। ঐ পথটা খুঁজে বের করা দরকার। না হলে আবার সে হয়ত ঐ পথেই পালাবে।'

'তা বটে, চল তাহলে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পোড়োবাড়িটার পূর্বদিকে এগিয়ে গেল। বড় গাছপালার নিচে ছোট একটা অতি ঝাঁকড়া ঝোপ। বেশ অন্ধকার জায়গাটা, সূর্যের আলোও বড় একটা এসে পৌঁছায় না। সেখানটায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। তার চোখ দুটোতে আশার আলো জ্বলে উঠল।

ঝোপটার দিকে এগোল সে। কাছে যেতেই তার চোখে পড়ল একটা সিগারেটের টুকরো। আপন মনে হাসল সে। পাওয়া গেছে তাহলে এতক্ষণে। লতায়-পাতায় আচ্ছন্ন হলেও মাটিটা পরিচ্ছন্ন। ঘাস নেই জায়গাটাতে।

হাতের ডালটা লতা-পাতার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে গুচ্ছটা উপরের দিকে তুলে ধরতেই দেখা গেল কুয়োর মত একটা গর্ত।

কলিম পাশে এসে গুচ্ছটা তুলে ধরল দু'হাত দিয়ে। গর্তটা আরও স্পষ্ট দেখা গেল।

কুয়াশা বলল, 'তুই এখান থেকে একটু দূরে গিয়ে একটা গাছে উঠে বসে থাক। আমি ভিতরটা দেখে আসি।'

'কেউ যদি ঢোকে, মানে সেই লোকটাই যদি ফিরে আসে?'

'সোজা গুলি করবি, যদি পারিস।'

কুয়োর দিকে এগিয়ে গিয়ে মাথাটা নুইয়ে নিচের দিকে তাকাল কুয়াশা। একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল তার। বাঁধানো সিঁড়ি। সিমেন্টহীন ইঁটগুলো অবশ্য দাঁত বের করে আছে।

কলিমকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে কুয়াশা নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

খাড়া সিঁড়ি শেষ হতেই সরু প্যাসেজ, দুর্ভেদ্য অন্ধকার পথ। কুয়াশার পকেটে টর্চ ছিল বলে অসুবিধা হল না। প্রায় দু'মিনিট এগিয়ে যাবার পর অদূরে আলোর সরু রেখা দেখতে পেল। আরও একটু কাছে যেতেই কুয়াশা দেখল সাদা ধবধবে দেয়ালের উপরে নিওন বাতি জ্বলছে। প্যাসেজ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দু'হাত উঁচু করিডর, উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে। প্যাসেজের ঠিক সামনেই দরজা।

টর্চটা পকেটে ফেলে রিভলভার বের করল কুয়াশা। সাইলেন্সার লাগাল তাতে দ্রুত হাতে। আর তিনহাত দূরেই করিডর। প্যাসেজের দেয়ালের সাথে দেহটাকে মিশিয়ে দিয়ে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কোন শব্দ কানে এল না। মাথাটা সামান্য বাড়িয়ে দিল কুয়াশা। আলোকিত করিডরে কেউ নেই। ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকেই দেখল সে। কাউকে দেখতে পেল না। সামনের দরজাটা ছাড়া আর কোন প্রবেশ পথও চোখে পড়ল না।

ধীরে, অতি ধীরে সে করিডরে পা রাখল। সামনের দরজাটা খুলে গেল আপনা আপনি। এবং কুয়াশা অবাক হয়ে দেখল, দরাজার ঠিক মাঝখানটায় গ্রীবাভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে বিশালকায় একটা কালো কুকুর।

কুকুরটা গর্জন করল না। কিন্তু অপরিচিত আগন্তুককে দেখতে পেয়েই তার চোখে ফুটে উঠল হিংস্রতা। সামনের দাঁতগুলো বের করে সে দু'পা শূন্যে তুলে ঝাঁপ দিল কুয়াশার দিকে। কুয়াশাও প্রস্তুত ছিল। তার হাতের সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে 'দুপ' করে দু'বার শব্দ হল। করিডরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কুকুরটার সুবিশাল দেহ।

কয়েকবার উল্টে-পাল্টে স্থির হয়ে গেল কুকুরটার দেহ। রক্তে ভিজে গেল করিডর। কুয়াশার জামাকাপড়েও রক্তের ছিটে এসে লাগল।

পাহাড়ের মত বিশাল দেহটার দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কুয়াশা। সুপারম্যানের কৃতিত্বকে মনে মনে সে তারিফ করল। সত্যি লোকটা এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা তার বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক হল। সুপারম্যান যদি এই সুড়ঙ্গ-পথেই ফিরে আসে তাহলে সে সুড়ঙ্গে ঢুকেই তার অস্তিত্বের খবর জানতে পারবে। কিন্তু পোড়োবাড়িটার মাটির নিচের পুরো রহস্যটা না জানা পর্যন্ত তার নিজেরও স্বস্তি নেই। এখানে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা তার বরাবরই ছিল কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে তার চলবে না। অবশ্য ঢুকেই সে একটা বড় রকমের বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছে। লোকটা শুধু দানবাকার মানুষই জন্ম দিতে জানে না, বিশালকায় কুকুরও সে জন্ম দিতে সক্ষম। হয়ত আরও অনেক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা কুয়াশার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সামনের রুমটায় ঢুকল কুয়াশা।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা-আপনি।

'এই দরজার রহস্যটা আগে সমাধান করতে হবে আমাকে, আপন মনে বলল কুয়াশা। ভিতর থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা না করতে পারলে হয়ত অনন্তকাল ধরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে এখানে। তবে দরজাগুলো লোহার বলেই রক্ষা। আল্ট্রাসোনিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে সে নির্বিবাদে বেরোতে পারবে। কিন্তু যদি সেটা কোন কারণে হাত-ছাড়া হয়ে যায় তাহলে বিপদে পড়তে হবে তাকে। সুতরাং বিকল্পটা জেনে রাখা ভাল।

রুমের চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করল সে।

দর্শনীয় তেমন কিছু নেই। এটাকে বোধহয় কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। রুমের ঠিক মাঝখানে বিরাট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে শুধু। উল্টো দিকে আর একটা দরজা। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। ভেবেছিল, এই দরজাটাও আপনা-আপনি খুলবে। কিন্তু তা খুলল না। আস্তে ঠেলল কুয়াশা দরজাটা। তবু খুলল না।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না কুয়াশার। অন্তত এই দুটো দরজা খোলা আর বন্ধ করার চাবিকাঠি এই রুমেই কোথাও আছে এবং যেহেতু দেয়ালে কোথাও কোন সুইচ নেই সুতরাং রহস্যটা আছে টেবিলেরই কোথাও।

টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই ধরনের টেবিলের রহস্যও তার মোটামুটি জানা। টেবিলের উপরের কাঠটার বদলে থাকে ইস্পাত। কাঠের সমানই পুরু। ইস্পাতের দুটো পাত দিয়ে তৈরি। মাঝখানে থাকে গোপনীয় কোন বস্তু।

টেবিলের উপর টোকা দিল কুয়াশা। তার ধারণা নির্ভুল। একপ্রান্তে আঙুল দিয়ে উপরের দিকে চাপ দিল। ইস্পাতের ডালাটা উপরে উঠে গেল। সামনে ভেসে উঠল সারিসারি সুইচ। অসংখ্য তার। এক হাতে ডালাটা ধরে অন্য হাতে সে সুইচ টিপতে লাগল একের পর এক। কয়েকটা সুইচ টিপতেই খুলে গেল বাইরের দরজাটা। সেটা অফ করে দিয়ে অন্যগুলো টিপতে লাগল সে। অবশেষে ভিতরের দিকের দরজাটা খুলে গেল। একটা ল্যাবরেটরির অংশ ভেসে উঠল কুয়াশার চোখের সামনে। ডালাটা নামিয়ে রেখে সে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ল্যাবরেটরিটার ভিতরে ঢুকল।

বিরাট ঘরটা জুড়ে একটা অতি আধুনিক ল্যাবরেটরি। কুয়াশার মনে হল যেন সে পাশ্চাত্যের কোন অতি সফিস্টিকেটেড ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঘুরে ঘুরে সে ল্যাবরেটরিটা দেখতে লাগল। সেটা দেখা শেষ হতেই চলে গেল পাশের রুমটাতে। রুমটা অপেক্ষাকৃত ছোট। এখানে আছে র‍্যাকভর্তি অসংখ্য কাঁচের জার আর নানা আকারের টেস্ট-টিউব। মাঝখানে একটা চেয়ার ও টেবিল।

পরের রুমটায় ঢুকল কুয়াশা। একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বলা যেতে পারে রুমটাকে। ছোট বড় খাঁচার মধ্যে রকমারি প্রাণী—ইঁদুর, গিনিপিগ, কুকুর, বিড়াল। কিন্তু প্রাণীগুলো অদ্ভুত। প্রত্যেকটিই বিশাল আকারের। দেশী কুকুরটা অ্যালসেশিয়ানের দ্বিগুণ, বিড়ালটা প্রায় কুকুরের সমান। রংটা সবুজ। চোখের তারা দুটো গভীর নীল! ইঁদুর আর গিনিপিগগুলোও আকারে বৃহৎ। নীল রং-এর বাঁদরটা ভালুকের চাইতেও বড়…।

আর কুয়াশা অবাক হয়ে দেখল প্রত্যেকটি প্রাণীরই চোখে হিংস্রতা। বাইরে তার গুলির আঘাতে নিহত কুকুর আর পেদ্রোর মতই এই প্রাণীগুলোও নির্বাক। কিন্তু অজ্ঞাত আগন্তুককে সামনে দেখে প্রত্যেকটা প্রাণীই অস্থিরতা প্রকাশ করছে। সবাই দাঁত আর নখ দিয়ে খাঁচার মজবুত শিক কামড়াচ্ছে আর হিংস্র দৃষ্টিতে

কুয়াশার দিকে তাকাচ্ছে। যেন নাগাল পেলে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে।

যেন এক শব্দহীন হিংস্রতার জগৎ।

এই রুমটাই শেষ। ফিরে এল কুয়াশা ল্যাবরেটরিতে। একটা ঘোরানো সিঁড়ি চলে গেছে উপরের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল কুয়াশা।

এটা সেই রুম যেখানে সুপারম্যানের সাথে তার লড়াই হয়েছিল কয়েকঘন্টা আগে। এখনও সেখানে পড়ে আছে নিহত পেদ্রোর বিরাট দেহটা। রুমটা ছেড়ে সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সিঁড়ি বেয়ে দেয়াল আলমারির দরজা দিয়ে বড় রুমটায় গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা।

আপন মনে প্রশ্ন করল, আর একটা সুপারম্যান গেল কোথায়?

হয় তাকে অন্য কোথাও সরানো হয়েছে নয় তো ভূ গর্ভের কোন গোপন কামরায় লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। দানবটা হয়ত যে-কোন মুহূর্তে তার সামনে এসে হাজির হতে পারে।

কিন্তু আপাতত কোন দানব হাজির হল না তার সামনে।

নিঃশব্দ পুরীতে হঠাৎ খুব কাছে থেকেই একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল কুয়াশার। অতি ক্ষীণ শব্দ। পিছনে দেয়াল-আলমারির দরজার দিকে ফিরে তাকাল কুয়াশা। শব্দটা আসছে সিঁড়ি থেকেই। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না সেখানে। আলোকোজ্জ্বল সিঁড়িটাতে কেউ নেই।

আবার কানে এল শব্দটা। তার মনে হল, শব্দটা এল বাইরের দরজার দিক থেকে। নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল কুয়াশা। রিভলভারটা উপরের দিকে তোলবার আগেই খোলা দরজার সামনে একটা মূর্তিকে দেখা গেল। তার হাতে উদ্যত পিস্তল।

লোকটা আর কেউ নয় শহীদ। সে বজ্রকণ্ঠে বলল, 'খবরদার! রিভলভার উপরের দিকে তোলবার চেষ্টা করেছ কি মরেছ। ফেলে দাও। ফ্যাল তোমার হাতের রিভলভার।'

বক্তার দিকে তাকাল কুয়াশা। সে একা নয়, তার পিছনে আছে আরও দু'জন লোক। একজন ড. রাজী আর অন্যজন সেলিম আতহার। সবিস্ময়ে তারা তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে, তাদের চোখের পলক পড়ছে না।

ঠোঁটটা ঈষৎ বাঁকিয়ে শহীদের দিকে তাকিয়ে কুয়াশা রিভলভারটা মেঝের উপর রেখে দিয়ে উপরের দিকে দু'হাত তুলে দাঁড়াল।

শহীদ বলল, 'লুক ডক্টর' হি ইজ দ্য ডেভিল।'

সেলিম বলল, 'আশ্চর্য, আলী সাহেবই তাহলে নাটের গুরু?'

শহীদ বলল, 'লোকটা আলী সাহেব নয়। ঐ লোকটাই হচ্ছে কুয়াশা।'

'কুয়াশা!' চমকালেন ড. রাজী।

'হ্যাঁ, কুয়াশা,' কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল। 'ইয়েস মি. কুয়াশা, মুখ

ফিরিয়ে দাঁড়াও। আর ঢুকে পড় ঐ দেয়াল-আলমারির ভিতরে...ঢুকে পড়। যাও।'

নিরীহ শিশুর মত কুয়াশা আলমারির দিকে এগিয়ে গেল।

'দেখবেন, আসুন।'

অস্পষ্ট কণ্ঠে কি যেন বললেন ড. রাজী। ঠিক বুঝতে পারল না কুয়াশা।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আবার সেই রুমটাতে গিয়ে দাঁড়াল সে যেখানে পড়ে আছে অতিকায় মানবটার মৃতদেহ। পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওরাও এগিয়ে আসছে।

রুমটার দরজার কাছেই পদশব্দগুলো থেমে গেল। কে যেন চরম বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করে উঠল। সম্ভবত সেলিম আতহার।

কুয়াশা বুঝতে পারল, দানবটার মৃতদেহ দেখে চমকে উঠেছে সে।

পদশব্দগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। কুয়াশা চোখের কোণ দিয়ে দেখল, ড. রাজী ও সেলিম গিয়ে মৃতদেহটার পাশে দাঁড়াল।

'খবরদার, কুয়াশা! কোনরকম বাঁদরামি আমি সহ্য করব না।'

আর একটা ধমক কানে এল তার।

ড. রাজী ও সেলিম আতহার নিচুস্বরে কি যেন আলাপ করছিলেন কিন্তু তা কানে পৌঁছুল না কুয়াশার। সে তখন দ্রুত চিন্তা করছে। রিভলভারধারী লোকটা যে শহীদ নয় আর তাদেরকে যে জামাই-আদর করতে নিয়ে আসেনি লোকটা, ড. রাজী ও সেলিম আতহারকে তা বোঝানো দরকার। অনেক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকেও সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। তাই নিজের জন্যে ভাবে না সে। কিন্তু শহীদের ছদ্মবেশে ড. রাজী ও সেলিম আতহারকে যে সুপারম্যান শয়তানটা এখানে নিয়ে এসেছে হত্যা করার জন্যে তা এখুনি জানিয়ে দেওয়া উচিত ওদেরকে। তাতে ওরা সতর্ক হতে পারবে। আত্মরক্ষার জন্যে চেষ্টা করতে পারবে, অন্তত কুয়াশা যদি ওদেরকে বাঁচাতে পারে তাহলে ওদের সহযোগিতাটুকু পেতে পারে সে।

শহীদবেশী লোকটার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে সেলিম আতহারকে বলল, 'মি. আতহার, প্লীজ হেল্প মি। পুলিস বছরের পর বছর এই লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, পায়নি। আজ আমি তাকে হাতে পেয়েছি, সে যাতে আর পালাতে না পারে তারজন্যে আপনাদের সহযোগিতা আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'নিশ্চয়ই বলুন কি করতে হবে?'

'এই হাতকড়াটা পরিয়ে দিন কুয়াশার হাতে।'

'কিন্তু আমি তো হাতকড়া পরাতে জানি না, তাছাড়া...।'

'তাহলে আপনি রিভলভার ধরে দাঁড়ান। আমিই হাতকড়াটা পরিয়ে দিচ্ছি। সাবধান, লোকটা বাড়াবাড়ি করলেই গুলি করবেন। তবে দেখবেন, শেষটায় যেন আমাকেই প্রাণে মারবেন না।'

হাসির শব্দ শোনা গেল। হাসছে শহীদবেশী সুপারম্যান।

'নিশ্চয়ই না, যদিও আমি ভাল মার্কসম্যান নই।'

'হাত দুটো পিছনের দিকে নামাও, কুয়াশা।'

হাত নামাল কুয়াশা। হাতকড়া পরিয়ে চাবি লাগিয়ে দিল শহীদবেশী লোকটা। তারপর তার নিতম্বে লাথি মেরে বলল, 'যাও যাও, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও। আসুন, ড. রাজী।'

দাঁতে দাঁত চাপল কুয়াশা। ঘুরে দাঁড়াল সে। শহীদবেশী লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'মি. পারভেজ ইমাম, তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

সচকিত হল লোকটা। কুয়াশার দিকে না তাকিয়ে এক লাফে সেলিম আতহারের কাছে গিয়ে তার হাত থেকে রিভলভারটা প্রায় ছিনিয়ে নিল সে।

সেলিম ও ড. রাজীও কুয়াশার মুখে পারভেজ নামটা শুনে চমকে উঠেছিলেন। দু'জনই কুয়াশা আর শহীদবেশী লোকটার দিকে তাকাল। পরস্পরের মধ্যেও দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল।

ততক্ষণে শহীদবেশী লোকটা রিভলভারটা ড. রাজী ও সেলিম আতহারের দিকে তুলে ধরেছে। সে এক রহস্যময় হাসি হেসে ভ্রূকুটি করে ড. রাজীকে বলল, 'কুয়াশা ভুল বলেনি। ড. রাজী, আমিই পারভেজ ইমাম এবং আই অ্যাম দ্য সুপারম্যান। আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যেই শহীদ খানের ছদ্মবেশ ধরেছিলাম। আমি আপনাদের সবাইকে হত্যা করব,' নির্বিকার শোনাল পারভেজের কণ্ঠস্বর।

আতঙ্কে ও বিস্ময়ে পারভেজের দিকে তাকিয়ে রইল ড. রাজী। কিন্তু সেলিম চিৎকার করে উঠল, 'তুই পারভেজ, তুই আমাদের সাথে এতবড় প্রতারণা করলি! আর তাই নয় শুধু, আমাদের হত্যাও করতে চাস তুই! কি অপরাধ আমরা করেছি তোর কাছে?'

বিদ্রূপের হাসি হাসল সুপারম্যান, 'অপরাধ একটাই। তোমরা ইউজেনিকসের রহস্য জেনেছ, এটাই তোমাদের অপরাধ। অবশ্য একদিক দিয়ে অপরাধ আমারও। কারণ হাকিম মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের ভূ-গর্ভে ইউজেনিকসের যে গবেষণা চলছিল তা সফল হয়েছে শুধু আমি পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম বলেই। তার অনেক আগেই বলতে গেলে আজ থেকে চার বছর আগে-অর্থাৎ রিসার্চ সেন্টারে যোগ দেবারও আগে আমি ঐ বিদ্যা আয়ত্তে এনেছি এবং দুটো দৈত্যাকার বংশবদ মানুষেরও জন্ম দিয়েছি। তার একটার লাশ পড়ে আছে তোমাদের সামনে। আর একটা এখানেই আছে। জ্যান্ত দৈত্য দেখে তোমরা তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করবে। কিন্তু হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ভেবে দেখলাম, ইউজেনিকসের রহস্য তোমাদের জানানো ঠিক হয়নি। তাই তোমাদের নিয়ে এলাম এখানে। তোমরা বেঁচে থেকে যে আমার ক্ষতি করবে তা আমি চাই না।'

'কিন্তু তোমার ক্ষতি করব কিভাবে?' চিঁচিঁ করে উঠল সেলিম। সে তখনও বাঁচবার আশা ত্যাগ করতে পারেনি।

'একমাত্র আমি ছাড়া অন্যের পক্ষে ঐ বিদ্যা জ্ঞ নাটাই আমার পক্ষে ক্ষতিকর। ঐ পবিত্র বিজ্ঞানটি একমাত্র আমারই আয়ত্তে থাকবে, এটাই আমি চাই। বিরাট আমার আকাঙ্ক্ষা, আকাশ-ছোঁয়া আমার পরিকল্পনা। আমি, আমি সুপারম্যান, তোমাদের মত সাধারণ নই। আমি অনন্যসাধারণ, তোমাতে আমাতে তফাত অনেক। তোমরা শুধু আমার বংশবদ আজ্ঞাবহ হবার উপযুক্ত। কিন্তু আমার দরকার আরও ভাল আরও দক্ষ ও নীরব ক্রীতদাসের। সুতরাং আমি দুনিয়ায় একের পর এক নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জীব-জানোয়ার, এমনকি আমার একান্ত অনুগত মানুষ সৃষ্টি করব যাদের সাহায্যে আই শ্যাল বি দ্য মনার্ক অব দিস প্ল্যানেট।'

ড. রাজী এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। ভীত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন পারভেজের দিকে। কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই বোধহয় তিনি বুকে বল ফিরে পেলেন। তিনি করুণ হাসি হেসে বললেন, 'তুমি আস্ত উন্মাদ একটা, পারভেজ। আস্ত উন্মাদ তুমি।'

'আমি উন্মাদ? হাঃ হাঃ হাঃ হা।' আকাশ ফাটিয়ে হাসল পারভেজ। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে হেসে সে বলল, 'দুঃখের বিষয় আমি উন্মাদ না স্থিতধী, তা দেখবার জন্যে বেঁচে থাকবার সৌভাগ্য আপনার হবে না। কিন্তু থাক, এসব কথার দরকার নেই। চলুন আপনারা। ঐ যে, রুমটার কোণের দিকে এগিয়ে যান। ঘোরানো সিঁড়ি আছে। কুয়াশা, তুমি যাও সকলের আগে।

অতিকায় প্রাণীগুলোকে যে রুমে খাঁচার মধ্যে ভরে রাখা হয়েছে সেই রুমে কুয়াশা, ড. রাজী ও সেলিম আতহারকে হাজির করল পারভেজ। ড. রাজী ও সেলিম সবিস্ময়ে অতিকায় জীব-জন্তুগুলোকে দেখতে লাগল। প্রাণীগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

পারভেজ বলল, 'এই রুমটার নাম দিয়েছি আমি সুপার জ্যু। এখানে আছে আমার উদ্ভাবিত সুপার এনিম্যাল। এরা প্রত্যেকেই ভয়ঙ্কর হিংস্র। আমার ইচ্ছা, কুয়াশাকে এদেরই হাতে দেওয়া এবং ওকে এরা কিভাবে খতম করে সেটা উপভোগ করা।'

তার এই হিংস্র অভিলাষের ঘোষণায় কেউ কিছু বলল না। ড. রাজী ও সেলিম আতহার আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেন।

কুয়াশা দাঁতে দাঁত চাপল।

'আমার প্রিয় কুকুর ফ্র্যাংকেনস্টাইন পাহারা দিচ্ছে সুড়ঙ্গ পথ। অনেক দিন হল তার মানুষের মাংস জোটে না। যাই তাকে নিয়ে আসি। কিন্তু সাবধান সেলিম, পাগলামি করতে যেয়ো না। তাহলে নির্ধারিত সময়ের আগেই মারা পড়বে। আর তোমাদের দু'জনের জন্যে শান্তিময় মৃত্যুর যে ব্যবস্থা করে রেখেছি সেটাও তাহলে আমি প্রত্যাহার করে ঐ প্রাণীগুলোর হাতেই তোমাদেরকে তুলে দেব,' কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো বলে কুয়াশার দিকে আর একবার তীব্র দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল

পারভেজ। দরজাটা বন্ধ করে দিল। দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ কানে এল।

অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল সেলিম ও ড. রাজী। কুয়াশা দেরি করল না। সে সেলিমকে বলল, 'প্রাণে বাঁচবার ইচ্ছে আছে আপনাদের, না নেই?'

প্রশ্নটা সেলিম আতহারের কানে ঢুকলেও বোধহয় মস্তিষ্কে পৌছাল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল।

'সেলিম সাহেব?'

'উঁ। কিছু বললেন?'

'প্রাণে বাঁচতে চান, না এখানে হিংস্র প্রাণীগুলোর শিকার হতে চান?'

সেলিমের দু'চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল।

কুয়াশা বলল, 'আমার কোমরে দেখুন দেশলাইয়ের বাক্সের চাইতেও ছোট একটা বাক্স আছে। শিগগির ওটা বের করুন, দেরি করবেন না। আমাদের হাতে সময় অতি অল্প। পিঠের দিকে ঠিক মাঝখানে দেখুন।

দ্রুত হাতে বাক্সটা বের করল সেলিম।

'দেখুন ছোট একটা বোতাম একদিকে। উল্টোদিকটায় আছে একটা ফুটো। ফুটো দিকটা হাতকড়ার কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে চেপে ধরে সুইচটা টিপুন।'

নীরবে কুয়াশার নির্দেশ পালন করল সেলিম। ড. রাজী চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন হাতকড়ার ইস্পাত দ্রুত গলে যাচ্ছে। মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই কড়া দুটো আলাদা হয়ে গেল।

'ধন্যবাদ। দিন ওটা।'

সেলিম বাক্সটা কুয়াশার হাতে দিয়ে চাপা স্বরে প্রশ্ন করল, 'দ্রব্যটা কি?'

ড. রাজীও সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

কুয়াশা বলল, 'এটা হচ্ছে একটা মিনি আল্ট্রাসোনিক্স বক্স। এইরকম দুঃসময়ে খুব কাজ দেয়।'

দরজার অপরদিকে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কুয়াশা পকেট থেকে কিছু একটা বের করে আগের মতই হাত দুটো পিছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। পারভেজ ঢুকল। ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছিল তাকে। সে রিভলভারটা কুয়াশার দিকে উদ্যত করে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'বটে, তোমার এমন দুঃসাহস! তুমি ফ্র্যাংককে খুন করেছ! দাঁড়াও। তোমাকে কঠোরতম শাস্তি দেব, কুকুর নয় ঐ হিংস্র বাঁদরটার হাতে সঁপে দেব তোমাকে। ওর লোভ হচ্ছে চোখের দিকে, তোমার চোখ দুটো উপড়ে খাবে।'

ড. রাজী ও সেলিম আতহারের দিকে দৃষ্টি ফেরাল পারভেজ, 'আপনারা পাশের রুমে চলে যান আপাতত। আমি খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে আসছি।'

বীভৎস হাসি হেসে সে আবার বলল, 'ভয় নেই। ঘটনাটা আপনারাও প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। দরজার পাল্লায় কাঁচ বসানো আছে। সেটা বের করে দিলেই আপনারা পাশের রুম থেকে মহোৎসবটা দেখতে পাবেন। তবে বেরিয়ে যাবার

চেষ্টা করবেন না, ব্যর্থ হবেন। যান, দেরি করবেন না।'

কুয়াশার দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে ড. রাজী ও সেলিম বেরিয়ে পাশের রুমের দিকে এগোল। দরজাটা বন্ধ করার জন্যে পারভেজ পিছন ফিরতেই কুয়াশা ঝড়ের বেগে এসে প্রচণ্ড একটা লাথি হাঁকাল পারভেজের হাঁটুতে। আক্রমণের প্রচণ্ডতা ও আকস্মিকতায় পারভেজ দু'হাঁটু মুড়ে গিয়ে মাথাটায় দরজার গুঁতো খেল। কিন্তু পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। পারভেজের ডানহাতটা তখন কুয়াশার পায়ের কাছে।

কুয়াশা ডান পা দিয়ে পিস্তলধরা হাতটাতে লাথি মারল। কিন্তু পারভেজ হুঁসিয়ার ছিল। সে সাঁ করে হাতটা সরিয়ে গুলি ছুঁরল পর পর দু'বার। কিন্তু ততক্ষণে সরে গিয়েছে কুয়াশা। সুযোগ বুঝে সে পারভেজের চোয়ালে সজোরে ঘুসি চালাল। পারভেজ মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করতেই ঘুসি লাগল ভুরুতে। কপাল কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। পর পর দু'বার ঘুসি চালাল কুয়াশা। পারভেজ ছিটকে পড়ল একটা খাঁচার উপর এবং সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে। আবার দু'রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ল সে। কুয়াশা আত্মরক্ষা করল অন্য একটা খাঁচার আড়ালে লুকিয়ে। আবার গুলি করল পারভেজ এবং এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কুয়াশাও খাঁচার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

পরপর গুলির আওয়াজ শুনে ড. রাজী ও সেলিম আতহার কাঁপছিল। তারা যতটা সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে একটা কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের আতঙ্ক-বিহ্বল চোখের সামনে দিয়ে পারভেজ বেরিয়ে গিয়ে অন্য একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল মুহূর্তের মধ্যে। একবার ফিরেও তাকাল না ওদের দিকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওরা দু'জন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কুয়াশা ওদের ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল, 'কোনদিকে গেল?'

তাকে দেখে সেলিমের সংবিৎ ফিরে এসেছিল। সে বন্ধ দরজাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দরজাটা খোলবার চেষ্টা করল না কুয়াশা। সে বলল, 'চলুন, আমরা অন্যপথ দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দেরি করলে আবার আমাদের উপর হামলা হতে পারে। এখনও সে লুকিয়ে আছে এই বাড়িটার মধ্যেই। সুযোগ পেলেই হামলা করবে। নেহায়েত ওর রিভলভারে আর মাত্র একটা গুলি আছে বলে গা ঢাকা দিয়েছে ও। যে-কোন মুহূর্তে গুলি ভরে নিয়ে এসে হামলা চালাতে পারে।'

'চলুন,' ড. রাজী কুয়াশার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

উপরের যে রুমটাতে কুয়াশা ধরা পড়ে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। তার রিভলভারটা এখনও সেখানে পড়ে আছে। কুয়াশা রিভলভারটা তুলে পকেটে ঢোকাল।

খোলা দরজার দিকে এগিয়ে চলল ওরা। কাছেই ভারি পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন দৌড়ে আসছে। শব্দটা আসছে খোলা দরজার দিক থেকেই। ড. রাজী ও

সেলিম ছিল কুয়াশার সামনে। সে লাফ দিয়ে ওদের দু'জনের সামনে এগিয়ে গেল।

'দাঁড়ান, আর এক পা'ও এগোবেন না,' কুয়াশা মৃদু কণ্ঠে নির্দেশ দিল। থমকে দাঁড়ালেন ড. রাজী। সেলিমও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ব্যাপার কি?' প্রশ্ন করল সেলিম।

ব্যাপারটা তখুনি টের পাওয়া গেল। শব্দটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছিল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়েছিল ওরা। দুপদাপ শব্দ করতে করতে যেন একটা বিরাট দৈত্য এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। নিঃশব্দে নয়, প্রচণ্ড গর্জন করে। পিলে চমকানো গর্জন। কুয়াশার হাতের রিভলভার উপেক্ষা করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবটা। এত দ্রুত এবং এত প্রচণ্ড শক্তিতে কুয়াশার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, কুয়াশা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। সে চিত হয়ে পড়ে গেল। বিশালকায় জন্তুটা আর তার দিকে তাকাল না আতঙ্ক-বিহ্বল ড. রাজী ও সেলিমের দিকে এগিয়ে গেল। সেলিমের গালে একটা থাপ্পড় মেরে বুক বরাবর লাথি তুলল অতিকায় দানবটা। কুয়াশা তাকে সে সুযোগ দিল না। সে বিদ্যুৎ গতিতে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে পর পর তিনবার গুলি করল আক্রমণকারীর পিঠের ঠিক মাঝখানে।

পাঁচ

যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে রুহুল করিম ফিরে আসছিল ড. রাজীর বাসার দিকে চিন্তিত মনে। গত দু'দিনের ঘটনাবলীতে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। ড. রাজী আর পারভেজ ও সেলিমের অন্তর্ধানে সে তাদের অমঙ্গলের আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগ অনুভব করছিল। চরম অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। তাছাড়া, কে জানে ওদের তিনজনের উপর যখন শত্রুর নজর পড়েছে তখন তার উপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হওয়াও বিচিত্র নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো পরের কথা। তার পরম শ্রদ্ধাভাজন ড. রাজী আর ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুর ভাগ্য সম্পর্কেও এখন তার উদ্বেগ প্রবল।

সকালে খবর পাওয়ার পর থেকেই তো খোঁজ-খবরের ত্রুটি করেনি। বারটা বেজে গেছে, অথচ ওদের তিনজন সম্পর্কে এতটুকু সন্ধানও পাওয়া যায়নি। কে জানে, কোথায় নিয়ে গেছে ওদের সুপারম্যান, তাদের অদৃষ্টেই বা ইতিমধ্যে কি ঘটেছে।

সামনের দিক থেকে একটা গাড়ি আসছিল। সরু পথ। রুহুল করিম নিজের গাড়ির গতি কমাল। সামনের গাড়িটা কাছে আসতেই দুটো পরিচিত মুখ নজরে পড়ল তার। শহীদ সাহেব আর মিস রোকেয়া। তৃতীয় ব্যক্তি তার অপরিচিত। ভাল করে দৃষ্টি মেলে দেখল, গাড়িতে ড. রাজী, পারভেজ বা সেলিম নেই।

শহীদ সম্ভবত রুহুল করিমকে দেখতে পায়নি। কিন্তু রোকেয়া দেখেছিল

তাকে। সে শহীদকে বলল, 'ঐ যে, রুহুল করিম সাহেব আসছেন। উনি হয়ত কোন খোঁজ দিতে পারবেন। সকাল থেকেই উনি আব্বার খোঁজ করছেন।'

ততক্ষণে করিমের গাড়িটা অতিক্রম করে বসে শহীদ। সে গাড়ি থামিয়ে পেছন দিকে তাকাল। করিমও গাড়ি থামিয়েছিল। সে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে শহীদের গাড়ির জানালার পাশে এসে বলল, 'পেলেন, পেলেন কোন খবর ড. রাজীর?'

শহীদ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ঠিক পেয়েছি, বলা যায় না। তবে আশা করছি, পেয়ে যাব। যেখানে ওকে পেতে পারি, মানে যেখানে ড. রাজীকে আটকে রাখার সম্ভাবনা আছে আমরা যাচ্ছি সেখানেই।'

'কোথায় সে জায়গা?'

'বললে না-ও চিনতে পারেন। ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের সঙ্গ নিতে পারেন।'

করিম একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'নিশ্চই যাব আমি। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিই।'

গাড়িতে ফিরে গেল সে।

আধঘন্টা পরে গাড়ি থামাল শহীদ।

মি. সিম্পসন বললেন, 'বোধহয় কাজীপুরের জঙ্গল, তাই না?'

'হ্যাঁ, নামুন। মিস রাজী, আপনিও নামুন।'

মি. সিম্পসন ও রোকেয়া গাড়ি থেকে নামল। শহীদ চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। রুহুল করিমের গাড়ি ততক্ষণে এসে থেমেছে। সে নেমে শহীদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'মি. সিম্পসন, করিম সাহেব, কুইক। দেখুন তো পথের পাশেই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কোন গাড়ি দেখতে পান কিনা। আপনি মি. সিম্পসন, রাস্তার বাঁ দিকে দেখুন। করিম সাহেব, আপনি সামনের দিকে চলে যান। আমি এদিকে দেখছি। কুইক।'

'শহীদ সাহেব, আমি কি কোন কাজে লাগতে পারি না?' রোকেয়া নম্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই পারেন। আপনি দেখুন ওইদিকে একটা জোডিয়াক দেখতে পান কিনা। মোট পাঁচ মিনিট সময়।'

ছড়িয়ে পড়ল ওরা কয়েকজন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পথের পাশের ঝোপ-ঝাড় দেখা হয়ে গেল। রোকেয়া ফিরে এল সকলের আগে। সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আছে একটা জোডিয়াক। কালো রং-এর। কিন্তু ওটা মানে ঐ গাড়িতেই কি আব্বা…?'

'না। ওটা অন্য একজনের গাড়ি। পরে জানতে পারবেন।'

মি. সিম্পসন এসে হতাশ হয়ে বললেন, 'না, কোন গাড়ি দেখতে পেলুম না তো।'

কিন্তু চরম উত্তেজনা নিয়ে ফিরল রুহুল। সে উত্তেজনায় রীতিমত হাঁপাচ্ছিল। গুছিয়ে কথা বলতেও তার বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। সে বারবার বলল, 'একটা ফোক্সওয়াগেন। গাড়িটা মনে হল।'

চোখ টিপল শহীদ রুহুলকে। সে তার কথাটা শেষ করল না। শহীদ বলল, 'এখনও হয়ত আশা আছে, মি. সিম্পসন। আর দেরি নয়, তাহলে আসুন। এই যে, এই পথ দিয়ে যেতে হবে। আসুন আমার পিছনে। মি. সিম্পসন, আপনার রিভলভারটা বের করে হাতে নিন।'

মিনিট পনের পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল ওদের ছোট্ট মিছিলটা। কেউ কোন কথা বলল না। জঙ্গলের ভিতরটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। অনেক দূরে দৃষ্টি যায়। অনেক দূর থেকেই জঙ্গলের ভিতরের পোড়োবাড়িটা দেখা যাচ্ছিল।

রুহুল ছিল শহীদের ঠিক পিছনেই। সে প্রশ্ন করল, 'ওটা কি, শহীদ সাহেব? ফরেস্ট অফিস নাকি?'

'না। ওখানেই আমরা যাচ্ছি। ওখানেই আছে আমাদের বন্ধু সুপারম্যান, আর আছে তার সৃষ্ট সেই ডোসাইল জায়েন্ট। সেলিম ও ড. রাজীকে সম্ভবত ওখানেই বন্দি করে রাখা হয়েছে।'

'সত্যি কোন দানব-টানবের আকারের কিছু একটা আছে নাকি? না ওটা কোন মারপ্যাঁচের ব্যাপার?'

শহীদ বলল, 'স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন কপাল ভাল থাকলে। অবশ্য দেখতে পাওয়াটা আবার দুর্ভাগ্যের কারণও হতে পারে।'

পোড়োবাড়িটার খুব কাছে এসে গিয়েছিল ওরা। শহীদ দাঁড়িয়ে পড়ল। পশ্চাৎবর্তীদেরকে থামবার জন্যে ইশারা করল। থেমে গেল ছোট দলটা।

শহীদ চাপা কণ্ঠে বলল, 'আপনারা এখানটাতেই থাকুন। আমি ঘুরে আসছি।'

বাড়িটার দিকে এগোল না শহীদ। সে জঙ্গলের ভিতর দিয়েই এগিয়ে গেল। ওরা কয়েকজন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করল শহীদ। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, সবুজ লতায় তার বাঁ পায়ের জুতোর ডগাটা আটকে গেছে। কিন্তু না, ভাল করে লক্ষ্য করতেই শহীদ বুঝল, ওটা লতা নয়, ওটা সবুজ রং-এর একটা তার। উবু হয়ে তারটা দেখল সে। লম্বা সবুজ ঘাসের মধ্যে পড়ে আছে তারটা। একটু অবাক হয়ে সে তারটা দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। বেশি দূরে নয়, কাছেই একটা বড় গাছের নিচে ঘন ঝোপের মধ্যে তারটা শেষ হয়ে গেছে। ঝোপের ভিতরটা বেশ অন্ধকার। লতা-পাতা সরিয়ে শহীদ যা দেখল তাতে অবাক হল না সে। ঐ ধরনের কিছু একটা সে আন্দাজ করেছিল। জিনিসটা হচ্ছে একটা ডিটোনেটর সেট অর্থাৎ মাইন ফাটাবার একটা ইলেকট্রিক প্লাঞ্জার। তার বরাবর আবার ফিরে এল সে। সেটা সোজা চলে গেছে পোড়োবাড়িটার দিকে।

শহীদের মনে খটকা লেগেছে। কে বসিয়েছে এই ডিটোনেটর সেটটা?

সুপারম্যান স্বয়ং, না কুয়াশা? কখনই বা বসানো হয়েছে ওটা? কে জানে, রাতে যখন সে আর কামাল এই পোড়োবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিল তখন ওটা ওখানে ছিল কিনা। তখন যদি কেউ প্লাঞ্জারটা টিপে দিত তাহলে তো সকলে একসঙ্গে ধ্বংস হত।

একটা কথা মনে হওয়ায় আপন মনে হাসল শহীদ। সুপারম্যান বোকা বানাতে পারেনি তাকে। সুপারম্যান ধারণা করেছিল, তার আড্ডাটা শহীদের চেনা হয়ে গেছে কাজেই সে আর এই আড্ডায় ফিরে আসবে না বলে শহীদের ধারণা জন্মাবে। ফলে শহীদ আর যেখানেই হোক তার সন্ধানে এই পোড়োবাড়িতে হানা দিতে আসবে না। সুতরাং এটাই হবে তার সবচেয়ে নিরাপদ ঘাঁটি। কিন্তু সে সুপারম্যানের সাইকোলজিটা বুঝতে পেরেছিল, সুতরাং ড. রাজী ও তাঁর সহকারীদের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়েই তার মনে হয়েছিল যে, সুপারম্যানই যদি ওদেরকে চুরি করে থাকে তাহলে তাদেরকে নিঃসন্দেহে ঐ পোড়োবাড়িতেই নিয়ে গেছে। তার ধারণা যে সত্যি, পথের পাশে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ফোক্সওয়াগেনটাই তার প্রমাণ। তবে ড. রাজী বা তাঁর সহকারীরা এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে। সুপারম্যান তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে যে শপথ নিয়েছে সে তো তা নিজ কানেই শুনেছে।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। পোড়োবাড়িটা থেকে কোন জন-প্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বেড়াটার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে। সমস্ত বেড়ার চারদিক ঘুরে এল। প্রবেশ-পথ বলতে কিছু দেখতে পেল না। গতরাতে বেড়ার নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ও কুয়াশার সাথে। কিন্তু সুপারম্যান তাদেরকে কিভাবে ঢুকিয়েছিল বলতে পারে না। কারণ জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর এগোতেই কয়েকটা প্রচণ্ড ঘুসি মেরে শহীদকে অচৈতন্য করেছিল পেদ্রো নামের সেই দৈত্যটা। সম্ভবত একই দশা হয়েছিল কামালেরও।

মি. সিম্পসন, রোকেয়া ও রুহুল করিমকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেখানে ফিরে গেল শহীদ।

'কি হে, কোথায় ছিলে তুমি? এই আসছি বলে চলে গেলে, আর বিশ মিনিট হল কোন পাত্তাই নেই। শেষটায় ভাবলুম, হয়ত এবার তোমাকেই খুঁজতে বেরোতে হবে।'

মৃদু হাসল শহীদ।

'ব্যাপার কি?'

ডিটোনেটর সেটের কথা বলল শহীদ। শেষটায় যোগ দিল, 'আমি ঐ পেড়োবাড়িটার মধ্যে ঢুকব, মি. সিম্পসন। আপনি ডিটোনেটর সেটটা পাহারা দেবেন। এমনও হতে পারে যে, জঙ্গলের মধ্যেই কেউ লুকিয়ে আছে। আমাদেরকে ঢুকতে দেখলেই প্লাঞ্জার অন করে দিয়ে বাড়িটা ধ্বংস করে দেবে। কাজটা অবশ্য

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেও করা অসম্ভব নয়।'

'তা বটে।'

'মিস রাজী, আপনি মি. সিম্পসনের সাথে থাকুন।'

'না না, আমি আপনার সাথে থাকব। ঢুকব আমিও ঐ বাড়িটাতে।'

'ভয়ঙ্কর ঝুঁকি আছে যে।'

'তা হোক। আব্বাকে তবু যদি বাঁচাতে পারি...নিজে জান দিয়েও যদি আব্বাকে বাঁচাতে পারি,' আর্তস্বরে বলল রোকেয়া।

রোকেয়ার অনুভূতি শহীদের অন্তর স্পর্শ করল। সে বলল, 'আচ্ছা, চলুন।'

'আমিও যাব, শহীদ সাহেব,' রুহুল করিম জানাল।

'আসুন তাহলে।'

মি. সিম্পসনকে ডিটোনেটর সেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে পোড়োবাড়ির দিকে এগিয়ে গেল শহীদ রোকেয়া আর রুহুল করিমকে সাথে নিয়ে।

শহীদ শেষবারের মত সতর্ক করে দিল মি. সিম্পসনকে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি বড় বেশি সাবধানী হয়ে পড়েছ। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি পুলিস অফিসার?'

'জঙ্গলের মধ্যে বলেই তো বিপদ। যে এটাকে এখানে রেখে গেছে সে যে-কোন সময়ে ফিরে আসতে পারে। আর আপনি অসতর্ক হলে যে কি পরিণাম হবে বুঝতেই পারছেন। হয়ত দূর থেকে দেখেই গুলি ছুঁড়ে বসবে। আপনি বরং রিভলভারটা হাতেই রেখে দিন।'

'নিশ্চয়ই। এবারে তোমরা এগোও।'

সকালে কাঁটাতারের বেড়ার নিচের যেখান দিয়ে শহীদরা বেরিয়ে এসেছিল সেখান দিয়েই ওরা পোড়োবাড়ির প্রাঙ্গণে ঢুকল। প্রথমে শহীদ, তারপর রুহুল করিম ও সকলের শেষে রোকেয়া। সবাই ঢুকে পড়তেই শহীদ নিচুস্বরে বলল, 'দেরি করবেন না। আমাদের সকলকেই আগে দালানটার দেয়ালের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রাঙ্গণের মাঝখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে কারও নজরে পড়ার আশঙ্কা আছে।'

রুহুল করিম বলল, 'ঠিক, আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু ঢুকবেন কোনদিক দিয়ে? এদিকটা বোধহয় পিছন দিক। দরজা তো একটাও নেই, শুধু জানালা দেখা যাচ্ছে।

'চলুন দেখি তো!'

দ্রুত হেঁটে ওরা তিনজন দালানের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শহীদ, রুহুল করিম ও রোকেয়াকে ওকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করল। নিঃশব্দে ওরা দেয়ালের পাশ দিয়ে এগোতে লাগল।

গুডুম! গুডুম! দু'বার প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এল ওদের কানে।

থেমে গেল মিছিলটা। শব্দটা ওদের মনে হল পোড়োবাড়িটার ভিতর থেকেই

আসছে। আবার গুলির শব্দ কানে এল।

কান পেতে রইল ওরা। শহীদ দেখল রোকেয়ার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। বোধহয় সামান্য কাঁপছেও সে। তবে নার্ভাস হয়নি একেবারে।

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

শহীদ আবার পা বাড়াল। রোকেয়া ও রুহুল এগোচ্ছিল। শহীদ ওদেরকে থামবার ইঙ্গিত করল। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে রইল ওরা। তারপর আবার ভেসে এল আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন, পর পর তিনবার। আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল এক অমানুষিক আর্তনাদ। কে যেন আকাশ ফাটিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

শহীদ পিছন ফিরে দেখল, রুহুল করিম ও রোকেয়া দু'জনই কাঁপছে থরথর করে। ওদের দৃষ্টি বিস্ফারিত। কারও মুখেই রক্তের লেশমাত্র নেই। রোকেয়া দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত নিশ্চিত পতন থেকে এভাবেই সে নিজেকে রক্ষা করেছে।

শহীদ দু'পা পিছিয়ে এসে চাপা স্বরে বলল, 'আপনারা এখানেই দাঁড়ান। আমি দেখছি।'

'আমার ভয় করছে, শহীদ সাহেব।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল রোকেয়া। 'কে জানে, আব্বার কি অবস্থা হয়েছে। উনি কি…?'

রোকেয়াকে সান্ত্বনা দেবার সময় ছিল না তখন শহীদের হাতে। সে দ্রুত বলল, 'আমি দেখছি। আপনি স্থির হোন।'

জবাবে করুণ দৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকাল রোকেয়া।

শহীদ মোড় ঘুরতেই তার কানে ভেসে এল দুপদাপ শব্দ। কাছেই, সম্ভবত পাশের রুমটাতেই কারা যেন সশব্দে হাঁটছে। রিভলভার বের করল শহীদ।

কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। পরিচিত কণ্ঠ, কিন্তু কেমন যেন জড়ানো। ঠিক বুঝতে পারল না শহীদ, কথাটাও বোঝা গেল না।

দড়াম করে একটা শব্দ হল। সম্ভবত দরজা খুলে গেল। দেয়ালের সাথে গা সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। তার দৃষ্টিটা সামনের দিকে।

'ওদিকে নয়, এদিকে। দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আবার আক্রমণ হতে পারে।'

আশ্বস্ত হল শহীদ। এতক্ষণ ধরে যে উত্তেজনা তার স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করছিল তার অবসান ঘটল একমুহূর্তেই। পরমুহূর্তেই কুয়াশাকে দেখা গেল তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সে একা নয়, তার পিছনে ড. রাজী আর সেলিম আতহার। তিনজনের চেহারাই চরম বিপর্যস্ত। কাপড়-চোপড় ময়লা, চুল এলোমেলো। সেলিমের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। জামাটার এখানে-সেখানে রক্ত।

ওরা শহীদকে দেখে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। কুয়াশা এগিয়ে এসে মৃদু হেসে বলল, 'এসে গিয়েছ তাহলে, নির্ভুল হিসাব।'

'যদিও আসবার দরকার ছিল না। কিন্তু সে ভদ্রমহোদয় কোথায়?'

'পালিয়েছে। ধরতে পারলাম না এবারও।'

'পালিয়েছে মানে? সে নিশ্চয়ই ভিতরে আছে।'

'থাকতেও পারে।'

সেলিম বলল, 'থাকতেও পারে মানে, নিশ্চয়ই আছে, যাবে কোথায়? বেরোবে কোনদিক দিয়ে? আমার মনে হয় বাড়িটা ঘিরে ফেললেই, এমনকি আমরা নিজেরাও যদি বাড়িটার চারদিকে পাহারা দিই তাহলে বদমাশটাকে অবশ্যই ধরতে পারব।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু এখানে দাঁড়ানো কোন অবস্থাতেই নিরাপদ নয়। সে যদি ইতিমধ্যেই পালিয়ে গিয়ে না থাকে তাহলে ভিতর থেকে গুলি করতে পারে আবার, চল।'

'সেই ভাল।'

ড. রাজী এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। সম্ভবত তাঁর বিভ্রান্তির ভাবটা কাটেনি। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে শহীদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কয়েক পা এগোবার পর ড. রাজী কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'শহীদ সাহেব, আমার মেয়ে রোকেয়া? সে ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, ভাল আছে এবং এখানেই আছে। আমার সাথেই এসেছে সে। এই তো, মোড়টা ঘুরলেই চোখে পড়বে।'

ড. রাজীর বিপর্যস্ত চেহারাতেও খুশির ঢেউ খেলে গেল। শিশুর মত উল্লাসে তিনি প্রায় দৌড়ুতে শুরু করলেন।

'আব্বা!' রোকেয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। সে-ও দৌড়ে এসে ড. রাজীকে জাপটে ধরল। বাবার বুকে মাথা রাখল রোকেয়া।

'মা, মাগো, ভাল আছিস তুই?' পিঠে হাত বুলিয়ে ড. রাজী বললেন।

রোকেয়া মাথা তুলল। সজল চোখে বলল, 'ইশ, তোমার কি হাল করেছে!'

'বেঁচে যে আমরা আসতে পেরেছি সেটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য, মা। আর তার সমস্তটা কৃতিত্ব হচ্ছে একমাত্র ওঁর।' কুয়াশার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গদগদ কণ্ঠে বললেন ড. রাজী, 'বিধাতা যেন চরম লগ্নে ওঁকে পাঠিয়েছিলেন।'

রোকেয়া গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকাল। রুহুল করিমও তাকাল কুয়াশার দিকে।

সে বলল, 'আরে, এ যে আমাদের আলী সাহেব!'

সেলিম কপালের রক্ত মুছতে মুছতে বলল, 'আগে তো তাই জানতাম, কিন্তু কে জানত উনিই হচ্ছেন কুয়াশা?'

'কুয়াশা!' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল রোকেয়া, 'উনি…উনিই কুয়াশা?'

বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় রুহুল করিমও রোকেয়া চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে।

রোকেয়া কি যেন বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই কুয়াশা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু ড. রাজী, আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমরা বিপদ এখনও

কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের এখুনি এই জায়গাটা ত্যাগ করা উচিত।'

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ওরা কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করল।

প্রথমে কথা বলল রুহুল করিম।

'পারভেজ কোথায়? তাকে যে দেখছিনে?' শঙ্কিত শোনাল তার কণ্ঠ।

এ প্রশ্নের জবাব দিল সেলিম। সে চরম ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'কে জানে সে শয়তানটা কোথায় পালাল।'

'পালাল মানে?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল রুহুল করিম।

শহীদ হেসে বলল, 'সেই সাহেবই তো এই রহস্যের নায়ক।'

কথাটা যেন মস্তিষ্কে পৌঁছুল না রুহুল করিমের। সে বোকার মত তাকিয়ে রইল শহীদের দিকে।

মৃদুকণ্ঠে ড. রাজী বললেন, 'রুহুল, পারভেজই গত কয়েক দিনের কাণ্ডগুলো করে বেড়াচ্ছে। হি ইজ দ্য সুপারম্যান।'

'বল কি, আব্বা!' কপালে দু'চোখ তুলল রোকেয়া।

'হ্যাঁ, মা। ঐ দানবগুলো তারই অবদান। কুয়াশা দুটোকেই শেষ করে দিয়েছেন।' সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন ড. রাজী।

ওদিকে কুয়াশা ও শহীদের মধ্যে মৃদু স্বরে কি যেন আলাপ হচ্ছিল। শহীদ কথা শেষ করে রুহুল করিমকে বলল, 'করিম সাহেব, আপনি সোজা চলে যান মি. সিম্পসনের কাছে। তাঁকে প্লাঞ্জারটা টিপে দিতে বলুন। আর আপনারা তাঁর কাছেই থাকবেন। এদিকে আসবেন না। পোড়োবাড়িটা বিস্ফোরিত হলে ইটের টুকরো ছিটকে এসে কারও আহত হওয়া বিচিত্র নয়। কুইক। আর শুনুন, বিস্ফোরণ শেষে মি. সিম্পসনকে এখানেই থাকতে বলবেন। বদমাশটা যাতে পালাতে না পারে তাঁকে তা দেখতে বলবেন। চল, কুয়াশা।'

'চল।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?' সেলিম প্রশ্ন করল।

'চূড়ান্ত লড়াইয়ে।'

সুড়ঙ্গ-পথের দিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা ও শহীদ। একটু পরেই ওদের কানে গেল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ।

ঝাঁকড়া ঝোপটার কাছে কুয়াশা ও শহীদ গিয়ে দাঁড়াতেই গাছ থেকে নেমে এল কলিম।

কুয়াশা হেসে বলল, 'কি রে, কোন খবর আছে?'

'না। শুধু পিঁপড়ের কামড় খেয়ে হাত-পা জ্বালা করছে। তোমার সেই দৈত্য-দানব বা অন্য কেউ বেরোলও না, ঢুকলও না। কিন্তু এত যে পিস্তলের শব্দ শুনলাম, ব্যাপার কি?'

'একদফা লড়াই হয়ে গেল।'

'সব খতম তো?'

'না, আসল বদমাশটাকে এখনও পাইনি।'

'আর পাবে কি করে? বাড়িটা তো ধসেই গেছে। নিশ্চয়ই চাপা পড়ে মারা গেছে।'

'উঁহু, তা হবে না। তোর ডিটোনেটরটা বলতে গেলে ছিল একটা খেলনা মাইন। বাড়িটার ভূ-গর্ভস্থ ঘরগুলোর তেমন কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে?'

'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বেঁচে থাকলে এপথেই সে বেরুবে। এখন চুপ কর। একটা কথাও আর নয়। টুঁ-শব্দটি শুনলেও ফিরে যাবে বদমাশটা। আয়, একটু দূরে সরে দাঁড়াই আমরা।'

হাত দশেক দূরে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

বেলা পড়ে এসেছে। খিদে পেয়েছে ওদের তিনজনেরই। প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ঝোপটা নড়ে উঠল।

প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল ওরা তিনজন।

কিন্তু কেউ বেরোল না ঝোপের মধ্য থেকে।

নড়তেই লাগল ঝোপটা।

কুয়াশা, কলিম ও শহীদ এগিয়ে গেল ঝোপটার কাছে নিঃশব্দে। প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে ঝোপটা। মনে হচ্ছে, কে যেন বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

একটা ডাল ভেঙে নিয়ে অতি সাবধানে ঝোপটার নিচের দিকের লতা-পাতা ফাঁক করল কুয়াশা। ঝোপের আন্দোলন থেমে গেল। মুহূর্তের জন্যে নীল লোমশ একটা প্রাণী কুয়াশার চোখে পড়ল।

'কি ব্যাপার?' শহীদ চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'নীল একটা প্রাণী। সম্ভবত নীল বাঁদর হবে ওটা। সুপারম্যানের আর এক অদ্ভুত সৃষ্টি। পারভেজ বোধহয় পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যেই ওটাকে পাঠিয়েছে।'

'তাহলে?'

'চল, নেমে পড়া যাক। না, তোমরা থাক, আমি একাই নামব।'

'তা হয় না,' শহীদ বলল। 'কলিম, তুমি থাক।'

'বেশ।'

ঝোপটা সরিয়ে নেমে গেল কুয়াশা ও শহীদ সুড়ঙ্গ বেয়ে। নীল প্রাণীটাকে দেখা গেল না আর। উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দু'জন সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। একটু এগিয়েই কুয়াশার বাঁ হাতের সরু পেন্সিল-টর্চটার আলোতে যা দেখতে পেল তাতে ভীষণভাবে চমকে উঠল ওরা।

সরু সুড়ঙ্গ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে এখন আর নিয়ন আলো জ্বলছে না। পেন্সিল-টর্চটার ম্লান আলোয় দেখা গেল নিস্পন্দ একটা মানুষের দেহ পড়ে আছে চিত হয়ে। কে যেন খুলে নিয়েছে তার চোখ দুটো। সমস্ত মুখে রক্ত আর

আঁচড়ের চিহ্ন, জামা-কাপড় ছেঁড়া। কি বীভৎস দেখাচ্ছে মৃতদেহটাকে!

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল কুয়াশা।

'শেষপর্যন্ত নিজের সৃষ্ট ফ্র্যাংকেনস্টাইনের হাতেই মারা গেল সুপারম্যান!' ধীরে ধীরে বলল শহীদ।

একটু দূরে পড়ে আছে একটা রিভলভার। অদূরে পড়ে আছে দুটো বিশালকায় কুকুরের আর একটা নীল বাঁদরের মৃতদেহ।

'কুকুর দুটোর একটা আমার হাতে মারা গেছে,' কুয়াশা বলল।

শহীদ বলল, 'বোধহয় ওগুলোকে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিল পারভেজ। শেষপর্যন্ত ওরাই তাকে আক্রমণ করেছে। দুটোকে মেরেছে, নিজেও মারা পড়েছে ওদের হাতে।'

ওরা খেয়াল করেনি। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন শহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'উহ্!' চিৎকার করে উঠল শহীদ।

কুয়াশা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে শহীদের দিকে তাকাল। তার দিকে আলো ঘুরিয়েই দেখতে পেল, নীল বাঁদরটা শহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কুয়াশা বাঁদরটার পেটের উপর রিভলভার চেপে ধরল।

ছয়

পরদিন বিকেলে ড. রাজীর ড্রইংরুমে ওরা সবাই জড় হয়েছিল। শহীদ, কামাল, রুহুল করিম, সেলিম, রোকেয়া আর ড. রাজী সবাই উপস্থিত। আমন্ত্রণ করেছিল রোকেয়া। মি. সিম্পসনকেও দাওয়াত করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যস্ততাহেতু তিনি আসতে পারেননি।

গোড়ার দিকে হতাশ হয়েছিল রোকেয়া। শহীদ আর কামালকে সে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল যেন কুয়াশাকে তারা অবশ্যই সাথে করে নিয়ে আসে। সেটা যে সম্ভব নয় শহীদ তা বলেছিল। কিন্তু তারপরও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল রোকেয়া শহীদকে। কুয়াশাকে অবশ্য শহীদও রোকেয়ার পক্ষ থেকে অনুরোধ করেছিল। কুয়াশা জবাবটা এড়িয়ে গেছে।

এক প্রস্থ চা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সেলিম বলল, 'জানিস, শহীদ, সমস্ত ব্যাপারটা না এখনও আমার কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য রূপকথার মত মনে হচ্ছে।'

ড. রাজী বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমাদের মধ্যেই যে এতদিন ধরে একজন সুপারম্যান আত্মগোপন করে ছিল এবং সে যে একজন মানবতাবিরোধী শয়তান ছিল তা তো ধারণাও করতে পারিনি। তাছাড়া সে যে ইতিমধ্যেই জায়েন্টও তৈরি করছে তা আমাদের কল্পনাতীত ছিল।'

'অথচ,' শহীদ সিগারেটে টান দিয়ে বলল। 'আপনাদেরই এই সম্ভাবনার কথা আগে ভাবা উচিত ছিল।'

ড. রাজী তা স্বীকার করলেন।

সেলিম বলল, 'পারভেজ, শেষ পর্যন্ত আমাদের পারভেজ দ্য হ্যাণ্ডসাম, মানে আমার ঘনিষ্টতম বন্ধু পারভেজ...হু নিউ হি ওয়াজ এ ডেভিল? আচ্ছা, বলতে পারিস, ওর অতীত কি?'

'কিছু কিছু জেনেছি আমি,' বলল শহীদ।

'বলুন না,' আবদার জানাল রোকেয়া।

শহীদ সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, 'এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল জার্মানিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। হিটলারের নির্দেশে প্রফেসর ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ, যাকে মডার্ন জেনেটিকসের জনক বলা হয়, তিনি সুপারম্যান গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে থাকেন। সফলও হন। কিন্তু তিনি হিটলারের মতলব জানতেন, তাই ল্যাবরেটরিতে সৃষ্ট সুপারম্যান বেবিকে তিনি লুকিয়ে রাখেন। ড. লোকমান হাকিম ছিলেন ড. শেলবুর্গের বিশ্বস্ত ছাত্র। তিনিও তখন পৃথকভাবে ইউজেনিকসের অর্থাৎ সুপারম্যান গড়ে তোলার গবেষণা করছিলেন। ড. শেলবুর্গের গবেষণার এবং তাঁর সাফল্যের খবর তিনি রাখতেন। সুপারম্যান বেবির খবরও পেয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় বরণের পর ড. ম্যানফ্রেড শেলবুর্গ পালিয়ে যান আর্জেন্টিনায়। সুপারম্যান বেবিকে রেখে যান এক গোয়ালার কাছে।

'কয়েক বছর পর ড. লুকম্যান এইচ কিম অর্থাৎ ড. লোকমান হাকিম সেই শিশুকে খুঁজে বের করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেন শিক্ষার জন্যে। ইতিমধ্যে তিনি হাকিম মেডিক্যাল রির্সাচ সেন্টার স্থাপন করেন এবং এখানে ইউজেনিকসের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি সুপারম্যান বেবিকে নিয়ে আসেন। অবশ্য তখন আর সে বেবি নয়, পূর্ণ যুবক। পারভেজ ইমাম নামটা তার ড. হাকিমই দিয়েছিলেন। তাকে তার পরিচয়ও দিয়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে আপনাদের ল্যাবরেটরিতে ইউজেনিকসের গবেষণা সফল হল। এই সফলতার মূলে ছিল পারভেজ অর্থাৎ সুপারম্যান স্বয়ং। প্রথমে সে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। কিছুদিন পরেই সে বুঝল যে, ইচ্ছানুযায়ী প্রাণী সৃষ্টির রহস্য অন্যের হাতে পড়লে তার একক সুপারম্যানত্ব ঘুচতে পারে, সুতরাং সে সাবধান হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে কাজীপুরের জঙ্গলে একটা ল্যাবরেটরি গড়ে তুলে কয়েকটা অতিকায় অথচ বোবা ও মানবাকার প্রাণীর জন্ম দিল। অতিকায় কুকুর, বাঁদর ইত্যাদিরও জন্ম দিল সে।

'ড. লোকমান হাকিম বোধহয় তার কু-মতলবটা আন্দাজ করেছিলেন। হয়ত সেই কারণে অথবা তিনি পারভেজের আসল পরিচয় জানতেন বলে তাঁকে হত্যা করল সে দুর্ঘটনার অজুহাত দেখিয়ে। ড. রাজী সেলিম বা রুহুল করিমকে সে

গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। তবে ভবিষ্যতে একে একে এদেরকেও হত্যা করত পারভেজ।' কথা শেষ করে থামল শহীদ।

শিউরে উঠল রোকেয়া।

সে বলল, 'অথচ আব্বা ওকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেলিম ও করিম সাহেব তো পারেভজ বলতে অজ্ঞান ছিলেন।

'শয়তানের কাছে স্নেহের কোন দাম নেই, মিস রাজী,' শহীদ বলল।

রুহুল প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

'ইতিমধ্যে বুয়েনস এয়ার্সে ইন্টারন্যাশনাল জেনেটিকস সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ড. ম্যানফ্রেণ্ড শেলবুর্গের সাথে কুয়াশার আলাপ হয়। তাঁর কাছে কুয়াশা সুপারম্যানের রহস্য সম্পর্কে জানতে পেরে পশ্চিম জার্মানি যায়। সেখান থেকে খোঁজ খবর নিয়ে ব্রিটেন হয়ে সে ফিরে আসে দেশে। ড. লুকম্যান এইচ কিমই সুপারম্যান বেবিকে নিয়ে গেছেন তা সে জার্মানিতে জানতে পারে। ড. হাকিমই যে লুকম্যান এইচ কিম এটা জানতে অবশ্য তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বাই দ্য ওয়ে, কুয়াশা ড. শেলবুর্গকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ইউজেনিকসের সম্ভাব্যতা সে নির্মূল করবে এবং সুপারম্যান বেঁচে থাকলে তারও মোকাবেলা করবে।

'দেশে ফিরে প্রথমে কুয়াশা এক আমেরিকান সাইন্টিস্টের ছদ্মবেশে ড. রাজীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে।'

ড. রাজী অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাহলে কুয়াশাই আমার কাছে এসেছিলেন!'

'হ্যাঁ। এবং পরে এসেছিল ইনডেন্টর আলী সাহেবের ছদ্মবেশে।

'বলছেন কি এসব, অ্যাঁ?' রুহুল করিম তার স্বভাবসিদ্ধ মেয়েলীকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

হাসল শহীদ।

'হ্যাঁ, এর মাস খানেক আগেই ড. হাকিম মারা যান। আমেরিকান ভদ্রলোককে প্রথমে পারভেজ সন্দেহ করেনি। কিন্তু কুয়াশা একদিন রাতে ড. রাজীর ছদ্মবেশে রিসার্চ সেন্টারে প্রবেশ করে এবং কয়েক জায়গায় রেডিও-ট্রান্সমিটার লাগিয়ে রেখে যায়। ফলে রিসার্চ সেন্টারের কথাবার্তা তারপর থেকে নিজের ঘরে বসেই জানতে পারত সে। শুধু তাই নয়, এই বাড়িও উপরের রুমগুলোতে রেডিও-ট্রান্সমিটার লাগানো আছে, চমকাবেন না। খোঁজ নিয়ে দেখুন। এবং সেগুলো কুয়াশাই লাগিয়েছে। আর তার বদৌলতেই সে এখান থেকে ইউজেনিকসের ফর্মূলা সরিয়েছিল!'

এবারে অবশ্য কেউ অবাক হল না। কারণ ইতিমধ্যেই রোকেয়া তার রুমে রেডিও-ট্রান্সমিটারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিল।

'কুয়াশা রিসার্চ সেন্টারে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ইউজেনিকসের ফর্মূলার

সন্ধান পায়নি। যদি কারও কথায় কখনও এ সম্পর্কে কোন হদিস পাওয়া যায় সেই আসাতেই সে ট্রান্সমিটার লাগিয়েছিল। পরের ঘটনাগুলো তো আপনাদের মোটামুটি জানাই আছে।'

সেলিম বলল, 'তাহলে, যে রাতে আমি আর পারভেজ জানতে পারলাম যে ড. রাজী রিসার্চ সেন্টারে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই রাতেই ড. রাজীর ছদ্মবেশে কুয়াশা ঢুকেছিল সেখানে। অথচ কুয়াশা মানে আলী সাহেবই আমাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণ করেছিলেন সে রাতে।'

'হ্যাঁ। এবং তখুনি হুঁশিয়ার হয়ে যায় পারভেজ।'

'সেলিম, ব্যাপারটা কি, বল তো?' ড. রাজী জানতে চাইলেন।

সেলিম ঘটনাটা জানাল তাঁকে।

ড. রাজী বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'তা ঘটনাটা আমায় বলনি কেন?'

সেলিম বিব্রত হয়ে বলল, 'পারভেজই আমাকে নিষেধ করেছিল। বলেছিল যে, ও গোপনে অনুসন্ধান করবে। আমিও ওকে বিশ্বাস করেছিলাম।'

রোকেয়া বলল, 'সে যাক। তারপর?'

'তারপর কুয়াশা প্রদর্শিত পন্থাই বেছে নিল পারভেজ। সে নিজেও পরে ড. রাজীর ছদ্মবেশে সেন্টারের ভিতরে ঢুকল। তার আগে অবশ্য সি. সি. টিভি রুমে এমন উগ্র মাদক-দ্রব্য রেখে এসেছিল যাতে সিকিউরিটি গার্ড চেতনা হারিয়ে ফেলে। তারিক খাঁ তাকে দরজা খুলে দেয়। তাকে সে হত্যা করে ল্যাবরেটরিতে ঢোকে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইউজেনিকসের ফর্মূলাটা হস্তগত করা। তবে সে একা যায়নি রিসার্চ সেন্টারে। তার সাথে ছিল তার অন্যতম সৃষ্টি এক ডোসাইল জায়েন্ট, সে অবশ্য ভিতরে ঢোকে পরে। কুয়াশাও সদলবলে সে রাতে রিসার্চ সেন্টারে গিয়েছিল। সে-ও অবশ্য ভিতরে ঢুকতেই গিয়েছিল সেখানে। যাই হোক, ড. রাজীর ছদ্মবেশে পারভেজ সেন্টারের ভিতরে ঢুকল। তার একটু পরে ড. রাজী নিজেও রিসার্চ সেন্টারের গেটে উপস্থিত হলেন। তাঁর উপর আক্রমণ চালাল পারভেজের ডোসাইল জায়েন্ট।'

শহীদ একটু থেমে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ড. রাজীর উদ্দেশে বলল, 'আপনি যখন অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন তখন কুয়াশাই আপনাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছিল।'

'তাই নাকি? ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক ছিল,' বললেন ড. রাজী। 'আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারিনি।'

রুহল করিম প্রশ্ন করল, 'শহীদ সাহেব, ইউজেনিকসের ফর্মূলা এখন কার কাছে আছে বলতে পারেন?'

'যদি কুয়াশা ইতিমধ্যেই তা ধ্বংস করে না ফেলে তাহলে সেটা তার কাছেই আছে। তবে ভয় নেই। সে সুপারম্যানের জন্ম দেবে না। ড. শেলবুর্গের কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'